জি জ্ঞা সা • কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র
শিল্পী : সুধীর সেন

প্রকাশক : শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

দেশপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহ

আনন্দমোহন বসুর

পুণ্যস্মৃতিতে

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও জীবন-সাধনা আমাদের যে কতবড়ো সম্পদ, আজো আমরা বোধ হয় তার সম্যক ধারণা করে উঠতে পারিনি। ইহা বাঙালীর দুর্ভাগ্য। স্বভাবদত্ত এক অনন্যসাধারণ নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে একদা আবির্ভূত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই ক্ষমতা-বলেই তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে জাগ্রত করেছিলেন রাষ্ট্রীয় চেতনায়। ইতিহাসে ইহাই ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা। এদেশে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ঘোষণা তিনিই প্রথম করেন। সেই বাণীই পরে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। সেসব ইতিহাস আজ বিস্মৃত, উপেক্ষিত।

সেই বিস্মৃত ইতিহাসেরই কয়েকটি পৃষ্ঠা এখানে তুলে ধরলাম।

৯০ বাগুইআটি রোড। দমদম
কলিকাতা ২৮

মণি বাগচি

ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

"কথায় হরষ, কথায় বিরস, কথায় হরে প্রাণ, কথায় কেতাব পুরাণ।" যে কথা কহিতে জানে, সে কেল্লা ফতে করে। এদেশে এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে, "কথায় চিড়া ভিজে না, কাজ চাই।" সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই কথার ভট্টাচায্যি। অথচ তাঁহার মতো কান-পাতলা লোক বাংলাদেশে আমি আর একটাও দেখি নাই। কেবলই পকেট হইতে একটা রেলওয়ে ওয়াচ বাহির করিতেছেন আর দিনের মধ্যে তাঁহার যে ছত্রিশ গণ্ডা কাজ তার কোনোটার উপরই অবিচার না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইতেছেন। তিনি এই নূতন হিন্দুস্থানটা গড়িয়া গিয়াছেন কেবল কথা কহিয়া। সেকালে কেবল তাঁহার কথার তারিফই শুনা যাইত—তিনি একটা ডিমস্থিনিস, তিনি একটা সিসিরো, তিনি একটা মিরাবো. তিনি একটা গ্লাডষ্টোন, তিনি একটা পিট। এইসব দুনিয়ার বক্তার রাজার সঙ্গে তাঁহার তুলনা, কিন্তু এ কথাটা বাহির হয় কোথা হইতে? কেবল ফাঁকা আওয়াজে কি কিছু একটা গড়িয়া উঠে? একটা সুর চাই, একটা তাল চাই, একটা ধরতা চাই, আর সকলের উপরে চাই একটা ভাব। সুরেন্দ্রনাথের বিলাতি বুলির মধ্যে, বার্ক-সেরিডানের বুকনির মধ্যে ছিল একটা নিভাঁজ স্বদেশী ভাব। তিনি কখনো পিতৃ-পিতামহের নাম ভুলেন নাই। তাই চট করিয়া সিভিলিয়ানের খোলস, সিভিলিয়ানের মেজাজ, সিভিলিয়ানের ধাত ছাড়িতে পারিয়াছিলেন। লোকটা ঠিক বাংলার তেলে-জলে গড়া ছিল। বিলাতে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, এদেশে যাঁহারা পাশের পড়া পড়বার বেলা দুনিয়া ভুলে যায়, তাহাদের সে রকম অবস্থা হয়ই না। সেকালের পঞ্চানন্দ ঠাট্টা করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিতেন সুরন্ধ্র। সুরন্ধ্রই বটে, এই বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবল দেশী সুরই বাজিয়া উঠিত। সিভিলিয়ানি ছাড়িবার বহুপূর্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী। তাঁহার হাকিমী যাইবার কারণটাই হইতেছে—সেকালে 'ইংলিশ-ম্যানে' কোনো বড়ো সিভিলিয়ানের ভুলের কথা কওয়া। সে পুরোন কাসুন্দি আর ঘাটিয়া কাজ নাই।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে বুঝিবার কথা এইটুকু—যাহার ভিতর যাহা নাই, তাহার ভিতর তাহা গজায় না। এই দেশটা যে কত বড়ো, ভিতরে ভিতরে সে বিষয়ে তাঁহার একটা গভীর বোধ ছিল। তাঁহার সেরা সেরা বক্তৃতায় দেখা যায় যে, যেমন করিয়া হউক বুদ্ধের নিষ্ক্রমণ এবং চৈতন্যের প্রেমের কথা পাড়িবেনই পাড়িবেন। ইদানিং বক্তৃতা করিবার সময় "যদা যদা হি ধর্মস্য"—এটা মুখস্থ করিয়া লইয়া যাওয়াই চাই। বক্তৃতাতেও তিনি খ্রাইস্টের চেলা লালমোহনের মতো ইংরেজি ধরণের বক্তা ছিলেন না। তিনি যে দেশের লোক, সেই দেশের প্রাণ যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ছিল তাঁহার বক্তৃতার ভাব-ভঙ্গী।

কিন্তু যদিও সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতায়ই সাধারণের নিকট পরিচিত, আমি কিন্তু বক্তা সুরেন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথই বলি না। আমি ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথকে চিনি। যে গুণের অভাবের জন্য বিশ্বামিত্র সৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেও বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সেই ক্ষমাগুণ সুরেন্দ্রনাথের মেরুদণ্ড বলিলেও হয়। আমাদের বড়লোকদের মধ্যে সুরেন্দ্রবাবুর মতো কেহ গালাগালি খাইয়াছেন কিনা জানি না। কেবল আজই যে লোক তাঁহাকে গালাগালি দিতেছে, তাহা নহে, তিনি আজীবনই গালাগালি খাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কখনো 'উতোর' গান নি। তাঁহার কথাই ছিল, "আমার পিঠটা এত বড়ো চওড়া, কে ক ঘা মারবে মারুক না।" যে তাঁহাকে ন-কড়া ছ-কড়া করিয়াছে, সেও তাঁহার কাছে যাইলে তিনি তাহাকে বাবু বাছা কহিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান হওয়া কি চারটিখানি কথা? জন্ম-জন্মান্তরের কত সাধনার ফলে দুর্গাচরণের উদার প্রাণটাকে খাঁটি দেশী ভাবের ছাঁচে ঢালিয়া ভগবান সুরেন্দ্রনাথকে বাংলায় পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্গে ঘর করিয়াছে, তাহারাই তাহা জানে। তাঁহার কথার পিছনে ছিল এমন একটা ভারতীয় ভাবের নিবিড় স্পর্শ যাহা তিনি নিজেও ভালো করিয়া বুঝিতেন না, কা কথা অন্যেষাম্।*

---

* মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৩২

॥ এক ॥

আধুনিক ভারতবর্ষে 'জাতির জনক'—এই গৌরব একজনেরই প্রাপ্য। তিনি রাজা রামমোহন রায়। তেমনি, জাতীয়তার জনক'—এই গৌরবও একজনেরই প্রাপ্য। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর উত্তরপুরুষ সুবিচার করেনি; তাঁর সমকালীনদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শেষ জীবনে তাঁর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। অথচ ইহা ইতিহাস-সমর্থিত সত্য যে, তাঁর কাছেই বাঙালী তথা ভারতবাসী একদিন রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল; তাঁরই নেতৃত্বে একদা পরিচালিত হয়েছিল স্বায়ত্তশাসনলাভের জন্য দেশব্যাপী নিয়মানুগ আন্দোলন। পঞ্চাশ বছর ধরে রাজনীতির আন্দোলন চালিয়েছিলেন এই একটি মানুষ। রাণাডের অসাধারণ প্রতিভা, অথবা স্যর ফিরোজ শা মেহতার অসামান্য কৌশল তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি বটে, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না। স্বজাতির রাজনৈতিক মুক্তিসাধনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা।

"The services of the motherland is the highest form of religion—it is the truest service of God,"—এই কথা একদিন আমরা সুরেন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছি। "স্বদেশের সেবাই আমার ধর্ম",—এ শুধু তাঁর কথার কথা ছিল না, এই-ই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের অস্তিত্ব। প্রখর কর্মসাধনার প্রদীপ্ত হোমানল দেশের বুকে একদিন জাগিয়েছিলেন তিনি। বিশ্বদেব তাঁর কাছে দেশমাতৃকার রূপে দেখা দিলেন এক শুভক্ষণে। দেশকে তিনি স্বায়ত্তশাসনের পথে নিয়ে যাবেন, দেশবাসীর মনে জাগিয়ে তুলবেন একটা তীব্র রাজনৈতিক চেতনা—এই সংকল্পই বুঝি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভে আর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই সংকল্পসাধনেই তিনি ছিলেন অবিচল এবং অতন্দ্র।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

'রাষ্ট্রগুরু' শব্দটি সুরেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যতখানি সার্থক ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে ততখানি অন্যত্র মিলবে কিনা সন্দেহের বিষয়। গুরুর প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে – গুরু তিনিই যাঁর জীবনের অন্তরঙ্গে আছে সত্যের গভীর অনুভব; বহিরঙ্গে অকপট আচরণ আর মননে কথায় ও কার্যে ঐক্য ও স্বচ্ছতা। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এর দুর্লভ সমাবেশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'রাষ্ট্রগুরু' উপাধি তাঁর সার্থক। গুরুরূপে স্বদেশ ও রাজনৈতিক মুক্তির বাণী তিনিই প্রথম এই দেশে এনেছিলেন। শিক্ষক ও নায়করূপে অর্ধ শতাব্দীকাল তিনি কিভাবে এই ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, সেই ইতিহাস তো আজ আমরা ভুলতে বসেছি। রামমোহন যেমন ধর্মজগতে, বিদ্যাসাগর যেমন সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-বিস্তারে, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিধানে, রমেশচন্দ্র যেমন অর্থনৈতিক চিন্তার প্রবর্তনে, তেমনি আমাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ-সাধনে সুরেন্দ্রনাথ একদা যুগান্তর উপস্থিত করেছিলেন। এই চারজন যুগনায়কের চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় – এঁদের প্রত্যেকের চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দৃঢ়তা, গভীরতা আর একনিষ্ঠতা। বর্তমান সভ্যতার যা কিছু উৎকৃষ্ট তা থেকে জ্ঞান ও প্রেরণা নিয়ে এঁরা আমদের জাতীয় সভ্যতার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে সেদিন এঁরাই ছিলেন অগ্রগণ্য।

রমেশচন্দ্রের বিলাত যাত্রা ও বিলাত প্রবাসের অন্যতর সঙ্গী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী কঙ্কণ' স্বদেশহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে রমেশচন্দ্র লিখেছিলেন: "তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই।" তখন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের সূচনাকাল মাত্র। তারপর সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অর্ধ শতাব্দীকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে যে অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস কি আলোচনার যোগ্য নয়? তাঁর সেই সুমহৎ ব্রতসাধনের ইতিহাসের মধ্যেই উৎকীর্ণ হয়ে আছে এমন একটি মানুষের জীবনেতিহাস যিনি একাধারে ছিলেন রাজনীতিক শিক্ষক, নায়ক, গুরু ও দেশ-হিতৈষণার অগ্রদূত।

সে একদিন ছিল যখন 'সুরেন বাঁড়ুজ্যে'—এই নামটি উচ্চারণ করলেই

যুবকদের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যেত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর বালক বয়সে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে মেতে উঠেছিলেন। একাদিক্রমে জীবনের পঞ্চাশ বছরকাল এই পুরুষসিংহ অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর কর্মশক্তির প্রভাবে এই পরাধীন ঘুমন্ত জাতির কানে স্বাধীনতার অগ্নিবাণী শুনিয়েছিলেন। স্বদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাঁর যৌবন-প্রভাতেই; সেই স্বপ্নকেই সার্থক করবার জন্য এই ব্রাহ্মণের প্রয়াসের অন্ত ছিল না, চিন্তার বিরাম ছিল না। তাঁর লেখনী ও জিহ্বা সমানতালেই চলতো। সভ্যজগতের দরবারে স্বদেশের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে আজীবন তিনি যে বিপুল আয়াস স্বীকার করে গিয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে, সেই ইতিহাস তো কোনোদিনই মুছে যাবার নয়।

নবীন ভারতের রাজনীতিক দীক্ষাগুরু সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর কম্বুকণ্ঠই একদিন দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করেছিল। ফিরোজ শা মেহতা, দাদাভাই নৌরজীর মতো ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন যে, সুরেন্দ্রনাথই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যে জাতীয়তার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক অপরিমিত শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই শক্তি মাতৃচরণে নিয়োজিত হয়েছিল। মেধায় ও মনীষায় সমুজ্জ্বল, বাগ্‌বিভূতি সম্পর্কে অতুলনীয়, বহুমুখী প্রতিভায় সমলঙ্কৃত এই মানুষটি একদিন বুকভরা উৎসাহ নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করে দেশবাসীকে আশার বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর বিশ্বাসে স্থির, অচঞ্চল ছিল। নিয়মানুগ পথের পথিক হয়েও তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে। এই বিশ্বাস তিনি মর্মে মর্মে পোষণ করতেন আর এই অটুট বিশ্বাসই তাঁর সকল কর্ম-প্রয়াস ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে উৎসারিত হোত।

শৌখিন রাজনীতিক ছিলেন না সুরেন্দ্রনাথ। দেশের জন্য তাঁর যে ব্যথা ও ব্যাকুলতা, দেশের দুর্দশা দূর করবার জন্য তাঁর যে ঐকান্তিক আগ্রহ—এ সবের উৎস ছিল স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রবল বিশ্বাস ও দেশের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা। দেশ তখন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন, অবসাদে দুর্বল ও

মিস্তেজ। সেই দুর্দিনে আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাকেই জাগ্রত করবার জন্য তিনি নিয়ে এলেন এক অভিনব উন্মাদনা। এ উন্মাদনা যে কী বস্তু ছিল সেদিন, ভাষায় তা বুঝিয়ে বলা যায় না আজ, কল্পনা করা তো দূরের কথা। পুরাণের ভগীরথের মতো শঙ্খধ্বনি করে সুরেন্দ্রনাথ যেন এক নূতন ভাবগঙ্গা এনেছিলেন এই দেশে। এই শঙ্খধ্বনি সেদিন যে শুনেছে সেই-ই মজেছে। তাঁর বক্তৃতা বক্তৃতা মাত্র ছিল না—ছিল সিংহনাদ। বিধিদত্ত এই অসাধারণ ক্ষমতা দেশের লোকের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধনে কী আশ্চর্যভাবে সফলতা লাভ করেছিল, সে ইতিহাসই বা আজ কয়জন জানে?

"He was the maker of us all"—সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত, ভারতে জাতীয়তা উদ্বোধনের আদিগুরু তিনিই। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যাঁরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই সুরেন্দ্রনাথের হাতে-গড়া মানুষ ছিলেন। যে জাতীয়তাবোধ পরবর্তীকালে সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছিল এইসব দিক্‌পাল নায়কদের বহুমুখী কর্ম ও চিন্তার ভিতর দিয়ে, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই অজ্ঞাতপূর্ব জাতীয়তাবোধের জনক। "বিলেতি-দস্তুর একজন পলিটিক্যাল লিবারেল ছিলেন তিনি ছিলেন মডারেট; ছিলেন তিনি বৈধ আন্দোলনের পক্ষপাতী আর ইংরেজের প্রতিশ্রুতিপরায়ণতায় ও ন্যায়বিচারে অন্ধবিশ্বাসী"—এ সবই সত্য। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম? সে যে একেবারে নিখাদ সোনা ছিল—সে কথা কি আজ আমরা বিস্মৃত হব?

সুরেন্দ্রনাথের জীবন এদেশের একটি বিশেষ কালের পলিটিক্যাল ইতিহাস। সেই ইতিহাস লিখবার সময় আজ এসেছে। তাঁর জীবনচরিত রচনার প্রধান উপকরণ তাঁর আত্মচরিত। সুরেন্দ্রনাথের *A Nation in Making* তাঁর পরিণত প্রতিভার ফল এবং ইহাই তাঁর একমাত্র সাহিত্যকর্ম। ভারতবর্ষের কোনো কোনো নেতা সম্পর্কে আমাদের মোহ আছে; সেই মোহ থেকে মুক্ত হতে পারলে আমরা দেখতাম যে, এ পর্যন্ত যে কয়জন জননায়ক তাঁদের স্ব স্ব জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সফলতাই সমধিক।

এ বিষয়ে যথাস্থানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তাঁর আত্মচরিত একাধারে তাঁর জীবনের কাহিনী এবং তাঁর সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রামাণ্য দর্শন ও ইতিহাস। সুতরাং তাঁর জীবনচরিত রচনায় এ বইখানি শুধু নির্ভরযোগ্য নয়, একান্ত অপরিহার্য।

এর পর আছে তাঁর বক্তৃতাবলী আর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর নিজের লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি। সুরেন্দ্রনাথের জীবনচিন্তা প্রতিফলিত হোতো তাঁর বক্তৃতায় ও সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করতে হোলে এগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গেই পাঠ করতে হয়। ১৮৭৯ সাল থেকে তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। একুশ বছর ধরে সাপ্তাহিকরূপে পরিচালিত করার পর 'বেঙ্গলী'-কে তিনি একটি দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করেন বর্তমান শতাব্দীর সূচনাতেই। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে এই যে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সাংবাদিক জীবন, এরই মধ্যে রয়েছে তাঁর জীবনেতিহাসের প্রচুর উপাদান।

তারপর তাঁর বক্তৃতাবলী। এদেশে জনসভায় জনমত সর্বপ্রথম সার্থক-ভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়, এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কথিত ভাষা বা Spoken word-এর যে কী অপরিসীম ক্ষমতা, তা প্রথম জানা গেল কেশবচন্দ্র সেন এবং রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতায়। বাগ্মিতায় অবশ্য কেশবচন্দ্রকে আজ পর্যন্ত কোনো জন-নায়কই অতিক্রম করতে পারেন নি। তবে তাঁর ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। সর্বভারতের জনমত অভিব্যক্ত হোত একমাত্র সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ করি বাগ্মিতায় সুরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার এমনই একটা প্রভাব ছিল যে, তা শ্রোতাকে মুহূর্তমধ্যে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারতো, কিন্তু তাই বলে তাঁর বক্তৃতা কেবল যে জোর গলায় উচ্চারিত কথার স্রোত, এ রকম মনে করা ভুল। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর দুটি বক্তৃতা, ওয়েলবি কমিশনে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ম্যাকেঞ্জি প্রবর্তিত কলিকাতা মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা—এইগুলি

পাঠ করলেই বুঝা যায় যে, তিনি সুযুক্তি ও তথ্যের যথাযোগ্য প্রয়োগেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় যে বিষয়ের সমর্থন করতেন, তাতে দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য এবং ন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী জয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের অন্যতম কারণ। সুতরাং তাঁর প্রতিভার এই দিকটির পরিমাপ করতে হোলে তাঁর বক্তৃতাবলীকে আশ্রয় করতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনার পক্ষে আর একটি মূল্যবান উপাদান কলিকাতা পৌরসভার সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সংশ্রবের ইতিহাস। তিনি একাদিক্রমে বিশ বছরকাল কাউন্সিলর ছিলেন। তেমনি অনেক বছর যাবৎ তিনি উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৯৯ সালে কলিকাতা পৌরসভায় কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এদেশের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। পৌরসভায় তিনি যেরূপ উৎসাহ ও কর্মিষ্ঠতার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, সে আদর্শ বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর জীবনকাহিনী লিখবার পক্ষে এগুলি নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় এবং নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

তেমনি মেট্রোপলিটান কলেজ, ফ্রী চার্চ ইনষ্টিটিউশন, সিটি কলেজ এবং রিপন কলেজে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষকজীবনের বহু উপাদান ছড়িয়ে আছে। শিক্ষকতাই তিনি করেছিলেন এক-আধ বছর নয়, প্রায় সাঁইত্রিশ বছর কাল। জীবনের যে দীর্ঘকাল এই কয়টি শিক্ষানিকেতনের সঙ্গে অধ্যাপকরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ঐ সময়ে ক্লাস-রুমে তাঁর লেকচার শুনবার জন্য শতশত ছাত্র সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতো; প্রেসিডেন্সি এবং অন্য কলেজের ছাত্ররাও রিপন কলেজে এসে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের লেকচার শুনে উপকৃত হোত। রিপন কলেজ (বর্তমান নাম 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ') সত্যই তাঁর অতুলনীয় কীর্তি; এর প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতিবিধানে তাঁর সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই। তাঁর স্বহস্তে গঠিত এই শিক্ষায়তনটি নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের একটি বড়ো অধ্যায়।

তাঁর জীবনচরিতের অন্যান্য উপাদান অন্বেষণ করতে হবে ভারতসভার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মধ্যে, কংগ্রেসের ইতিহাসের আদিপর্বে এবং নবগঠিত

ব্যবস্থাপক সভার বার্ষিক বিবরণগুলির মধ্যে। তাঁর লোকহিতৈষণা, উৎসাহ, এবং কর্মিষ্ঠতার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হোলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভারতসভার ইতিহাস আলোচনা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। চল্লিশ বছরেরও বেশী কাল তিনি এর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন এবং মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতসভা এদেশের প্রথম প্রকৃত জনসভা এবং দেশের শিক্ষিত সাধারণের প্রথম রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র। সুতরাং এর ইতিহাসের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত, এ কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তেমনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্ম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, এ কথাটাও আমাদর মনে রাখতে হবে।

তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই, যথা, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁদের স্ব স্ব জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের কার্যাবলী এবং তাঁর কালকে বুঝবার পক্ষে এগুলিও আমাদের সহায়ক হোতে পারে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে মনীষি রমেশচন্দ্র দত্তের বহু উক্তির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের উল্লেখ আছে; এগুলিও অনুশীলনযোগ্য। এ ছাড়া, একাধিক ইংরেজ লেখক এবং তাঁর সময়কার একাধিক ইংরেজ রাজপুরুষ প্রণীত ব্যক্তিগত বিবরণের মধ্যেও সুরেন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তথ্য হিসাবে এগুলিও গ্রহণযোগ্য। তাঁর সমকালীন সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে যাঁরা স্বীকৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যর ফিরোজ শা মেহতা, দাদাভাই নৌরজী, গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে এবং বালগঙ্গাধর টিলক প্রভৃতির জীবনেতিহাসের মধ্যেও সুরেন্দ্র-নাথকে আমরা পাই; সুতরাং তাঁর জীবনচরিত রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান এখানেও মিলতে পারে।

প্রসঙ্গত সুরেন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচয়িতা হিসাবে একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি সূর্যকুমার ঘোষাল। ঘোষাল মহাশয়ের রচিত 'কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ' সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম জীবনচরিত। সুরেন্দ্রনাথের জীবিত-কালেই ইহা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩১৮ (ইংরেজী ১৯১১ সাল)। বাংলাদেশে কোনো খ্যাতিমান জননায়কের জীবিতকালে

তাঁর বিষয়ে একখানি জীবনচরিত রচিত এবং প্রকাশিত হওয়া বোধ হয় এই প্রথম। 'কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ' অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবনচরিত নয়, ইহাতে তাঁর জীবনের শেষ চৌদ্দ বছরের ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। তথাপি ইহা একখানি প্রামাণ্য পুস্তক এবং রাষ্ট্রগুরুর জীবনচরিত আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থের ভূমিকায় ঘোষাল মহাশয় লিখেছেন: "আমার পূর্বে যাঁহারা যাঁহারা সুরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে যাহা কিছু কিছু ইংরাজী বা বাংলায় মুদ্রণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রধানতঃ স্বর্গীয় শ্রীশবাবুর এবং শ্রীমতী সরযূবালা দেবীর লিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছি।··· সুরেন্দ্রবাবুর জীবনকথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত ও আলোচিত হইলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তকে পরিণত হইত। তাঁহার জীবনকাল সংক্রান্ত যাহা কিছু অবগত আছি, তাহা সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়া দিতে পারিলাম না; এবং যাহা প্রকাশিত হইল, ইহাতে ঘটনা সংযোজন ভিন্ন আর কিছুই আলোচনা করিবার সবিশেষ সুবিধা পাইলাম না।···এই পুস্তকখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে আমাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। ঘটনাবলী নির্ভুল প্রকাশ করাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছি।"

ঘোষাল মহাশয়ের ভূমিকায় উল্লিখিত শ্রীশবাবু হোলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের সময় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রগুরুর জীবনকথা আলোচনা করেন এবং পরে ঐ প্রবন্ধগুলি একত্র করে 'সুরেন্দ্রজীবনী' এই নামে প্রকাশ করেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে মজুমদার মহাশয়কে আমরা সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনীকারের স্থান দিতে পারি। সরযূবালা দেবী সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। ইনি স্বনামধন্য ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জির সহধর্মিণী ছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী বসু-সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় সরযূদেবী তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবনচরিত ধারাবাহিকরূপে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ইহা বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সালের (ইংরেজী ১৯০৮ সাল) কথা। কিন্তু এ আলোচনা অসমাপ্ত—মাত্র তিন মাস পর্যন্ত লিখে তিনি উহা বন্ধ করেন। কি কারণে বন্ধ করেন, তা জানা যায় না। অনুমান হয়, সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহাতে আপত্তি করে থাকবেন।

বিংশ শতকের প্রারম্ভকালে সুরেন্দ্রনাথকে আমরা তাঁর খ্যাতির মধ্য গগনে দেখতে পাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁকে দেশের 'মুকুটহীন সম্রাট'-এর দুর্লভ আসনে সেদিন স্থাপিত করেছিল। তাই আমরা দেখতে পাই যে, সমসাময়িককালে এমন একখানি পত্র-পত্রিকা ছিল না যাতে সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা না হয়েছে। এ সৌভাগ্য সেদিন একমাত্র তাঁরই হয়েছিল। ঐসব সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলির মধ্যেও সুরেন্দ্রনাথের জীবনচরিতের বহু উপাদান পাওয়া যায়। লেখক যতদূর পেরেছেন ঐসব প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে বর্তমান গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

এইসব বিবিধ উপাদানের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রগুরুর জীবনচরিত তথা তাঁর সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় এইবার আমরা প্রবৃত্ত হব। তাঁর মৃত্যুর পর আটত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ভারতবর্ষ আজ তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করেছে। সুতরাং আজ সুরেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী কর্মকৃতি ও চিন্তা-ভাবনার যথাযোগ্য অনুশীলন ও মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। ১৯১৭ সালের পর থেকে তাঁর জীবনের উপর বিস্মৃতির যে যবনিকা নেমে এসেছিল, আজ সেই যবনিকা তুলে ধরবার দিন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবযুগের ইতিহাসে স্বাধীনতার এই শ্রেষ্ঠতম পূজারী সম্পর্কে তাঁর স্বজাতির যে নিষ্করুণ উপেক্ষা ও অনাদর, যে অশ্রদ্ধা ও অবহেলা তাঁর শেষজীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল, আজ তাই অপসারণ করে, শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে রাষ্ট্রগুরুকে তাঁর মর্যাদার আসনে স্থাপন করবার দিন।

॥ দুই ॥

মহত্ত্বের সকল চিহ্ন ললাটে নিয়েই সুরেন্দ্রনাথের জন্ম।

তাঁর কর্মবহুল জীবনকে আমরা ছয়টি প্রধান পর্বে ভাগ করতে পারি, যথা, (১) ১৮৭১-৭৫; এই সময়ে তিনি শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন এবং এক বছর পরে সিভিল সার্ভিস থেকে তিনি পদচ্যুত হন; তারপর সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন এবং ব্যর্থ মনোরথ হবার পর তিনি ব্যারিস্টারি পড়েন, কিন্তু বেঞ্চাররা একজন পদচ্যুত সিভিলিয়ানকে ব্যারিস্টার হিসাবে গণ্য করতে অসম্মত হওয়ায় তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। (২) ১৮৭৬-৮৩; এই সময়টা তাঁর কর্মজীবনের সূচনাকাল; (৩) ১৮৮৪-১৯০৫, এই সময়ে তিনি সর্বভারতীয় নেতা এবং বাংলার মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে সম্পূজিত হন। তাঁর শিক্ষক ও সাংবাদিকজীবনেরও মধ্যাহ্নকাল এই সময়ে; (৪) ১৯০৬-১৯১০, বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার ইতিহাস-বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা। (৫) ১৯১১-১৮ বঙ্গভঙ্গ রদ ও নূতন শাসন সংস্কারের প্রবর্তন এবং মডারেট দলের নেতা হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক সেই সংস্কার সমর্থন এবং (৬) ১৯১৯-২৫; সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং চার বছর পরে সাধারণ নির্বাচনে তাঁর পরাজয়; রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং আত্মজীবনী রচনা; তারপর ১৩৩২ সালের (ইংরেজী ৬ই আগষ্ট, ১৯২৫) ২২শে শ্রাবণ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনাগুলি, যেসব ঘটনার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যেগুলির সম্পাদনে তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ আছে, সেগুলি এই ছয়টি পর্বেরই অন্তর্গত।

সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হওয়া সুরেন্দ্রনাথের জীবনের বোধহয় সর্বপ্রধান ঘটনা।

সুতরাং তাঁর চরিত্র-কথা তাঁর জীবনের এই পর্ব থেকেই আরম্ভ করা যেতে পারে। ১৮৭১, ২২ শে নভেম্বর। সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে যুবক সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে এলেন। শ্রীহট্ট জেলা তখন বাংলাপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ সালে নূতন আসাম প্রদেশ যখন গঠিত হয়, শ্রীহট্ট তখন এই নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলারূপে পরিগণিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, কলিকাতা থেকে শ্রীহট্ট পৌঁছতে তাঁর এক সপ্তাহ লেগেছিল। মিঃ এইচ সি সাদারল্যাণ্ড তখন এখানকার জেলাশাসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ তাঁরই অধীনে একজন শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত হন।

বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন: "সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া প্রথমে শ্রীহট্টে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। আমি তখন শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। এখানেই সুরেন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম দেখি। তখনকার দিনে দেশীয় সিভিলিয়ানরাও ইংরাজ সিভিলিয়ানদের মতন স্বদেশের সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন। ইঁহারা ইংরাজী পোষাক পরিতেন, ইংরাজী ধরনে চলাফেরা করিতেন, সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নিজেদের পদমর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইংরাজী পোষাক পরিলেই বাঙালী ইংরাজ হইতে পারে না। সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে ইংরাজের কেবল অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে সকল বিষয়ে আপনাকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিজিত বাঙালীর এই স্পর্ধা বিজেতা ইংরাজ রাজপুরুষদের অসহ্য হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ একদিকে দেশীয় সমাজের সঙ্গে মিশিতে চাহিলেন না; আপনার অভিনব পদমদে বিভোর হইয়া তিনি স্বদেশের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গেও মিশিতে চাহিলেন না, অন্যদিকে স্থানীয় ইংরাজ সমাজেও আপনার শিক্ষা ও পদের যোগ্য আসন পাইলেন না। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা ইংরাজ রাজপুরুষদের অসূয়াই জাগাইয়া তুলিল।"*

এরই পরিণতি তাঁর জীবনের প্রধান দুর্ঘটনা—পদচ্যুতি অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসের স্বর্গ থেকে একেবারে ভূ-পৃষ্ঠে পতন। বিপিনচন্দ্র আরো লিখেছেন: "ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের ঘটাঘটি বাধিয়া যায়। এই অপেক্ষাকৃত অপরিণতবয়স্ক বাঙালী সিভিলিয়ানের ধৃষ্টতা

* বাংলার নবযুগের কথা: বিপিনচন্দ্র পাল

ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অসহ্য হইয়া উঠিল। এক সামান্য অনবধানতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া রাজকর্ম হইতে অপসৃত হয়েন। ইহা তাঁহার নিজের পক্ষে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এই ঘা না পাইলে সুরেন্দ্রনাথের বিদেশের মোহ কাটিত কি না সন্দেহ।"

বিপিনচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে একটু অসঙ্গতি আছে। প্রথম, সাদারল্যাণ্ড ইংরেজ ছিলেন না, ছিলেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। দ্বিতীয়, পোষাক-পরিচ্ছদে সুরেন্দ্রনাথ কোনোদিনই ইংরেজের অনুকরণ করেন নি। তিনি বিলেত-ফেরৎ এবং সিভিলিয়ান ছিলেন সত্য, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে তিনি কোনোদিন সাহেব সাজেন নি। বিপিনচন্দ্র পালই অন্যত্র বলেছেনঃ "সুরেনবাবু হ্যাট ও গলা-খোলা কোট পরিতেন না, লম্বা পার্সী কোট ও টুপি পরিতেন।" কথিত আছে, শ্রীহট্টের ইংরেজ সিভিলিয়ানরা তাঁকে ইংরেজ সাজাতে কম চেষ্টা করেন নি। সেকালের বিলেত-ফেরৎদের রীতি অন্যরকম ছিল। বিশেষ করে যাঁরা সিভিলিয়ান ছিলেন তাঁরা তো আচারে-আচরণে পুরোদস্তুর 'সাহেব' হয়ে যেতেন; হ্যাট-কোট না পরলে তাঁদের জাত থাকত না। এদেশে সিভি-লিয়ানদের মধ্যে এ বিষয়ে সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি কখনো সাহেবী পোষাক পরতেন না; এমন কি যখন তিনি শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তখনো না। হ্যাট বা গলা-বন্ধ বা বুক-খোলা (Open breast) কোট তাঁকে কেউ কখনো পরতে দেখেনি। প্যাণ্টালুনের উপরে আমরা এখন যাকে পার্সী কোট বলি, তাঁর পরিধানে তাই থাকত। মাথায় শোলার হ্যাট ছিল না, একটা বিভারের টুপি থাকত। সুন্দরীমোহন দাস বলেছেন, "সেযুগে সুরেন্দ্রনাথের সেই আজানুলম্বিত আচকান এমন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল যে লোকে তার নাম দিয়েছিল 'সুরেন্দ্র-কোট'।" সিভিলিয়ান হয়েও সেইকালে সুরেন্দ্রনাথ যে একেবারে সাহেব সাজেন নি, এ নিতান্ত সামান্য কথা ছিল না। বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত এজন্য তাঁকে কত সময়ে কত অনুযোগ করতেন; বলতেন, "সুরেন, ইংলিশ ড্রেস পর না কেন?" উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুকে হেসে বলতেন, "ধাতে সয় না ভাই; তোমরা ভদ্র ভৃত্য, তোমরা পারো।" তিনি Civil servant-এর বাংলা করেছিলেন 'ভদ্র-ভৃত্য'। তাঁর পোষাকের কথাটা এখানে উল্লেখ করলাম এজন্য যে, এই ব্যাপারে, এখন মনে হয়, তাঁর পরবর্তী

জীবনে স্বাজাত্যাভিমান এবং দেশসেবার পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল। তাঁর জীবনকথা আলোচনা প্রসঙ্গে এটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

তাঁর পদচ্যুতির কাহিনী তিনি আত্মচরিতে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যেটুকু তিনি উল্লেখ করেননি সেটুকু আমি অন্য একটি সূত্রে সংগ্রহ করেছি। এই দুইটি বিবরণ মিলিয়ে তাঁর পদচ্যুতির ইতিহাসটা দাঁড়ায় এইরকম। সাদারল্যাণ্ড প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ স্নেহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কেন যে তিনি শ্রীহট্টের শ্বেতাঙ্গ আমলাতন্ত্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন সে ইতিহাস তিনি নিজে যতটা আত্মচরিতে ব্যক্ত করেছেন, তা সম্পূর্ণ নয়। তাঁর সহধর্মিণী (চণ্ডী দেবী) মেমদের মতো পোষাক পরে শহরের সদর রাস্তায় স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। শহরের বিলাতি মেমদের এটা বড়ো সহ্য হয় নি। একদিন রেসের মাঠে মেমদের গ্যালারিতে বসবার দাবী করেছিলেন সুরেন্দ্র-গৃহিনী—তিনি তাঁর স্বামীর পদের উপযোগী আসন দাবী করেছিলেন। বিবিদের এতে গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং সেই থেকে শহরের সাহেবরা সুরেন্দ্রনাথকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তা সইবেন কেন? তিনিও নিজের যথাপ্রাপ্য সম্মান আদায় করতে ছাড়েন নি। এইসব কারণেই তিনি শীঘ্রই শ্রীহট্টের বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন।

কথাটা যখন জানাজানি হয় তখন কাছারীর কেরানিদের মধ্যেও এই নিয়ে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা। বাঙালী-চরিত্রের একটা বড়ো লজ্জাকর বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালী কখনো কখনো বাঙালীকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে; পরশ্রীকাতরতা অনেকের মজ্জাগত, বিশেষত চাকুরীজীবি মহলে এই অসূয়াভাবটি অত্যন্ত প্রবল। সেকালে বহু বাঙালী কেবল ইংরেজের অধীনতা নয়, পরন্তু ইংরেজের হাতে অযথা অপমান পর্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে সহ্য করত। কিন্তু স্বজাতি কেউ ইংরেজের সমান আসন পেলে তার পদের উপযোগী সম্মান দিতে হোলে যেন অধস্তন বাঙালী কর্মচারিদের কলজে ফেটে যেত। সুরেন্দ্রনাথের অধীনস্থ স্বদেশী আমলার দল প্রথম থেকেই তাঁর প্রতি স্বল্পবিস্তর বিরূপ ছিলেন। ক্রমে যখন রাষ্ট্র হোল যে, তিনি উপরওয়ালা য়ুরোপীয়ানদের বিরাগভাজন হয়েছেন তখন তা তাঁদের অসূয়াবুদ্ধিতে ইন্ধনের কাজ করল—তাঁরা গোপনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে যেতে

আরম্ভ করলেন। সাদারল্যাণ্ড বুদ্ধিমান; এদের কাছ থেকেই তিনি সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তরের সকল খবর নিতেন। এইভাবেই সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে একটা ছোটখাটো ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিল। এরই পরিণতি তাঁর পদচ্যুতি।

ব্যাপারটা অতি সামান্যই ছিল। তাঁর এজলাসে একবার একটি নৌকা-চুরির মামলা দায়ের হয়। যুধিষ্ঠির নামে একজন এই মামলায় প্রথম আসামী ছিল। তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়াতে অপর এক ব্যক্তি এই চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং তার অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তার যথাযোগ্য শাস্তিও হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নাম একেবারে এই মামলার নথী থেকে উঠে যায়নি। নির্দোষ সাব্যস্ত হবার পরেও তার নামটি এই মোকদ্দমার নথীপত্রে আসামীর তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে। এর ফলে যুধিষ্ঠিরের উপরে ওয়ারেণ্ট জারি হয়, আর ফলতঃ এই মামলাটি শেষ (closed) হয়ে গেলেও সালতামামীর হিসাবে একে মুলতুবী রয়েছে বলে লিখা হয়। এইসব নথীপত্রে অবশ্য হাকিমের সই ছিল। সুতরাং মিথ্যা return দেওয়া, একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে আসামীভুক্ত করে রাখা এবং আদালতে হাজির থাকলেও 'ফেরার' বলে তার নাম নথীভুক্ত করা—সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে এইসকল অভিযোগ উপস্থিত হয়। সাদারল্যাণ্ড তাঁর বিরুদ্ধে জজের কাছে লিখলেন। কিন্তু তিনি একবারও বিবেচনা করে দেখলেন না যে, হাকিমের নথী খুঁটিয়ে পড়বার কথা নয়। পেশকারের উপরেই তাঁরা সাধারণতঃ নির্ভর করে থাকেন। জজসাহেব সকল কাগজপত্র দেখে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের অমার্জনীয় অসাবধানতা (unpardonable carelessness")—সাব্যস্ত করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। জজ তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন; "এই নৌকা-চুরির মামলায় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত (হাজির) আসামীকে ফেরার বলে নথীভুক্ত করাতে অত্যন্ত অসাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর হাতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আর থাকা বিধেয় নয়।"

সুরেন্দ্রনাথ তো স্তম্ভিত। জজের এই মন্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিতটা প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাঁকে কিছুদিনের জন্য নিম্নতর শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকারে রাখলেই এই অনবধানতার যথেষ্ট শাস্তি হবে। কিন্তু হাইকোর্ট অথবা বাংলা সরকার সুরেন্দ্রনাথকে এ রকম লঘুদণ্ড দিতে রাজী হোলেন না। তাঁর

বিচারের জন্য একটি কমিশন বসল। কমিশনের সদস্য তিনজনই শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এই মামলার শুনানী যাতে কলিকাতায় হয় এবং তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী ব্যয়ে যাতে একজন কৌঁসুলী নিযুক্ত হন, এরূপ আবেদন সুরেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন। এ আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তাঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে (W. C. Bonnerjee) নিযুক্ত করবার জন্য। উমেশচন্দ্র তখন উদীয়মান ব্যারিস্টার। কিন্তু সরকারী মহলের ভাবগতিক দেখে সুরেন্দ্রনাথ নিবৃত্ত হন এবং তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য মিঃ মণ্ট্রিও নামক একজন শ্বেতাঙ্গ কৌঁসুলীকে নিযুক্ত করেন। কমিশন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু কোনো সুপারিশ করেন না। কমিশনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ভারত সরকার তাঁকে সিভিল সার্ভিস থেকে সরিয়ে দেন। কলিকাতায় বসে তিনি এই সরকারী আদেশ প্রাপ্ত হন। আদেশে বলা হয়েছিল যে, পদচ্যুত হোলেও সুরেন্দ্রনাথ মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে পেনসন পাবেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এটাকে করুণার দান বা "compassionate allowance" বলে উল্লেখ করেছেন।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড হোল। তবে তাঁর এই পদচ্যুতির আরো একটা নিগূঢ় কারণ ছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন: "My success was the cause of my official ruin. At any rate I thought it largely contributed to it"—এবং এর কারণ আর কিছুই ছিল না; কর্মে নিযুক্ত হবার পর সমস্ত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অল্পকালের মধ্যেই একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এ সময়ে মিঃ পোসফোর্ড নামে আর একজন সিনিয়র সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁরা দুজনেই পরীক্ষা দিলেন; তিনি কৃতকার্য হোলেন আর পোসফোর্ড অকৃতকার্য হোলেন। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মিঃ পোসফোর্ড ছিলেন একজন য়ুরোপীয়ান আর আমি একজন ভারতীয়। শ্রীহট্টের মতো একটি ছোট শহরে আমার কৃতকার্যতা এবং পোসফোর্ডের অকৃতকার্যতা স্বভাবতই জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। যদিও মিঃ সাদারল্যাণ্ড একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন তথাপি তাঁর মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল।" সুরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "He did not like that I should have passed and

that Mr. Posford should have failed. The contrast seemed in his eyes to be derogatory to the prestige of the ruling race." সেই থেকেই তিনি তাঁর উপরওয়ালার বিরাগভাজন হন।

যাই হোক, তিনি পদচ্যুত হোলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে অপযশের সূত্রপাত এইখান থেকেই। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, সুরেন্দ্রনাথ দায়ে পড়ে স্বদেশহিতৈষী হয়েছিলেন। সত্যি কি তাই? ছাত্রজীবনে যিনি নিজের স্কলারশিপের টাকা দেশের ও দশের উপকারে ব্যয় করতেন, যাঁর শৈশবে উপচিকীর্ষাবৃত্তির পরিস্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়, তিনি দায়ে পড়ে স্বদেশহিতৈষী হয়েছিলেন, এই মত আমরা সমর্থন করি না। আজ এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, তাঁর বিরোধীপক্ষেরা তাঁর জীবিতকালেই এই পদচ্যুতিকে একটা বিরাট অপরাধের আকারে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, সুরেন্দ্রনাথ না জানি কি গুরু অপরাধ করে সম্মানিত রাজকর্ম থেকে অপসৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে যে কথা বলেছেন তাই-ই ঠিক। আসলে পরাধীন একটি দেশের কোলে জন্মগ্রহণ করে তিনি ইংরেজদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেছিলেন—যে সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশের পক্ষে তখন বহু বাধা ছিল। সুরেন্দ্রনাথের এই পদচ্যুতিটা যে আদৌ ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়নি সে কথা পরবর্তীকালে একজন ছোটলাট স্বীকার করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিষয়টিকে একটি অভিসন্ধিমূলক প্রয়াস ('wicked proceeding') বলে উল্লেখ করেছেন। ছোটলাট স্যর এডওয়ার্ড বেকারও গোখলেকে একবার বলেছিলেন: "We have done him a grievous wrong"—এই যে একজন উচ্চ রাজপুরুষের স্বীকৃতি—"আমরা তাঁর প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছি"—এর থেকেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল আর সে ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল তাঁর স্বাজাত্যবোধ। বিলেত-ফেরৎ সিভিলিয়ান এবং ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া সত্ত্বেও তিনি পোষাক-পরিচ্ছদে পুরোমাত্রায় দেশীভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁর উচ্চতম প্রভুর তিনি খোশামদ করতেন না। তখনকার দিনে ইংরেজ রাজপুরুষদের চক্ষে একজন ভারতীয়ের পক্ষে এইরকম আচার-

আচরণ অপরাধ বলে গণ্য হবারই কথা। তার সঙ্গে অবশ্য মিলেছিল সুরেন্দ্র-গৃহিণীর স্পর্ধিত আচরণ—মেমদের সঙ্গে এক গ্যালারিতে বসবেন! এটাও একটা অপরাধ বৈ কি।

সুরেন্দ্রনাথের এই পদচ্যুতিতে সারা দেশে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণ এই ব্যাপারে শাসকের ন্যায়বিচারের উপর সেদিন তাদের আস্থা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। ভারতে ইংরেজশাসনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের এই পদচ্যুতি নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর জীবনেও। কারণ এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করেই রাষ্ট্রগুরুর জীবনে দিক্-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল; এই পদচ্যুত সিভিলিয়ানই পরবর্তীকালে শাসকের চক্ষে 'বিপ্লবী' এবং 'dangerous man' বলে আখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী পরে। পদচ্যুতির আট বছর পরে, সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন. তাঁকে কলিকাতার একজন অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে ঐ একই সময়ে একজন Justice of the Peace-এর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কথিত আছে, তাঁকে যখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়, সুরেন্দ্র-গৃহিনী তখন প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "একবার তাড়িয়ে দিয়ে আবার এখন ডাকা কেন?" সম্ভবত শাসকগোষ্ঠীর মনে তখন এই ধারণা হয়েছিল যে, সুরেন্দ্রনাথ সত্যই নিরপরাধ এবং তাকে অন্যায়ভাবেই সার্ভিস থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে। অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জাষ্টিস অব দি পীস্ এর পদে তাঁর নিয়োগ তাঁর প্রতি অন্যায়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছিল কিনা, কে জানে?

বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে, রাজকার্য থেকে সুরেন্দ্রনাথের অপসারণ দেশের পক্ষে 'শাপে বর'-স্বরূপ হয়েছিল। পদচ্যুত হোলেন কিন্তু এতটুকু দমলেন না তিনি। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল অদম্য উৎসাহ ও আশাশীলতা। যৌবনকাল থেকেই তাঁর জীবনে এই গুণগুলি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনটাই ছিল ঝঞ্ঝাটে পরিপূর্ণ—প্রতিপদে ছিল বাধা-বিঘ্ন। বিলাতে সিভিল সার্ভিস্ পড়তে গিয়ে বয়সের ব্যাপার নিয়ে কী দুর্ভোগই না হয়েছিল। সিভিল সার্ভিস কমিশনাররা তাঁর বয়স সম্পর্কে আপত্তি তুলে, যথেষ্ট অনুসন্ধান না করেই সুরেন্দ্রনাথের নাম নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা থেকে তুলে দিয়েছিলেন।

তিনি দমলেন না। বিলাতে কুইনস্ বেঞ্চ ডিভিসনে মোকদ্দমা করে জিতেছিলেন এবং কমিশনারদের তাঁকে পুনরায় তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবন গভীরভাবে আলোচনা করে দেখেছি সেই চরিত্রে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না। পদচ্যুত হোলেন, দমলেন না; পদচ্যুতির হুকুম রদ করতে চেষ্টা করবার জন্য বিলাতে ছুটলেন, কিন্তু তাতে সফলকাম হোলেন না। এতেও হাহুতাশ না করে ব্যারিস্টার হবার জন্য মিডল্ টেম্পলে term পূরা করলেন, কিন্তু বেঞ্চাররা একজন পদচ্যুত সিভিল সার্ভ্যান্টকে ব্যারিস্টার শ্রেণীভুক্ত করলেন না। তিনি তাদের দিয়ে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য খুব চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো ফল হোল না। এতেও তিনি ভগ্নোদ্যম হোলেন না। এই যে তাঁর প্রকৃতির অদম্যতা, এই-ই ছিল তাঁর জীবনের বিধিদত্ত একমাত্র মূলধন। তিনি যতবার নিরাশ হয়েছেন ততবার পূর্ণ উদ্যমে আবার কৃতিত্বের নূতন পথে চলতে চেষ্টা করেছেন; যতবার ভূপতিত হয়েছেন, ততবার ধূলো ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জীবন-সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল না। তাঁর এই পৌরুষ শুধু প্রশংসার জিনিস নয়, একান্তভাবে অনুশীলনের বিষয়। জীবনে সকল রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি অবিচলিত থাকতেন। একমাত্র পিতৃবিয়োগ ভিন্ন তিনি আর কখনো কোনো বিপদে অধীর হন নি। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

এদেশে স্বৈরাচারী আমলাতন্ত্রের প্রথম 'বলি' সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন বড়ো বিচিত্র। প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রামের দ্বারা চিহ্নিত সেই জীবনের প্রতি আমরা আজ যখন একবার সানুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন কী দেখতে পাই? দেখতে পাইতে পাই যে, দৈব-বিড়ম্বিত এই দেশে পৌরুষের জলন্ত আদর্শ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ঐকান্তিক সাধনা ও হৃদয়ের বল দ্বারা রাজনীতিতে অসাধ্য সাধন করেছেন। অখণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারকে তিনি পদে পদে আপন নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছেন। তাঁর প্রতি ব্যবহারে ইংরেজকে অনেকবার 'থুড়ি' বলতে হয়েছে। যে মুখে সরকার তাঁকে 'চ্যাংমুড়ি কানি' বলেছেন, সেই মুখে আবার 'জয় বিষহরি' বলে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছেন—সাধ্যসাধনা করে মন্ত্রিত্বের আসনে বসিয়েছেন। পদচ্যুত সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ, ইংরেজ সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বজাতির রাজনীতিক

মুক্তিসাধনকে তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই জাতিসংগঠনকারীর জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে কয়েক খণ্ড বই লিখতে হয়।

আমরা জানি, অবাস্তব কল্পনা বা আবেগময় সাময়িক উত্তেজনা তাঁর রাজনীতিক উদ্যমকে কখনো চালিত করেনি। সুস্পষ্ট আকারে উদ্দেশ্যটি মানসনেত্রে উদ্ভাসিত রেখে, স্থিরবুদ্ধিতে উপায় নির্ণয় করে, তিনি কিভাবে কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়েছিলেন, এইবার আমরা সেই কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করব। অর্ধশতাব্দীব্যাপ্ত সেবার দ্বারা তিনি যে দেশের অবস্থা অসম্ভাবিতরূপে পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন, তার রহস্য ও মূলের সন্ধান আগে লওয়া দরকার, নতুবা ইতিহাসে এই মানুষটির ভূমিকার তাৎপর্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে না। এদেশে স্বদেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ যজ্ঞের সামগায়ক উদ্গাতা নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র আর এর আহ্বানকর্তা হোতা সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই বলেছেন: "সুরেন্দ্রনাথ তারকা-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভারত-গগনে সুপ্রকাশ। তাঁহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, তাই তাঁহাকে ভক্তি করিতে, শ্রদ্ধা করিতে, ভালবাসিতে সকলেরই প্রাণ আকুল হয়।"

॥ তিন ॥

সুরেন্দ্রনাথের জন্মকাল ইংরেজী ১৮৪৮ সাল আর তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ ১৮৭৫ সালে। তাঁর পিতামহ ছিলেন প্রাচীনপন্থী এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিত। তিনি কঠোরভাবে ব্রাহ্মণের আচারধর্ম পালন করতেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম—পূজা-পাঠ, ধ্যান-ধারণা, সন্ধ্যা-আহ্নিক ইত্যাদি তিনি সুনিয়মিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ে করে যেতেন। এইরকম কঠোরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করেও তিনি কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণকে তখনকার দিনে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। এই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের পিতা। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। দুর্গাচরণ হিন্দুকলেজের একজন বিশিষ্ট ছাত্র ও ডেভিড হেয়ারের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, দুর্গাচরণ একবার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অনুচিত কোনো কাজ করেছিলেন। এর জন্য তাঁর পিতা এমনই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর রোষ থেকে পরিত্রাণের জন্য দুর্গাচরণকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। দুর্গাচরণের মা এতে যথেষ্ট মর্মবেদনা অনুভব করেন। শোনা যায়, হেয়ার সাহেব তখন দুর্গাচরণের মা-কে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

দুর্গাচরণ ডেভিড হেয়ারের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা তিনি ডাক্তারি পড়েন। কিন্তু তাঁর অভিভাবকদের তাতে খুবই অসম্মতি। এই সময়ে হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে ও সহায়তায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যথাসময়ে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু পড়বেন কখন? মহামতি হেয়ার সাহেব তখন প্রত্যহ তাঁকে স্কুল থেকে কয়েক ঘণ্টা ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে এই সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে দুর্গাচরণের ডাক্তারি পড়া হোত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এমনি আরেকজন মহানুভব খ্রীষ্টান মিশনারির বদান্যতা ভিন্ন ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাই দেওয়া হোত না—এই কথা পুত্র আশুতোষকে বলেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ।

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমনি মহৎপ্রাণ অন্যান্য মিশনারিদের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। খ্রীষ্টান মিশনারিদের সম্পর্কে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ বা হিন্দু-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের যতই বিরূপ মনোভাব থাকুক না কেন, এ কথা সত্য যে, সেই যুগে বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর জাগরণ এবং তাদের মানসিক বিকাশসাধনে এইসব বহু-নিন্দিত মিশনারিদের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল, সেই ইতিহাস আজো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় তাই মহামতি ডেভিড হেয়ারের কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "David Hare, one of the pioneers of English education in Bengal, came out to India as a watch-maker and died as a prince among philanthropists, loved in Hindu homes by their inmates, with whom his relations were friendly, and even cordial." সুরেন্দ্রনাথ এখানে সমগ্র বাঙালী-জাতির হোয়েই ডেভিড হেয়ারের তর্পণ করেছেন।

দুর্গাচরণ পরে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। 'ডাক্তার দুর্গাচরণ' এই নামটি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরতো।. বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু ছিলেন তিনি এবং এঁরই কাছে বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা করেছিলেন। দুর্গাচরণ প্রতীচ্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। কাজেই কুলীন ব্রাহ্মণের গোঁড়ামি বা সংস্কার থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি হিন্দুকলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র-দলের সমসাময়িক ছিলেন এবং আচার-আচরণে তিনিও তাঁর সমকালীন ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের মতোই ছিলেন। প্রতীচ্য ভাবরস আকণ্ঠ পান করে-ছিলেন দুর্গাচরণ। যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতি অচলানিষ্ঠা ও ভক্তি এবং হিন্দুর চিরাচরিত আচারধর্মের তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটবার উপায় ছিল না। কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে যুবক দুর্গাচরণের চিত্ত ষোল আনা প্রতীচ্যভাবাপন্ন—নূতন সমাগত ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতায় পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং এই পরিবারে এই দুইটি পরস্পর বিপরীত ভাবের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার এই যে সংঘর্ষ, হিঁদুয়ানী ও ইংরেজীয়ানার এই যে ঘাত-প্রতিঘাত, এ কেবল সুরেন্দ্রনাথের পরিবারেই

যে নিবদ্ধ ছিল তা নয়; এই বিচিত্র সংঘর্ষ তখন কলিকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত প্রায় পরিবারের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথের শৈশব এই পরিবেশেই অতিবাহিত হয়। তিনি ভাব-সংঘাত যুগের সন্তান। তাঁর ছাত্রজীবন সম্পর্কে স্বরচিত আত্মজীবনীতে তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বাংলা লেখাপড়া শিখবার জন্য তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখানে দু'বছর পড়ার পর তিনি পেরেণ্টাল য়্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন (Parental Academic Institution) নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর ইংরেজী লেখাপড়ার হাতেখড়ি এইখানেই এবং প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয়েই তাঁর ছাত্রজীবনের আরম্ভ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাপ্তেন ডবটন। প্রধানত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরাই এখানে অধ্যয়ন করত। সুরেন্দ্রনাথ যখন ছাত্র হিসাবে এখানে এলেন, তখন ইংরেজীর একটি শব্দও তিনি জানতেন না। তখন সবেমাত্র তাঁর ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হয়েছে আর বানান শিখবার একটি কেতাব নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করতেন। প্রথম প্রথম সহপাঠিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তাঁর খুবই অসুবিধা হোত, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে অল্পদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের মুখে খৈ ফোটার মতো ফুটে উঠলো ইংরেজী বুলি। গ্রামার তখনো পর্যন্ত রপ্ত হয়নি, কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ অতি বিশুদ্ধ—এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা তা শুনে বিস্মিত হোত।

সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এখনকার ছেলেদের যেমন সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের সময়ে সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন আমার ইংরেজী ব্যাকরণের বিদ্যা লেনীর গ্রামারকে অতিক্রম করেনি। এখনকার দিনে বাড়িতেও শিক্ষক রেখে ছেলেদের পড়াতে হয়; বিদ্যালয়েও শিক্ষকেরা ছাত্রদের পড়া বলে দেন। স্কুল ও কলেজে যতদিন আমি পড়েছিলাম ততদিন আমার জন্য কোনো গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয় নি। আমি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হোয়েই ইংরেজী ও ল্যাটিন—এই দুটি কঠিন ভাষা শিক্ষা করেছি। সময়ে সময়ে যখন নিজের বুদ্ধিতে কুলোত না, পিতার সাহায্য গ্রহণ করতাম, তাঁর কাছ থেকে পাঠ বুঝে নিতাম। এর জন্য

আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ইহা আমাকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়েছিল; উত্তরকালে এই শিক্ষা অতীব মূল্যবান হয়েছিল। স্কুল-কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবন নিতান্ত বিশিষ্টতাশূন্য ছিল না। প্রত্যেক বছরই আমি প্রাইজ পেতাম। আমি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করতাম না বটে, কিন্তু আমার নাম বরাবরই শীর্ষস্থানের কাছাকাছি থাকত। বাল্যকালে নীচু ক্লাসে আমার যেসব সহপাঠী আমাকে পরাভূত করেছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় আমি তাদেরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলাম। অধ্যবসায় এবং উদ্দেশ্য-সাধনের নিষ্ঠাই মানুষকে জয়যুক্ত করে।"

"অধ্যবসায় এবং উদ্দেশ্য-সাধনের নিষ্ঠাই মানুষকে জয়যুক্ত করে"—সুরেন্দ্রনাথের জীবনানুশীলনের পক্ষে তাঁর এই উক্তিটি বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য। বস্তুত, উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে এবং শিক্ষা ও রাজনৈতিক চিন্তার বিস্তারে আমরা যে কয়জন যুগসারথিকে পেয়েছি, এঁদের প্রত্যেকের জীবন ও চরিত্র অনুশীলন করলে পরে দেখা যাবে যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্য-সাধনের নিষ্ঠার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। এঁদের কারো জীবনেই কোনোরকমের ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। এঁদের অদম্য অধ্যবসায় আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার ভিত্তির উপরেই তো গড়ে উঠেছিল নবজাগরণের সেই বিরাট 'স্বর্ণকিরীটিনী' সৌধ। তার ভগ্নাবশেষ-টুকুও বোধ হয় আজ আর উত্তরপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি: বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।

যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ ডবটন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন। এই বিদ্যায়তনের শিক্ষা তাঁর জীবনে বৃথা হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন: "ছাত্রাবস্থা হইতে আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহার প্রভাবেই আমি সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম।" কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মি. জন সাইম; সুরেন্দ্রনাথ তাঁর খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনিই ডাক্তার দুর্গাচরণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন: "ডাক্তার ব্যানার্জি, আপনার ছেলেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে পাঠিয়ে দিন।" পিতা দুর্গাচরণ তাঁর পাঁচটি ছেলের মধ্যে মধ্যম পুত্র সুরেন্দ্রনাথের উপর খুব বেশি আশা-ভরসা

রাখতেন ; তাই তিনি অধ্যক্ষের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন না। পুত্রের শৈশব থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, তাকে শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাতে পারলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। দুর্গাচরণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রনাথকেও বিলাতে শিক্ষাদেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ; পরবর্তীকালে পিতার মৃত্যুর পর (সুরেন্দ্রনাথ যখন বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন সেই সময় দুর্গাচরণের মৃত্যু হয়—তিনি মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে মারা যান) সুরেন্দ্রনাথ পিতার এই ইচ্ছার কথা অবগত হোয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাতে পাঠিয়েছিলেন।

ছাত্রজীবনে সুরেন্দ্রনাথ কেবল যে বিদ্যাশিক্ষার জন্যই চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, শরীর পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিনি রীতিমত ব্যায়ামানুশীলনও শিক্ষা করেছিলেন। এদিকেও পিতার প্রখর দৃষ্টি ছিল—দুর্গাচরণ তাঁর সব ছেলেদেরই ব্যায়াম অভ্যাস করে সুস্থ ও সবল হবার জন্য উৎসাহ দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "পিতৃদেব আমাদের বলিতেন, স্বাস্থ্যই সকল সুখের এবং জীবনে সাফল্যলাভের মূল। আমাদের বাড়িতে একটি কুস্তির আখড়া ছিল এবং আমাদিগকে কুস্তি ও অন্যান্য ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য একজন পালোয়ানও নিযুক্ত ছিল। আমরা যেরূপ নিত্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাইতাম, ঠিক সেইরূপ নিত্য নিয়মিত আখড়ায় ব্যায়াম অনুশীলন করিতাম। আমার অন্যতম ভ্রাতা কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগাঢ় অভিনিবেশ ও অনুরাগের সহিত ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। কোনো পালোয়ানই তাঁহাকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতে পারিত না এবং বাঙালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।" দেখা যাচ্ছে যে, উনিশ শতকে বাঙালী শুধু মানসিক উৎকর্ষবিধানেই যত্নবান ছিল না, শক্তিচর্চাতেও সে সেদিন উদাসীন ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগসারথিগণ যে বলিষ্ঠ দেহ ও বলিষ্ঠ মনের অধিকারী হোতে পেরেছিলেন, তার কারণটা তো এইখানেই। বাঙালীর শক্তিচর্চায় যেদিন থেকে ভাঁটা পড়েছে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তার মানসিক দৈন্য আর শারীরিক নির্বীর্যতা।

যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম, সেই সময়ে বাংলাদেশে নবজাগরণ নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং তাঁর যৌবনকালে সেই জাগরণ অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে অনেকের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে। অন্যত্র আলোচনা করলেও, সেই ইতিহাস এখানে একটু তুলে ধরব। পরবর্তীকালের সাংবাদিক, বাগ্মী ও জননায়ক সুরেন্দ্রনাথকে বুঝতে হোলে এ ইতিহাসের পরিচয় আমাদের নিতেই হবে। সুরেন্দ্রনাথের যৌবনে গণ-আন্দোলনের শক্তি ও ব্যাপকতা বিশেষ কিছু দেখা যায়নি। কারণ, সাধারণের মনে গণ-আন্দোলনের প্রতি সেরকম আস্থা বা আগ্রহের সৃষ্টি হয়নি। সংবাদপত্রও দেশে তখন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি। সভাসমিতিতে বক্তৃতার প্রচলন তখনো হয়নি। তখনকার দিনে বাগ্মী বলতে একজনই ছিলেন—তিনি রামগোপাল ঘোষ। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি যেসব সভায় বক্তৃতা করতেন, শ্রোতার সংখ্যা সেসব সভায় খুব বেশি হোত না। রাজনীতি সম্পর্কে এদেশে প্রথম বক্তা তিনিই।

কেশবচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে উদ্দেশ করে প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। বাগ্মিতার যে শক্তি আছে এবং সেই শক্তি যে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা তিনিই দেশবাসীকে প্রথম বুঝিয়ে দিলেন। রামগোপালের পর প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য আর কাউকে দেখা যায়নি। তারপর এলেন কেশবচন্দ্র। এ কথা আদৌ অত্যুক্তি নয় যে, "সত্যই কেশবকণ্ঠে বেদমাতা বাগ্দেবী নিত্য বিরাজ করিতেন। যেমন মধুর গম্ভীর সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বর, তেমনি মহান্ অর্থযুক্ত ভাবময়ী কথা। প্রকাণ্ড টাউন হলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ধ্বনি বংশীধ্বনির ন্যায় নিনাদিত হইত। তিন চারি সহস্র লোক মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নীরবে তাহা শ্রবণ করিত।"* এমন অলৌকিক কণ্ঠস্বরের অধিকারী সেযুগে একমাত্র কেশবচন্দ্রই ছিলেন এবং এই বক্তৃতাপ্রভাবেই তিনি শিক্ষিত তরুণ বাঙালীর চিত্ত জয় করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই তরুণদের মধ্যে একজন।

১৮৬০ থেকে ১৮৭০—এই দশ বছর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একটি

* কেশব-চরিত : চিরঞ্জীব শর্মা।

অবিস্মরণীয় যুগ। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন অত্যন্ত প্রভাবশীল হোয়ে উঠেছিল এই সময়ে। তাঁর বক্তৃতা-শক্তিই একে জীবন্ত ও প্রভাবশীল করে তুলেছিল। এই আন্দোলনের প্রভাব রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উপরও পড়েছিল। বস্তুত, কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতাশক্তি কেবল যে নবধর্মভাবেরই অনুপ্রেরণা এনেছিল তা নয়, একটা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকেরা মেতে উঠেছিল।

এর সাক্ষ্য দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাশক্তি ছিল অলৌকিক, তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল সঙ্গীতের মতোন মধুর, তাঁহার ভাষা ছিল ওজস্বিনী, তাঁহার আকৃতিতে ছিল আকর্ষণীশক্তি। শ্রোতার দল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত—সে বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করিত। আমরা, ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকেরা সেই বক্তৃতায় মাতিয়া উঠিলাম। আমি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা প্রায়ই সুগভীর মনোযোগের সহিত শুনিতাম। তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগের অন্ত ছিল না। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার মুখ্য প্রভাব যাহাই হউক না, পরে ইহা আমি বুঝিয়াছি যে, উহার গৌণ প্রভাবের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয় সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে সংকীর্ণতা বর্জন করিয়াছিল ও উদার হইয়া উঠিয়াছিল।" সুতরাং পরবর্তী-কালের বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মিতার ক্ষেত্রে যে কেশবচন্দ্রের একজন একলব্য শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন, তা বলা বাহুল্য।

সুরেন্দ্রনাথের যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল দুটি, যথা—মাদকতা-নিবারণ আন্দোলন এবং বিধবা বিবাহ-আন্দোলন। প্রথমটির নেতা ছিলেন পাদ্রী ডল্‌সাহেব ও প্যারীচরণ সরকার, দ্বিতীয়টির নায়ক বিদ্যাসাগর। সুরেন্দ্রনাথ প্যারীচরণের ছাত্র ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বলেছেন যে, প্যারীচরণের মতোন শিক্ষক বাংলাদেশে খুব কমই জন্মেছেন। শিক্ষকের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ারকে আমরা শিক্ষাগুরুর আসনে স্থান দিয়েছি, কিন্তু প্যারীচরণের নাম আজকের কয়জন বাঙালী জানে? যে তিনজন আদর্শ শিক্ষকের গুণ-গরিমার কথা বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শতমুখে বলতেন তাঁদের মধ্যে লোকবিশ্রুত প্যারীচরণ সরকার একজন। গুরুদাস প্যারীচরণের ছাত্র

ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "হেয়ার স্কুলের শিক্ষক-জ্যোতিষ্কের সূর্য-স্বরূপ ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। নম্রপ্রকৃতি প্যারীচরণ ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হইতেন না, কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্যে নিতান্ত দুর্বিনীত ছাত্রগণও ভীত হইত। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার অন্তঃকরণে বিলাস, অহঙ্কার ও হুজুগ-প্রিয়তার কণামাত্রও ছিল না। উচ্চ বেতন ও পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সত্ত্বেও তিনি কখনো গাড়িঘোড়া করেন নাই; ছাতাটি হাতে করিয়া, চাপকান আঁটিয়া, প্রতিদিন বাটী হইতে কর্মস্থলে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার ছাত্রপ্রীতি ছিল অসাধারণ। আমার ছাত্রজীবনে এমন দেবোপম শিক্ষকলাভ যে কত বড় সৌভাগ্য ছিল তাহা বলিতে পারি না।"* বাংলাদেশে আজ আবার এমন শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সে সময়ে মাদকতা-নিবারণের জন্য আন্দোলন খুবই প্রয়োজনীয় হোয়ে উঠেছিল। শিক্ষিত বাঙালী ছেলেদের এক হাতে ইংরেজ তুলে দিয়েছিল মদের গেলাস, অন্য হাতে মিলটন-সেক্সপীয়ারের কবিতা। দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যে মদ্যপান তখন একটি ফ্যাসনে পরিণত হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের খাবার টেবিলে অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে মহার্ঘ্য বিলাতি মদের পাত্র দেখে যুবক কেশবচন্দ্র বিস্মিত হয়েছিলেন। মদ খাওয়াটা তখন দোষের বলে বিবেচিত হোত না, ইংরেজী লেখাপড়া শিখলেই মদ খেতে হোত। তখন ইংরেজী-শিক্ষিত লেখকদের মধ্যে যিনি মদ না খেতেন তাঁকে অশিক্ষিত বলে গণ্য করা হোত। রাজনারায়ণ বসুর মতো সাধুপ্রকৃতি (প্রথম যৌবনে ইনি ভীষণ সুরাসক্ত ছিলেন) একবার সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: "একদিন বৈকালে আমি রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে গিয়াছিলাম। রামগোপাল তখন বাড়িতে ছিল না বটে, কিন্তু অন্যান্য বন্ধুরা সেখানে ছিলেন। আমি চাকরকে ডাকিয়া মদ দিতে বলিলাম। আমরা কয়েকজন এত মদ খাইয়াছিলাম যে, রামগোপাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল—আমরা মাতাল হইয়া ঘরের মেজেতে শুইয়া পড়িয়া আছি।'

সেদিন ইয়ং বেঙ্গলকে অর্থাৎ বাংলার ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণদের এই ভীষণ পাপ-পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার প্রয়োজন হয়েছিল। মদ্যপানের ফলে এদের

* জীবনস্মৃতি: গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যে যে মনোভাব দেখা গিয়েছিল, তার পূর্ণ পরিবর্তন তখন অপরিহার্য হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসেন এমন মানুষ তখন একজনই ছিলেন—তিনি প্যারীচরণ সরকার। মদ্যপান-নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এই দুইটি কাজে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। কাজটা খুবই দুঃসাহসিক ছিল সন্দেহ নেই। এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং যুবক সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: "আমরা সভা করিতাম, বক্তৃতা করিতাম। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাদ্রী ডল্‌সাহেব মাদকতা-নিবারণ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে যুবসমাজের কল্যাণ হইয়াছিল এবং ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের মন হইতে মদ্যপানের প্রতি অনুরাগ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।"

তাঁর ছাত্রজীবনে আর একটি আন্দোলন হিন্দুসমাজে ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ইহা বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর ছিলেন এর প্রবর্তক। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ফলে সমাজে কিরূপ সাড়া পড়িয়াছিল এবং সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ইহার উপর কিরূপ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমার বেশ মনে আছে। বয়সে তরুণ হইলেও দেশের এই ঘটনার প্রতি আমার সবিশেষ লক্ষ্য এবং এই সকল আন্দোলনের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও সহানুভূতি ছিল।···এই আন্দোলন তখন সমাজের উপর বিশেষ কোনো প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই। আমাদের পরিবারে আমার পিতামহ এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমার পিতা ইহার স্বপক্ষে ছিলেন এবং তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করিতেন। তখনকার মতো গোঁড়া হিন্দুদেরই জয় হইয়াছিল এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তককে ভগ্নহৃদয়ে নৈরাশ্যে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল।···পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দু বালবিধবাদের অবস্থা যেমন ছিল আজ ১৯২৫ সালেও তেমনই আছে। কর্মক্ষেত্রে এখন তরুণ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উত্তরসাধক নাই। আমি তরুণ বয়সে আক্ষেপ করিয়াছিলাম—কবে বিদ্যাসাগরের এই চেষ্টা সফল হইবে? আজ আমার জীবনসন্ধ্যায় সেই আক্ষেপোক্তিরই প্রতিধ্বনি করিতেছি।"

দেখা যাচ্ছে, ছাত্রজীবন থেকেই সুরেন্দ্রনাথ দেশহিতকর সর্ববিধ প্রয়াসের প্রতি গভীরভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর উত্তরকালের জীবনের উপর এগুলির প্রভাব লক্ষণীয়। যে মানুষ ভবিষ্যতে দশজনের মধ্যে একজন হবে, যে একদিন বড় হবে, তার জীবনের আদিপর্বেই তার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। যে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকায় তিনি পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং তাতে তিনি যে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেছিলেন, তার মূলে ছিল স্বদেশের উন্নতিবিধানের জন্য আশৈশব তাঁর মধ্যে এই আগ্রহ এবং ইচ্ছা। এই আগ্রহ এবং ইচ্ছা ছিল বলেই পদচ্যুত সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথকে আমরা ১৮৭৪-১৮৭৫ সালে বিলাতে প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে অভিনিবেশ সহকারে বইয়ের পর বই অধ্যয়ন করতে দেখেছি। বলেছি, সুরেন্দ্রনাথের জন্ম বাংলার নবজাগরণের সুতিকাগারে। তাঁর জন্মের পূর্বে যাঁকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নবজাগরণ এদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ যাঁকে তাঁর 'গুরু' বলে মেনেছেন, সেই শ্রুতকীর্তি রামগোপাল ঘোষ সম্পর্কে প্রসঙ্গত কিছু বলা দরকার।

হিন্দুকলেজের প্রথম যুগের যে ছাত্রদের উপলক্ষ করে 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Benga.) কথাটির সৃষ্টি হয়েছিল, রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে প্রধানতম। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন ডিরোজিওর প্রথম ছাত্রগোষ্ঠী। বাংলার নবজাগরণে এই বিপ্লবী ছাত্রগোষ্ঠীর বহুমুখী প্রয়াসের কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মর্তব্য। রামগোপালের প্রকৃত নাম ছিল গোপালচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১৮১৫ সালে। এগার বছর বয়সে ইনি হিন্দুকলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্তি হন। ইংরেজ হেডমাষ্টার তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সাহেবের কথা বুঝতে পারেন নি, সাহেবও তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি, ফলে খাতায় নাম উঠলো—রামগোপাল ঘোষ এবং সেই অবধি তিনি ঐ নামেই পরিচিত হন। হিন্দুকলেজে রামগোপাল প্রথম

শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হোয়ে পাঠ সমাপ্ত করতে পারেন নি। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তাঁর কোনোদিনই হ্রাস পায় নি। হিন্দুস্কুলের সেই প্রথম যুগের ছাত্রদের নিয়েই ডিরোজিও য়্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই এ্যাসোসিয়েসনের সভ্যরাই পরে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। কর্মজীবনে রামগোপাল এক ইংরেজ সদাগরী অফিসে মুচ্ছুদির কাজ করতেন এবং পরে তিনি ঐ অফিসের একজন অংশীদারও হয়েছিলেন। সেযুগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর, ব্যবসায়ে ইংরেজ ও বাঙালীতে পার্টনারসিপ এই দ্বিতীয়বার দেখা গিয়েছিল। ব্যবসায়ে রামগোপাল প্রচুর বিত্তবান হয়েছিলেন। মতিলাল শীল যুবক রামগোপালের ব্যবসায়িক বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতেন।

কিন্তু ব্যবসায়-সর্বস্ব মানুষ ছিলেন না তিনি। দীর্ঘদেহ, গৌরকান্তি রামগোপাল দেশের উন্নতির কথা সর্বদাই চিন্তা করতেন এবং যা তিনি চিন্তা করতেন তা কাজে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথমে তিনি ‘জ্ঞানান্বেষণ’ নামে বাংলাভাষায় একখানি পত্রিকা বের করেন—পরে ইহা দ্বিভাষী পত্রিকায় (ইংরেজী ও বাংলা) পরিণত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আর শেষ সম্পাদক রামগোপাল। ‘Civics’ এই ছদ্মনামে এই পত্রিকায় তিনি রাজনৈতিক ও দেশীয় বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত লিখতেন। রামগোপালের দ্বিতীয় প্রয়াস *Bengal Spectator*; কিন্তু এই সাময়িক পত্রিকাখানি বেশি-দিন স্থায়ী হয়নি। বাঙালীর মানসিক উৎকর্ষবিধানে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার যে গুরুত্ব ছিল, সেদিন তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ‘জ্ঞানান্বেষণ’ ও ‘স্পেক্টেটর’-এর সেই একই গুরুত্ব ছিল, বলা চলে। শিক্ষাবিষয়ে রামগোপাল হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নানা উপায়ে উৎসাহিত করতেন। একবার স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। বলা হয়েছিল, প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন তিনি পাবেন একটি স্বর্ণপদক আর দ্বিতীয় স্থান যিনি অধিকার করবেন তিনি পাবেন একটি রৌপ্য পদক। হিন্দুকলেজে ছাত্রদের মধ্যে সেদিন এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতা ছিল। এই প্রতিযোগিতায় অনেক উৎসাহী ছাত্রই অংশগ্রহণ

করেন; পরীক্ষায় দেখা গেল যে, প্রথম স্থান অধিকার করেছেন হিন্দুকলেজের তখনকার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তাঁরই সহপাঠী ও বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

রামগোপালের প্রয়াস ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে মুখ্যত বিলাতের জনমত জাগ্রত করা। তাঁর সময়ে তিনি ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির নিমিত্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের অভিমত গঠনে সর্বাধিক প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর মুদ্রিত পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে, ১৮৩৮ সালে তিনি বিলাতে সাধারণ লোকদিগের নিকট ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরবার জন্য বিলাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এ্যাডাম সাহেবের সঙ্গে (Rev. William Adam) পরামর্শ করতেন। এই এ্যাডামকেই রাজা রামমোহন রায় ১৮১৮ সালে একেশ্বরবাদে দীক্ষিত করেছিলেন; ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এ্যাডাম-সম্পাদিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মুখপত্র *British Indian Advocate* পত্রিকায় রামগোপালের চেষ্টায় ভারতীয়দের লিখিত স্বদেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৪১ সালের কথা। বিলাতে ভারত সম্পর্কে যথাযথ অভিমত গঠন করবার জন্য রামগোপাল এ্যাডামকে সংবাদ ও অর্থ দুই-ই পাঠাতেন।

নবীন রাজনৈতিকদল যখন এইভাবে শিক্ষা ও দেশহিতৈষণার কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় এলেন জর্জ টমসন। টমসনের ন্যায় সুবক্তা, রাজনীতিবিশারদ ও ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর আগে ভারতবর্ষে আর আসেন নি। তিনি পার্লামেন্টের একজন সদস্য ছিলেন। তখনকার দিনে টমসন একজন বড় বাগ্মী ছিলেন। ভারতবাসীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎসাহিত করবার জন্যই দ্বারকানাথ টমসনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এইসময়ে একদিন (১৮৪৩, ১১ই জানুয়ারি) সাধারণ জ্ঞানোপার্জনী সভায় (এইটাই তখন কলিকাতায় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সমিতি ছিল) টমসন এলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র সাহেবকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন; সভ্যদের মধ্যে রামগোপালই তাঁর প্রতি

অধিকতর আকৃষ্ট হোলেন। টমসনের তেজোপূর্ণ বক্তৃতায় ও সহৃদয়তায় নব্যবঙ্গের যুবকদল যেন মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। ডিরোজিও'র শিষ্যরা যা এতদিন চেষ্টা করছিলেন, টমসন তাতে একটি মহতী শক্তি প্রদান করে, সকলকেই উৎসাহিত করলেন। টমসন তাই শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম রাজনৈতিক গুরু। তখনকার শিক্ষিত সমাজের অধিনায়ক হিসাবে স্বীকৃত রামগোপাল ঘোষ তাঁর কাছেই রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি শিখেছিলেন: (১) "Petitions and public meetings do not produce their desired effect unless the people themselves are at work." আর (২) "Agitation is the soul of success in the political amelioration of a country." ইংরেজ রাজত্বে রাষ্ট্রীয় উন্নতি যে আন্দোলনের উপর নির্ভর করে, এ কথা রামগোপাল প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। বিলাতে ভারত সম্পর্কে অভিমত গঠন এবং এদেশে সংবাদপত্র প্রচার এবং রাজনৈতিক সভার সৃষ্টি প্রভৃতি নানা উপায়ে রামগোপাল ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই রাজনৈতিক আদর্শেরই উত্তরসাধক ছিলেন আমাদের এই আলোচনার নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৩, ২০শে এপ্রিল। বাংলার নবজাগরণের আদিপর্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। এইদিন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির জন্ম হয়। বিদ্যানুশীলন ও আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে যে জ্ঞানোপার্জনী সভার অভ্যুদয় হয়েছিল তা এখন একটি নূতন সভায় পরিণত হবার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। জ্ঞানোপার্জনী সভার কাজ শেষ হয়েছিল; রামগোপাল, তারাচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি অনুশীলনের পর্যায় অতিক্রম করে তখন কর্মে ব্রতী হবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। তাই জ্ঞানোপার্জনী সভার ভিত্তির উপর স্থাপিত হোল দেশের মঙ্গলঘট—ইহাই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অনুকরণে গঠিত এই প্রথম রাজনৈতিক সমিতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেকেই ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে, এই সমিতির সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক ছিল না; ইহা ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও ধনীসম্প্রদায়ের প্রয়াস মাত্র

আর তাঁরা নিজেদের স্বার্থ এবং শাসকজাতির স্বার্থেই এই সমিতি স্থাপন করেছিলেন। আমরা কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত অনুষ্ঠান ও তজ্জনিত সাধারণ সমৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সুখ, দেশবাসীর ও তদানীন্তন কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা প্রভৃতি নানা প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সৃষ্টি হয়। সকল দেশেই অশিক্ষিতদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প হোলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত মার্জিত ও বুদ্ধি পরিণত, সেইজন্য তারাই দেশের প্রকৃত নায়ক। দেশবাসী দেশের মঙ্গল চেষ্টা না করলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ কোনোদিনই সাধিত হয় না—ইহা ইতিহাসের সত্য। আবার দেশের মঙ্গল একজনের দ্বারা সম্ভব হয় না, সমবেত শক্তির প্রয়োজন, ইহাও ইতিহাসের শিক্ষা। সেই সমবেত শক্তি কেন্দ্রীকৃত করে বাংলার সাধারণ লোকের প্রথম হিতচেষ্টা এই 'Bengal British Indian Society'-র সভ্যেরাই করেছিলেন—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এই তথ্যটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সোসাইটি স্থাপিত হবার পর, দেখা যায়, এর নিয়মিত অধিবেশন হোতে থাকে। এতে জর্জ টমসন কয়েকটি তেজোপূর্ণ বক্তৃতা করেন, সেগুলিকে ভারতে রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রথম সামগান হিসাবে স্বীকার করতে বাধা নেই। নিয়মানুগ (Constitutional) এই প্রথম আন্দোলনে 'ডিরোজিও'র বহু-নিন্দিত যুবক ছাত্রদল সর্বান্তঃকরণে যোগদান করে আবেষ্টনটিকে দেশাত্মবোধের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। সেদিন 'এজুরাজ' ('এজু' কথাটি 'educated'-এর সংক্ষিপ্তরূপ এবং রাজ-নারায়ণ বসু রামগোপালকে 'এজুরাজ' অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুকুটহীন রাজা বলে অভিহিত করেছিলেন।) রামগোপাল ঘোষই ছিলেন দলের অগ্রগণ্য—"The mighty Ramgopal"—বিদ্যায়, বিত্তে ও বাগ্মিতায় তিনিই ছিলেন তখন শক্তিশালী।*

এই নূতন স্বাদেশিকতার সূতিকাগারে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। ইংরেজীশিক্ষা

* রামগোপাল ঘোষ সংক্রান্ত এই বিবরণ গৃহীত হয়েছে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রণীত *Life of Dwarkanath Tagore* এবং রামগোপাল সান্যাল প্রণীত *A General Biography of Bengal Celebrities*—এই দুইটি পুস্তক থেকে।

ও য়ুরোপীয় চিন্তাধারা এদেশে কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করেনি —আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বাজাত্যাভিমান জাগিয়ে তুলেছিল আর এই পথ দিয়েই বাঙালী সেদিন লাভ করেছিল স্বদেশহিতৈষিতা বা patriotism-এর আদর্শ। সিপাহীযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকেই এই আদর্শ কিভাবে প্রবল রূপ ধারণ করে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে একেবারে সংগ্রামের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, সে ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন নেই এখানে। মোট কথা, যখন থেকে ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্য সমাজের জ্ঞান লাভ করে আমরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থাটা বোধ করতে আরম্ভ করলাম, সেইদিন থেকে জগতের স্বাধীন দেশগুলির তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের মধ্যে এক অভিনব বেদনা জাগিয়ে তুলতে আরম্ভ করে। সেই বেদনার ভেতর দিয়েই এলো স্বাদেশিকতা, এলো রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের মহৎ আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার জন্মলগ্নেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের জন্ম।

॥ চার ॥

গোখলে একবার বলেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের তুলনা সুরেন্দ্রনাথ। কথাটি মিথ্যা নয়। যখন এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের কথা কেউ চিন্তা করেনি অথবা এই বিষয়ে আমাদের অক্ষর পরিচয়ও হয়নি সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। জাতীয়তার সঞ্জীবনমন্ত্র প্রচার এবং দেশাত্মবোধের উদ্দীপন ও পরিব্যাপ্তিসাধন, ইতিহাসে এই ছিল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা। এই বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তিনি যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সে সময়ে এদেশের কয়জন লোক রাজনীতির চর্চা করতেন? সংসার ধর্ম প্রতিপালন, রাজকর প্রদান, আইন মানা, পৈতৃক ধর্মকর্ম বজায় রাখা—এইভাবে দিন কাটিয়ে দেওয়া (রবীন্দ্রনাথের কথায় "শুধু দিন যাপনের গ্লানি"), এই তো ছিল আপামর সাধারণের লক্ষ্য। জীবন ছিল, কিন্তু জীবনচিন্তা ছিল না; যা ছিল তার মধ্যে রাজনীতির লেশমাত্র ছিল না। স্বদেশ, স্বায়ত্ত-শাসন, মুক্তি বা স্বাধীনতা—এসব কথা তখন কেউ জানতো কিনা সন্দেহ। জানলেও, প্রকাশ্যে তার আলোচনা অল্পই ছিল।

গুরুরূপে সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশিকতা ও স্বাধীনতার বাণী নিয়ে এলেন এই দেশে। তাঁর আবির্ভাবকালে এই ক্ষেত্রে যে কয়জনকে আমরা পাই তাঁদের মধ্যে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেহতা—এই কয়জনের নাম বোধ হয় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল এঁদের সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সে যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই ছিল। কারণ তাঁর কণ্ঠে ছিল সিংহনাদ, লেখনীতে যুক্তি। ইলবার্ট বিল বা ম্যাকেঞ্জি বিল আন্দোলনের সময়, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর সময়—তাঁর ঐ সিংহনাদে কে না মুগ্ধ হয়েছে? কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, ছাত্রদের রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম জননায়ক যিনি ছাত্রসমাজের মোহনিদ্রা ঘুচিয়েছিলেন। "আজ যিনি ছাত্র,

কাল তিনি নাগরিক," এ কথা সুরেন্দ্রনাথের। নাগরিকজীবনে তাকে যে কাজ করতে হবে, ছাত্রজীবনে তাকে সেই শিক্ষা করতে হবে। নাগরিক হয়ে তাকে যে জন্মগত অধিকার রক্ষা করবার জন্য যত্ন করতে হবে, ছাত্রজীবনে সেই অধিকার শিক্ষা করতে হবে। সুতরাং ছাত্রের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়, বরং প্রয়োজনীয় ও নিষ্ঠার সঙ্গেই আচরণীয়। এই ধারার প্রবর্তক সুরেন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ধারাটি পরবর্তীকালে যে কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, আজ বোধ হয় আমরা তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

স্যর হেনরি কটন তাঁর *New India* গ্রন্থে বলেছেন: "ভারতবর্ষে সেই সময়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন, কিন্তু একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথমে রাজনীতির আলোচনায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ভারতের নানা স্থানে বক্তৃতা করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল্ কংগ্রেসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁরই বক্তৃতা। তিনি একজন বিরাট রাজনীতিক বক্তা ছিলেন বলেই যে দেশবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা নয়, তাঁর ছিল অকপট দেশপ্রেম এবং তাই ছিল তাঁর রাজনীতিক বক্তৃতার ভিত্তি।" সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে "Tribune of the people"—এই বিখ্যাত উক্তিটি কটনের।

রামমোহন রায় যেমন বর্তমান ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথও তেমনি রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের নবজীবন-লাভের পথপ্রদর্শক, তিনি ভারতবাসীকে বর্তমান যুগের উপযোগী আদর্শ-লাভের এবং ভারতকে উন্নতিশীল জাতি হবার রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ের শিক্ষিত-সম্প্রদায় রামমোহনের প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী না হোতে পারেন, কিন্তু তাই বলে আমাদের চিন্তার, ধারণার ও জ্ঞানচর্চার উপর এই মনীষির প্রভাব কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেন না। এই হিসাবে সুরেন্দ্র-নাথও বর্তমান ভারতের স্রষ্টা ছিলেন। "I owe my allegiance to God and to my people",—সুরেন্দ্রনাথের এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যেই আমরা রাষ্ট্রগুরুর সমগ্র রূপটিকে যেন প্রত্যক্ষ করি। সত্যই তিনি ভগবান ও তাঁর দেশবাসীর কাছে তাঁর কর্তব্যপালন করে গিয়েছেন। কর্মের দ্বারাই মানুষ ও

জাতি মুক্তিলাভ করে—এই বিশ্বাসে তিনি স্থির ও অবিচল ছিলেন। কর্মই তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম ছিল। এই দেশহিতৈষীর জীবনেতিহাস আলোচনার সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ কথার জোরে তিনি নিজের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নি—তিনি গুণের প্রভাবেই নেতা।

দেশসেবার যোগ্যতা দান করবার জন্য ভগবান তাঁকে যে বাগ্‌বিভূতি, ভাষাজ্ঞান, মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং মনের ও হৃদয়ের অনন্যসাধারণ গুণ দিয়েছিলেন, তা সবই তিনি দেশসেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সেইজন্য লোকপ্রিয়তা ও খ্যাতি তাঁর কাছে অযাচিতভাবেই উপস্থিত হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্র লিখেছেন: "বাংলার নবযুগের ইতিহাস আধুনিক বাঙালীর চিন্তাতে ও চরিত্রে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার জন্য শতাব্দব্যাপী একটা সংগ্রামের ইতিহাসের নামান্তর মাত্র। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে নবযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অভিব্যক্তিতে সুরেন্দ্রনাথের একটা অনন্যলব্ধ বিশিষ্ট স্থান আছে।"* রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের জন্য তিনি নিয়মানুগ আন্দোলন বা বৈধপ্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতালাভের জন্য পরাধীন জাতির কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ করা উচিত নয়, তাঁর মত এ রকম ছিল না। সুরেন্দ্রনাথকে এইখানেই অনেকে ভুল বুঝেছেন। ইতালির অন্যতম ঐক্যবিধায়ক ও উদ্ধার-কর্তা ম্যাটসিনি তাঁর প্রিয়তম আদর্শ ছিলেন; কিন্তু ম্যাটসিনি সকল অবস্থায় যুদ্ধবিমুখতায় বিশ্বাস করতেন না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে দেশের অবস্থা যেরকম বুঝেছিলেন, তাতে তিনি বলপ্রয়োগের বৈধতায় ও সফলতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বলপ্রয়োগ করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ লোক জুটিলে এবং তাহাতে নিশ্চিত ফললাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, বলপ্রয়োগ যে তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ হইত না, এরূপ অনুমান করিবার মত কথা সুরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে আমরা একবার শুনিয়া-ছিলাম, এবং তাঁহার তদানুষঙ্গিক হস্তভঙ্গীও তখন দেখিয়াছিলাম। বোম্বাইয়ে

* বাংলার নবযুগের কথা: বিপিনচন্দ্র পাল।

যে বৎসর স্যর হেনরি কটন কংগ্রেসের সভাপতি হন, সেই বৎসর সমুদ্র-কূলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট কোন তাঁবুতে আমরা ইহা শুনিয়াছিলাম ও দেখিয়াছিলাম।"* যথাস্থানে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জুন, ১৮৭৫।

কপর্দকশূন্য অবস্থায় দেশে ফিরলেন সুরেন্দ্রনাথ।

জীবনের ঘোর সংকটকাল তখন তাঁর। ভারতসরকার ও ভারতসচিবের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্ফল হোল; ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি পেলেন না। অনেকের কাছেই তখন তাঁর ভবিষ্যৎজীবন আশাহীন বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। বন্ধু আত্মীয় কুটম্ব ও কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁকে সামাজিক হিসাবে সর্বস্বান্ত বলে মনে করলেন। "He is finished", "সুরেন বাঁড়ুয্যে শেষ হয়ে গেলেন"—এইরকম মন্তব্য তখন অনেকেই করেছিলেন। বস্তুত, সুরেন্দ্রনাথের আশা ও আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত জীবনের একটি অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত ঘটেছিল সেইসময়ে। সেদিনের সেই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার কথা স্মরণ করে আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: "What was I to do—how to obtain a living and yet do some useful work for the country? The outlook was as gloomy as it could be. On all sides the door was barred" এ অবস্থা সত্যই শোচনীয়, বিশেষ করে একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত যুবকের পক্ষে। ভাগ্যের এমন নিষ্করুণ পরিহাস খুব কম মানুষের জীবনেই দেখা গিয়েছে। কৃতবিদ্য একজন যুবকের জীবনের প্রারম্ভে আশাভঙ্গের এই যে মনস্তাপ, এর আঘাত সহ্য করা মনের কম শক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়। তাঁর বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে, তাঁর তো কোনো আশা-ভরসাই নেই। কৃষ্ণদাস পাল একদিন এলেন তাঁর তালতলার বাড়িতে; কথায় কথায় বললেন, "তোমার তো কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না; কি করবে ঠিক করেছ?" বন্ধু উমেশচন্দ্র এলেন; বললেন,

* সাময়িক প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩২

'সুরেন, যা হবার তা হয়েছে। তুমি নাম ভাঁড়িয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় যাও এবং সেখানে জীবিকার্জনের জন্য কোনো পথ তৈরি করে নাও।"

সুরেন্দ্রনাথ সকলের কথাই শুনলেন। নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার তাঁর চারদিকে পুঞ্জীভূত হয়েছিল বটে, কিন্তু এক স্বতন্ত্র ধাতু দিয়ে গঠিত এই মানুষটি একেবারে ভেঙে পড়লেন না। ইতিহাস তখন তাঁকে ডাক দিলো একটি মহত্তর কাজে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য। পদচ্যুতির সমস্ত ব্যাপারটি স্থির-ভাবে চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তিনি পরাধীন দেশের সন্তান, শাসনকার্যে তাঁদের কথা বলবার উপায় নেই। দেশে জনমত বলে কোনো বস্তু নেই। যতই তিনি চিন্তা করতে থাকেন ততই সুরেন্দ্রনাথ তীব্র-ভাবে অনুভব করতে থাকেন যে, তাঁর স্বদেশে তাঁরা যেন পতিত, অস্পৃশ্য। দাসত্ব করতেই যেন তাঁদের জন্ম। বুঝলেন, কী অসহায় এবং শক্তিহীন অবস্থার মধ্যে ভারতবাসীরা রয়েছে। আজ আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেদিন তাঁর মনের মধ্যে এই চিন্তা জেগেছিল: "আমি যেমন লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, ভবিষ্যতে কি ঐ রকম লাঞ্ছনা আমার অন্যান্য দেশবাসীকে ভোগ করতে হবে না? যদি দেশের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করতে না পারে, নিজেদের অধিকার, ব্যক্তিগত ও জাতির স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করতে না পারে, তাহোলে এ লাঞ্ছনার শেষ কোথায়?"

এই জিজ্ঞাসা সুরেন্দ্রনাথের ছিল না—প্রকৃতপক্ষে তাঁকে উপলক্ষ করে সেদিন এই জিজ্ঞাসা ছিল ইতিহাসের। পলাশির রণক্ষেত্রে বাঙালী তথা ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের একশত আঠারো বছরের মধ্যে ভারতবাসীর সামনে ইতিহাস নিয়ে এলো এই প্রশ্ন। কবি রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?"—এই মর্মান্তিক জ্বালার মধ্যেই যে প্রশ্নের সূচনা একদিন দেখা গিয়েছিল, আজ ভাগ্যবিড়ম্বিত এক যুবকের তীব্র অনুভূতিকে আশ্রয় করে সেই প্রশ্নটিই যেন সোচ্চার হোয়ে উঠলো। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করলেন: "আমার যা হবার হয়েছে; এরপর আমি আমার অসহায় দুর্বল দেশবাসীকে সহায়তা করবার ও তাদের হৃদয়ে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করব।" উনিশ শতকের ভারতবর্ষে এমন প্রতিজ্ঞা আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। পদচ্যুতির আদেশের বিরুদ্ধে

আপিল করবার জন্য দ্বিতীয়বার বিলাতে গিয়ে তিনি যে তেরো মাসকাল ঐ দেশে অতিবাহিত করেন, ঐ সময়েই তাঁর মনের মধ্যে এই চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, এই তেরোমাস কাল তিনি বৃথা যেতে দেন নি। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য ঐ সময়ে তিনি সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে রাজনীতি সংক্রান্ত অজস্র পুস্তক পাঠ করেছিলেন আর পাঠ করেছিলেন পৃথিবীর বহু দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। ইংরেজশাসনের অবিচারকে তিনি ইংরেজের অস্ত্র দিয়েই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। এই ছিল রাষ্ট্রগুরুর রণনীতি।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সেই সঙ্কটকালে তার সহধর্মিণী স্বামীকে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলেন; বিক্রী করে দিলেন তাঁর সমস্ত অলঙ্কার। বিক্রয়লব্ধ সেই টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে সাধ্বী চণ্ডীদেবী বলেছিলেন: "তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেশের কাজ কর, পৈতৃক ভদ্রাসন তো রয়েছে, দু'মুঠো ভাত কোনোরকমে জুটে যাবে আমাদের, তুমি তোমার কাজ কর।" এইভাবেই সেদিন এই মহীয়সী মহিলা আদর্শ হিন্দু-পত্নীর আচরণ দেখিয়ে-ছিলেন। কপর্দকশূন্য স্বামীকে দেশের রাজনীতিক মুক্তিসাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গ করবার জন্য তাঁকে প্রেমভক্তি, উৎসাহ, বল ও সহায়তা দান করে-ছিলেন। তিনি যে স্বামীর দুর্দিনে তাঁর গৃহিণী, সচিব ও সখী ছিলেন তা নয়, পরন্তু সুরেন্দ্রনাথের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে এই মহিলা তাঁর অসাধারণ স্বাভাবিকী বুদ্ধি ও প্রতিভা এবং ইচ্ছাশক্তিদ্বারা স্বামীকে রাজনীতিক্ষেত্রে বিপদের ও বাধার সম্মুখীন হোতে উৎসাহিত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাই বলতেন: "কর্মক্ষেত্রে আমি যেটুকু দৃঢ়তা ও সাহস দেখাতে পেরেছি, তা চণ্ডীদেবীর কৃপায়।" অথচ এই মহিলা যে একজন উচ্চশিক্ষিতা, বা সাধারণ শিক্ষিতা ছিলেন তা নয়। শিক্ষার আলোক না পেয়েও উনিশ শতকের বাংলায় বহু জননায়কের জীবনেতিহাসে তাঁদের অন্তঃপুরচারিণী সহধর্মিণীদের নীরব আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতোন—এ কথাটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে সেই দুর্দিনে আরেকজনের করুণার হস্ত তাঁর দিকে প্রসারিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর। অল্পদিন পূর্বে তিনি

অপেক্ষাকৃত কম খরচে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরেছেন, এই সংবাদে যারপর নাই বিচলিত হন বিদ্যাসাগর; তিনি সুরেন্দ্রনাথকে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য খবর পাঠালেন। সুরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিদ্যাসাগর কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন: "বামুনের কপালে সিভিলিয়ানী তো সহ্য হোলনা দেখছি, এখন কি করবে ঠিক করেছ?" কি যে তিনি করবেন সুরেন্দ্রনাথ নিজেই তা তখনো পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেন নি। পদচ্যুত সিভিলিয়ানের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—এ কথা বিলাত থেকে আসবার পর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মুখে তিনি বহুবার শুনেছেন। শুধু পদচ্যুত নন, কলিকাতার শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে তাঁর অবস্থাটা সেদিন অনেকটা জাতিচ্যুতের মতোই হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বুঝি সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "The outlook was as g oomy as it could be"—সত্যই, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ সেদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেই তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল। সেই অন্ধকারে আশা ও আশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন উনিশ শতকের বাংলার জ্যোতির্ময় পুরুষ, ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর যাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণা একদিন প্রবাসে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিল মহাকবি মধুসূদনকে। বিলাত থেকে ফিরবার পর অনুযোগই শুনেছেন সুরেন্দ্রনাথ, আশ্বাসের কথা এই প্রথম শুনলেন: "কি করবে ঠিক করেছ? আমার কলেজে ছেলে পড়াও, দু'শো টাকা করে মাইনে পাবে।" বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবে সম্মত হোলেন সুরেন্দ্রনাথ—ইংরেজী অধ্যাপকের চাকরি নিলেন মেট্রোপলিটান কলেজে। এখান থেকেই তাঁর নবজীবনের আরম্ভ। এই-সময় থেকেই তিনি দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করে স্বীয় অলোকসামান্য বাগ্মিতার প্রভাবে দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী নবযুবকসমাজে রাষ্ট্রীয় সাধনার নূতন প্রেরণা সঞ্চার করে দেশে রাষ্ট্রীয় সাধনার উদ্বোধন করেন। বিপিনচন্দ্র যথার্থই লিখেছেন: "রাজকর্ম হইতে অপসৃত হওয়া সুরেন্দ্রনাথের নিজের পক্ষে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল সেদিন।"

বিদ্যাসাগর চাকরি দিলেন সুরেন্দ্রনাথকে।

ভারতের ভাবী রাষ্ট্রগুরুর জীবনের সেই দারুণ দুর্দিনে এটা যে একটা কতবড় মহৎ কাজ ছিল, আজ প্রায় শতবর্ষ পরে, আমরা বোধ হয় তা কতকটা অনুধাবন করতে পারি। বিদ্যাসাগরের এই মহানুভবতা তিনি জীবনে বিস্মৃত হন নি। তালতলার নিয়োগীপুকুর ইষ্টলেনে অবস্থিত পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ বাস করতেন। মেট্রোপলিটান কলেজ তখন সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুর্বদিকে একটি বড় ময়দানে অবস্থিত ছিল—দুইটি বড় টিনের ঘর মাত্র। এখন সেখানে রাজা জয়গোবিন্দ লাহার বিরাট প্রাসাদ উঠেছে। তখন মোটর গাড়ির যুগ নয়—যানবাহনও অল্প ছিল। সুরেন্দ্রনাথ পাল্কীতে চড়ে তালতলা থেকে স্বীয় কর্মস্থলে প্রত্যহ যাওয়া-আসা করতেন। শুরু হোল তাঁর গৌরবময় অধ্যাপক-জীবন। অধ্যাপকরূপে তিনি শতশত বাঙালী ছাত্র যুবকের চরিত্রের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন: "আমি চার বৎসরকাল মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িয়াছিলাম। তাঁহার নিকট মেকলের *Essay on Clive & Warren Hastings* এবং বার্কের *Reflection on the French Revolution* নামক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করি। তিনি যেভাবে মূল সাহিত্য অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যা করিতেন তাহা সত্যই অতুলনীয়। মনে হয়, এখনও যেন সেই ধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিলেন না।"

তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত করিয়া ইহার জীবনস্রোত ভিন্নাভিমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষকতা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অনেকটা স্বাধীন চিন্তার অবসর লাভ করিলেন। .. তিনি অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনপ্রাণে স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। শিক্ষকতার প্রশস্ত অঙ্কে অসাধারণ ধী-শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষকতায় আদর্শ গুরু। শিক্ষাদানের উপযুক্ততা তিনি সম্পূর্ণই লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বক্তৃতা করিবার শক্তি

অসাধারণ। এই শক্তিবলে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রহৃদয়ের দেবতা হইয়া পড়িলেন। ছাত্রসম্প্রদায় ইহার অকৃত্রিম ভক্ত হইয়া উঠিল।"

বস্তুত, শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কেই একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচিত হোতে পারে। একাদিক্রমে সাঁইত্রিশ বছরকাল তিনি অধ্যাপনা করেছেন। বাংলা-দেশের খুব কম শিক্ষকই এত দীর্ঘকাল নিজেকে শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত রাখতে পেরেছেন। তিনি রাজনীতিসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না, শিক্ষার মূল্যটা বিশেষভাবে বুঝতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, জাতীয় জীবন একদেশদর্শী হয়ে সাফল্যমণ্ডিত হোতে পারে না; এবং প্রকৃষ্টরূপে ও ব্যাপকরূপে দেশে শিক্ষা বিস্তার না হোলে উপায় নেই। সেইজন্য সহস্র কর্মের মধ্যেও শিক্ষাকার্যে তিনি নিজেকে সর্বদাই ব্যাপৃত রাখতেন। ইংরেজী লেখায় ও বলায় তাঁর যথেষ্ট শক্তি ছিল। ছাত্রশিক্ষায় সে শক্তি বেড়ে উঠল। তাঁর অধ্যাপক-জীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ লক্ষিত হয় যখন তিনি তাঁর নিজস্ব শিক্ষায়তন 'রিপন কলেজ' (বর্তমান নাম, 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ') স্থাপন করেন। সে কাহিনী পরে বলব। মেট্রোপলিটান কলেজের সঙ্গে তিনি পাঁচ বছরকাল নিযুক্ত ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরে, ১৮৭৯ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাশ প্রভৃতির চেষ্টায় সিটি কলেজ স্থাপিত হয় (তখন সিটি স্কুল—কলেজ বিভাগ তখনো খোলা হয়নি)। অধ্যাপক হিসাবে তখন সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন; তাই নব-প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথকে তাঁদের কলেজে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। এই নবীন ব্রাহ্মদলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল এবং এঁদের অনেকের সহায়তায় তিনি তখন 'ভারতসভা' স্থাপন করেছেন। দেশের উপর ইঁহাদের প্রভাব ক্রম-বর্ধমান, তাই সিটি স্কুলের বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রকে তিনি বেছে নিলেন। আয়বৃদ্ধি ভিন্ন, তিনি দেখলেন যে এইখানে যোগদান করলে ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের পরিধি আরো বিস্তৃত হবে এবং সেইটাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

সুরেন্দ্রনাথ সিটিতে শিক্ষক পদ গ্রহণ করলেন।

এর আরো একটা কারণ ছিল। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের শিক্ষানৈতিক মতের সঙ্গে তাঁর মতের সংঘর্ষ বেধেছিল। 'সিটি'-তে যোগদান করলেও তিনি

তখনি মেট্রোপলিটান ত্যাগ করেন নি ; দু'জায়গাতেই পড়াতেন। এজন্য পরিশ্রম খুবই হোত, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাতে ক্লান্তিবোধ করতেন না। অবিরত কর্মে নিযুক্ত থাকার মধ্যেই তিনি যেন পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। এইসময়ে বিদ্যাসাগর একদিন তাঁকে ডেকে বললেন : "সুরেন, তুমি সিটি কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ কর। কেবল আমার কলেজেই অধ্যপনা কর। তোমার মাইনে আমি আর একশো টাকা বাড়িয়ে দেব।" সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এ প্রস্তাবে সম্মত হোলেন না। বললেন : "সিটি কলেজ আমি ছাড়তে পারব না। তার বদলে আমি আপনার কলেজে আরো একঘণ্টা বেশি পড়াতে রাজী আছি।" বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাবে সম্মত হোলেন না। অতঃপর মেট্রোপলিটান কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হোল ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের সংস্রব তিনি কোনোদিনই বর্জন করেননি। সিটি কলেজে তাঁর বেতন ছিল মাসিক তিনশত টাকা ; প্রত্যহ চারঘণ্টা করে পড়াতে হোত।

এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে, যে একগুঁয়েমিতা বা আত্মনির্ভরতা জীবনের উন্নতির প্রধান সহায়ক হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথেও তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ উপেক্ষা করিলেন। সিটি কলেজ পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি কর্তব্য ও ন্যায়ের অনুরোধে এরূপ অবস্থায় সিটি কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এজন্য আমাকে যদি মেট্রোপলিটান পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। সিটি কলেজ ছাড়িয়া আপনার সম্মান-রক্ষারূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা আমি কর্তব্য মনে করি না। যদিও আপনি আমার পিতৃতুল্য গুরু এবং নিরাশ্রয় সময়ের আশ্রয় স্থল, তথাপি সে সকল অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতার তুলনায়, সিটি কলেজে যেমন অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত আছি, এক্ষণে সেইরূপ অবস্থায় থাকাই আমার বিবেকানুমোদিত'।"

এই যে সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের দৃঢ়তা ইহাই তাঁর জীবনের সকল কর্মে একটা অনন্যসাধারণ মহিমা আরোপ করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে, যখন তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন, সেইসময়ে ত্রিপুরা রাজসরকার মাসিক সাতশত টাকা বেতনে তাঁকে তাঁর সচিবের পদে (English Secretary) নিযুক্ত

করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষকতা করে তখন তিনি মাসিক মাত্র তিনশত টাকা উপার্জন করছিলেন। নিকট বা দূর ভবিষ্যতে এই বেতনের বিশেষ বৃদ্ধি পাবারও আশা ছিল না; নব-প্রতিষ্ঠিত একটি বে-সরকারী কলেজের পক্ষে এর বেশি তখন দেওয়া সম্ভবও ছিল না। তবুও তিনি সাতশত টাকা বেতনের লোভ ত্যাগ করে শিক্ষকতাকাজেই ব্রতী রইলেন। ত্রিপুরা রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ করলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোত না, তিনি ছাত্রসমাজের সংস্রব থেকে দূরে সরে যেতেন। রাজসরকারের চাকরিতে হয়ত ভবিষ্যতে খ্যাতি ও অর্থলাভ দুই-ই তাঁর ঘটতো, কিন্তু তখন থেকেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতি সাব্যস্ত করেছেন, তাই তাঁর পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভবপর ছিল না।

সিটি কলেজে থাকতে থাকতেই তিনি ফ্রি চার্চ কলেজের (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ) সঙ্গে সংযুক্ত হোলেন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে। এ ছাড়া, তখন থেকেই তিনি ধীরে ধীরে ছাত্রসভা ও ভারতসভার মাধ্যমে নিজেকে রাজনীতিক কার্যে ব্যাপৃত রাখতে আরম্ভ করেছেন এবং বক্তৃতামঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা নূতন উন্মাদনা নিয়ে এসেছেন। আবার সেই একই সময়ে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেও তিনি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছেন, দেখা যায়। শিক্ষকতা, রাজনীতি, জনসেবা ও সাংবাদিকতা—এই চারটি কার্যে তিনি যুগপৎ আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এই চারটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ যে একজন কত বড় কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তা তাঁর যুগপৎ এই চতুর্বিধ প্রয়াস থেকেই বুঝা যায়। "He was an embodiment of constant and persistent activity,"– সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একজন ইংরেজ রাজপুরুষের এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। বস্তুত, রামমোহন থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালী সন্তানের জীবনেতিহাস আলোচনা করলে পরে দেখা যাবে যে, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন কর্মিষ্ঠ পুরুষ। কর্মই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সেই ব্রতাচরণে তাঁদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা যায়নি কোনোদিন। জীবনের একটি মুহূর্তও তাঁরা বৃথা যেতে দেন নি। নিরলস কর্মসাধনা দ্বারা তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতিকে উন্নতির পথে,

সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন। এ যুগের কর্মবিমুখ, ভাববিলাসী বাঙালী সন্তানগণ যেন এই কথাটি বিস্মৃত না হন।

ফ্রি চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রবার্টসন সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমি এই অনুরোধ গ্রহণ করিলাম এবং কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হইলাম। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত আমি ফ্রি চার্চ কলেজের অধ্যাপক ছিলাম। তারপর আমার নিজস্ব শিক্ষায়তনের কার্য বৃদ্ধি পাইলে আমি এই কলেজের অধ্যাপক-পদে ইস্তফা দিয়াছিলাম।" সিটি কলেজে থাকতেই তিনি ১৮৮২ সালে পটলডাঙ্গার প্রেসিডেন্সি ইনষ্টিটিউশন নামক একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি এই স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন। তখন সেখানে অনধিক একশত ছাত্র মাসে পড়ত এবং এনট্রান্স পর্যন্ত পড়ান হোত। যখন সুরেন্দ্রনাথ এর ভার গ্রহণ করেন তখন এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র দুইশত। এই স্কুলটিই রিপন কলেজের মূল। তিনি নিজস্ব কর্মক্ষেত্রটিকে মনের মতোন করে গড়ে তুলবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং এই স্কুলটির নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। ক্রমে এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে এম-এ. ও বি-এ. পড়াবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮২ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি ইনষ্টিটিউশনের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন এবং অতঃপর তিনি এর উন্নতিবিধানে তাঁর শ্রম ও প্রতিভা নিয়োজিত করেন। লর্ড রিপনের স্বদেশযাত্রার কিছু পুর্বে, ১৮৮৪ সালে তাঁরই অনুমতিক্রমে এই বিদ্যালয়ের নাম 'রিপন কলেজ' রাখা হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়। সুরেন্দ্র-নাথের জীবিতকালেই প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে হ্যারিসন রোডে এই কলেজের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়, একটি সুন্দর ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয় এবং কলা, বিজ্ঞান ও আইন—এই তিনটি বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। কলেজের স্বত্বাধিকারী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং তিনি উচ্চ বেতনে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক কৃতী অধ্যাপক নিয়োগ করতেন। ফলে, কলিকাতায় সেকালে রিপন কলেজের খ্যাতির যেমন সীমা ছিল না, তেমনি এখানকার অধ্যাপকগণও

যশস্বী হয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর স্বত্ব ত্যাগ করে সুরেন্দ্রনাথ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে জনসাধারণের হস্তে প্রদান করেন; তদবধি ইহার পরিচালন-ভার কয়েকজন ট্রাষ্টির উপর ন্যস্ত আছে। ১৮৮৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ খিদিরপুরে রিপন স্কুলের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর হাওড়াতেও আর একটি শাখা স্থাপন করেন। প্রতি সপ্তাহে স্বয়ং পড়াতে যেতেন। এইসময়েই একদিন ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়টের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ এসেছিল স্বয়ং লাটসাহেবের কাছ থেকে। কথিত আছে, খিদিরপুর স্কুলে পড়াতে যাবার সময় আলিপুরে বেলভেডিয়ার লাটভবনে সুরেন্দ্রনাথ এলেন সাক্ষাৎ করতে। লাটসাহেব তখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ একটুকরা কাগজে লাটসাহেবকে লিখে পাঠালেন—"আমি বিলম্ব করিতে পারিতেছি না; কারণ খিদিরপুর রিপন স্কুলে যাইয়া আমাকে এখনই পড়াইতে হইবে।" সুরেন্দ্রনাথের এই স্বাধীনতা এবং কর্তব্যজ্ঞান দেখে ছোটলাট অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং আর সব কাজ ফেলে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রিপন কলেজ তাঁর বড় আদরের বড় প্রিয় বস্তু ছিল। কেমন করে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ইতিহাস তিনি একদিন বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন। এই কলেজের সাফল্যের মূলে ছিলেন আর একজন। তিনি রিপন কলেজের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অমৃতচন্দ্র ঘোষ। এই কলেজে যখন তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী ছিলেন তখন প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাপূর্ণ অধ্যাপনা শুনে চরিতার্থ হোত। অধ্যাপনা ত্যাগ করেও মন্ত্রিত্বগ্রহণের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে এই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই কাউন্সিলের সভাপতিপদে সমাসীন থেকে কার্যনির্বাহকসভার কর্তব্য নির্ধারণ করতেন। তাঁর জীবনের প্রায় সাঁইত্রিশ বছরকাল সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী ছিলেন। শিক্ষকতা ছিল তাঁর জীবনের পরম প্রিয় ব্রত। সেই ব্রতাচরণে কোনোদিন তাঁর মধ্যে শৈথিল্য দেখা যায়নি। সুরেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে নিজেকে বিভিন্ন প্রকার দেশহিতকর কর্তব্যে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপনাকেই তিনি আর সব কাজের চেয়ে উচ্চস্থান প্রদান করতেন।

রাজনীতিক কাজের গুরুত্ব তাঁর কাছে সমধিক ছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকতা কাজকে তিনি সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করতেন।

রিপন কলেজ দেশাত্মবোধর ও জাতীয় প্রেরণার উৎস ছিল। দেশের যুবকবৃন্দ এখানে আসত সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক বিশ্লেষণ শুনতে - বার্কের গ্রন্থব্যাখ্যান উপলক্ষ মাত্র ছিল। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা তাদের প্রাণে ঢেলে দিত মৃতসঞ্জীবনী সুধা। উত্তরকালে এইসব ছাত্রই কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে নানাপ্রকার সাধারণ হিতকার্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এইভাবেই একা সুরেন্দ্রনাথ যেন শত সুরেন্দ্রনাথরূপে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশময়। যে বীজ তরুণ ছাত্রদল তাঁর কাছ থেকে লাভ করে, বাংলার জেলায় জেলায় শহরে শহরে তা মহাতরুতে পরিণত হোতে বিলম্ব হয়নি। যে অগ্নিমন্ত্রে তিনি এই অগণিত ছাত্রবৃন্দকে দীক্ষিত করেন, পরবর্তীকালে দেশের সর্বত্র আমরা তারই সাধনা প্রকটিত হোতে দেখেছি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যথার্থই বলেছেন: "রাজনীতি সম্বন্ধে আমার যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা এই গুরুরই পাদপ্রান্তে লাভ করিয়াছিলাম। তখনকার বাংলার যুবক ছাত্রদের প্রাণে তিনিই নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। নব্য ইত্যালির সৃষ্টিকর্তা বিরাট পুরুষ ম্যাটসিনির কথা সর্বদাই তিনি বলিতেন এবং তাঁহার সুমহান্ আদর্শে যুবকদের অনুপ্রাণিত করিতেন। বাংলার সর্বত্র আজ যে জাতীয় স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি, তাহার আদি কেন্দ্র ও মূলীভূত কারণ সুরেন্দ্রনাথ।" আর এরই অন্যতম পীঠস্থান ছিল তাঁর রিপন কলেজ। বাংলার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সাধনের ইতিহাসে এই শিক্ষায়তনটির নাম তাই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্তের ব্রজমোহন বিদ্যালয় ও কলেজ ব্যতীত বাংলাদেশে আর কোনো শিক্ষায়তন এই গৌরবের দাবী করতে পারে না।

শিক্ষকতা তাঁর কাছে 'যেমন-তেমন' জিনিস ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন: "I regarded my vocation as a sacred calling"—এমন কথা বাংলার খুব কম শিক্ষকের মুখেই আমরা শুনেছি। সহস্র কর্মের মধ্যে লিপ্ত থেকেও, তিনি শিক্ষাদান কাজটিকে কখনো অবহেলা করতেন না; ক্লাসে আসতেন রীতিমত প্রস্তুত হোয়ে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ এমন

প্রবল ছিল যে তিনি বলতেন : "I always set a high value upon my educational work and put it in the forefront of my activities." এই অনুরাগ ছিল বলেই না তিনি একাদিক্রমে সাঁইত্রিশ বছর শিক্ষাদানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরেছিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজকে তিনি যে রাজনৈতিক কাজের চেয়েও বড়ো করে দেখতেন তার প্রমাণ আছে তাঁর পরবর্তীকালের একটি বক্তৃতায়। সেখানে তিনি বলেছেন : "Political work is more or less ephemeral, though nonetheless highly useful. Educational work has in it the elements of permanent utility. The empire of the teacher is an ever-enduring empire, which extends over the future. The teachers are the masters of the future. I cannot think of a nobler calling than theirs. Theirs is a heaven-appointed task, a sacred vocation. But how few realise their responsibilities or rise to the height of their mission !" সুরেন্দ্রনাথের এই অনুযোগ—"How few relalise their responsibilities"—সেদিনও যেমন, আজো তেমনি মর্মান্তিকভাবে সত্য। শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ এখানে তাঁর রাজনৈতিক সত্তাকে অনেকখানি অতিক্রম করে গিয়েছেন দেখা যায়।

ছাত্রদের উপর শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব কি অপরিসীম ছিল সে বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম। কলিকাতা পুলিশকোর্টের তৎকালীন উকীল ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রিয়লাল দাশ লিখেছেন : "আমি তখন সিটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সুরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রোপলিটান ত্যাগ করে এখানে যোগদান করেছেন। তাঁর সময় থেকেই সিটি স্কুল শহরের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানিকেতনে পরিণত হয়। তিনি এনট্রান্স ক্লাসের ছাত্রদের ইংরেজী পড়াতেন এবং তাঁর ক্লাসঘরের ঠিক পাশের ঘরটিতেই আমাদের ক্লাস বসতো। একদিন ক্লাসে একটি ইংরেজী কবিতায় 'soaring' শব্দটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে খুব হাসাহাসি হয়। আমাদের শিক্ষক এর বাংলা করেছিলেন সোঁ সোঁ। আমরা সবাই মিলে

তখন সমস্বরে 'সোঁ সোঁ' করে এমনভাবে চীৎকার করে উঠেছিলাম যার ফলে পাশের ঘরের শিক্ষকের ভীষণ অসুবিধা হয় - হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আমাদের শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যত বেত্রদণ্ডে সে গোলমাল কিছুমাত্র থামেনি। পাশের ঘরের ক্লাস অগত্যা ভেঙে গেল—আমাদের ঘরের সামনের বারান্দাটি এনট্রান্স ক্লাসের ছাত্রদের ভীড়ে পূর্ণ হোল। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন শিক্ষক বেতহাতে ছুটে এসেছেন আমাদের ক্লাসে। কিছুতেই কিছু হয় না—সেই সোঁ সোঁ শব্দ কিছুতেই থামে না। সমস্ত স্কুলেই একটা বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দিলো। এমন সময়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন সিংহপ্রতিম সুরেন্দ্রনাথ। মুহূর্তমধ্যে সব গোলমাল নিস্তব্ধ, শান্ত হয়ে যায়। তিনি মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে একটি ছোট্ট বক্তৃতা করলেন এবং বললেন – 'ছাত্রদের আচরণের উপরই স্কুলের সুনাম দুর্নাম নির্ভর করে। আমি আশা করি এই কথাটি মনে রেখে ভবিষ্যতে তোমরা আর কখনো এমন বিসদৃশ আচরণ করবে না।' মন্ত্রৌষধির মতোন কাজ করলো তাঁর সেই উপদেশ। তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন সিটি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এই রকম দুর্বিনীত আচরণ আর কখনো দেখা যায়নি। তাঁর কারাদণ্ডের সময়ে সিটির সকল ছাত্রই সার্টের ওপর কালো ব্যাজ ধারণ করেছিল। সেকালে ছাত্রদের নিকট এমন সম্মানলাভ আর কোনো শিক্ষকের ভাগ্যে ঘটেনি।"

সত্যই ছাত্রসমাজের পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তারা তাঁকে আদর্শ শিক্ষক মনে করত। ছাত্ররা তাঁকে সেবা-ভক্তি করত, তিনিও ছাত্রদের তেমনই স্নেহ করতেন। "I love the students," এই কথা সুরেন্দ্রনাথের। তাঁর অনন্যসাধারণ ছাত্রপ্রীতিই যে তাঁকে সেদিন বাংলার শিক্ষকসমাজে সর্বাপেক্ষা ছাত্রপ্রিয় করে তুলেছিল—এ কথা সুরেন্দ্রনাথ নিজেই ব্যক্ত করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর কারাদণ্ডের সময়, সে কথা যথাস্থানে বলব। নিজের হাতে গড়া এই উপাদান দিয়েই তো তিনি দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর জীবনচরিত আলোচনাকালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। তাঁর একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি একবার বলেছিলেন : যদি আমি ছাত্রগণের জীবন গঠন করিয়া থাকি, তাহা হইলে বলিব, তাহারাও উহার প্রতিদানে আমাকে আমার বর্তমান অবস্থায় গড়িয়া তুলিয়াছে। আমি যদি ছাত্রগণকে দেশসেবাব্রতে উদ্বোধিত করিয়া থাকি, তাহা হইলে বলিব, তাহারাও উহার বিনিময়ে আমাকে তরুণোচিত উৎসাহে উৎসাহিত করিয়াছে।"

বাংলার ছাত্রসমাজের এই আনুগত্য রাষ্ট্রগুরুর জীবনে কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল, অতঃপর আমরা সেই কাহিনী বলব।

॥ পাঁচ ॥

'ছাত্রসভা' সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের আর একটি কীর্তি।

তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান তিনি স্বহস্তে তৈরি করে নিয়েছিলেন। এদেশে তাঁর পূর্বে আর কোনো অধ্যাপক এমনভাবে রাজনীতির চর্চা করেন নি যেমন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পূর্বে আর কোনো অধ্যাপককে আমরা এই কথা বলতে শুনিনি: "ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়।" তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি সহায়ে এই সত্যটা বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি সার্থকভাবে এবং ব্যাপকভাবে এই দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধন করতে হয়, তবে তার বনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে দেশের তরুণ ছাত্রদের এবং তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে হবে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এই উপলব্ধিরই পরিণতি Students' Association বা ছাত্রসভা। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসু দুজনে মিলে ১৮৭৫ সালে এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়েই তাঁর অলোকসামান্য বাগ্‌বিভূতি প্রকাশিত হয় এবং তাঁর রাষ্ট্রীয় নায়কত্ব গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে তাঁর সময় থেকে রাজনৈতিক চিন্তাব যে উন্মেষ দেখা যায় তার পরিণতিসাধনে এই ছাত্রসভার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল; কারণ, পরবর্তীকালে এই সভা থেকেই আমরা একাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে পেয়েছি। এই তথ্যটি আমাদের মনে রাখা দরকার। দেশে যে রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের অমন দ্রুত প্রসার হতে পেরেছিল তার প্রকৃত কারণটা তো এইখানেই। সুতরাং, বাংলার রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে এই ছাত্রসভাকে কিছুতেই পৃথক করে দেখা চলে না।

ছাত্রসভা কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের একক প্রয়াস ছিল না; এর সঙ্গে মিলেছিল আর একজনের প্রয়াস। তিনি আনন্দমোহন বসু। আনন্দমোহন সুরেন্দ্র-নাথের চেয়ে বয়সে চার বছরের বড়ো ছিলেন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের আড়ালে 'আনন্দমোহন বসু' এই নামটি আজ চাপা পড়ে গেছে। অথচ মনীষা,

চরিত্র এবং দেশপ্রেমে এঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সময়ে বাংলাদেশে আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন: "বাংলার নবযুগের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ যে অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাহা পান নাই, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু আনন্দ-মোহন বসুর সাহায্য না পাইলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে যে কাজটা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা করিতে পারিতেন না, ইহাও অতি সত্য।" সুতরাং বাংলার এই বিস্মৃত মনীষি সম্পর্কে প্রসঙ্গত দুই-একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ছাত্র হিসাবে সেযুগে এমন দেদীপ্যমান ছাত্র আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে এম-এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আনন্দমোহন বিলাত যান। সেখানেও তিনি ছাত্র হিসাবে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ভারতীয়দের মধ্যে আনন্দমোহনই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার (Wrangler)। প্রতিভা ও চরিত্রগুণে কেমব্রিজ সমাজে যুবক আনন্দমোহন যে প্রতিষ্ঠালাভ কবেছিলেন, তা কেমব্রিজের ইতিহাসে আজো স্মরণীয় হোয়ে আছে। কেমব্রিজের সর্বোচ্চ উপাধিলাভ করে এবং পরে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়ে তিনি ১৮৭৫ সালে দেশে ফিরে আসেন। শীঘ্রই তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর খ্যাতির বিশেষ কারণ ছিল তাঁর চরিত্র। এই চরিত্রবলেই আনন্দমোহন সকলের শ্রদ্ধেয় হোয়ে উঠেছিলেন। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন: "সেকালের কোনো বিলাত-ফেরৎ বাঙালী আনন্দমোহনের মতন দেশের লোকের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধালাভ করেন নি; সুরেন্দ্রনাথও নন; অন্য কেউই নন।"

আনন্দমোহনের কথা আরো একটু বলব। বাংলার নবযুগের যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি, সেই ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের যেমন, আনন্দমোহনেরও তেমনি বিশেষ স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিই এই ইতিহাসের স্রষ্টা। সিভিল সার্ভিসের স্বর্গভ্রষ্ট সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর দেশবাসীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে আনন্দমোহনের ন্যায় একজন ব্যক্তির সাহচর্য কতদূর প্রয়োজনীয় ছিল তার একটা চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন

বিপিনচন্দ্র। তিনি লিখেছেন: "ইংরাজ আমলাতন্ত্র সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে কালি লাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেশের লোকের চক্ষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। তখনো লোকে প্রাণ খুলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে কেবল অলোক-সামান্য বাগ্মিতাপ্রভাবে লোকনায়কত্ব লাভ করা সম্ভব ছিল না। আনন্দ-মোহনের বিশুদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা মিলিত হইয়াই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রকর্মের সূচনা করে। একা সুরেন্দ্রনাথ দেশে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শকে এমনভাবে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেন না। আনন্দমোহনের পক্ষেও একেলা এ কাজটা করা অসাধ্য ছিল। ইহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সাধনার প্রতিষ্ঠা করেন।"

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল মানুষ আনন্দমোহন একেবারেই পুরোদস্তুর আইডিয়ালিস্ট। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন যে, তিনি তাঁর সময়ে এমন উচ্চ আদর্শবাদী পুরুষ এদেশে আর বড় একটা দেখতে পান নি। তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, একটা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শকে ধরে নিজের এবং দেশের আধুনিক ধর্মকর্ম আনন্দমোহন গড়ে তুলেছিলেন। এইজন্যই বুঝি স্বামী বিবেকানন্দ এই মানুষটির প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সমকালীন বাংলায় এমন সত্যবাদী ও সংযত-চরিত্রের মানুষ বোধ হয় দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। কথিত আছে, তাঁর কঠোর ধর্মনিষ্ঠা দেখে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদা কৌতুকভরে আনন্দ-মোহনকে 'Saint Anandamohan' বলে ডাকতেন। এ হেন ব্যক্তি যে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে পশার জমাতে পারেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বলেছি, সুরেন্দ্রনাথ প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন এবং সেই অর্থে তাঁর মধ্যে আদর্শবাদ, আনন্দমোহনের তুলনায় অনেকখানি কম ছিল। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে। মনীষি বিপিনচন্দ্রের অভিমতটাই এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: "আনন্দমোহনের স্বাধীনতার আদর্শ সুরেন্দ্রনাথের আদর্শ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পূর্ণতর ছিল। আনন্দ-মোহনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তাহা কখনও ছিল

না। আনন্দমোহনের idealism কিম্বা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ সুরেন্দ্রনাথের চিত্তকে কখনও অধিকার করে নাই; স্পর্শ করিয়াছিল কি না ইহাই সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথ সর্বদাই সুবিধাবাদী ছিলেন। কোনো কদর্থে কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। ইংরাজীতে যাহাকে expediency কহে, এখানে আমি তাহাকেই সুবিধাবাদ কহিতেছি। এই expediency বা সুবিধাবাদই পলিটিসিয়ান বা সাধারণ রাষ্ট্রকর্মীদের জীবনের মূলসূত্র। এই রাষ্ট্রকর্মীরা কোনো সনাতন আদর্শের বড় ধার ধারেন না। আসন্ন কাজটা কি করিয়া হাসিল হইবে তাহারই দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। এই সনাতন আদর্শের প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং নিষ্ঠাকেই ইংরাজীতে idealism কহে। আর এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কোনোদিন এই idealism ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

"সুরেন্দ্রনাথ আপনার অলৌকিক বাগ্মিতা প্রভাবে দেশের কোমলমতি যুবকদলকেই মাতাইয়া দিলেন, কিন্তু নিজে মাতেন নাই। তিনি দেশকে জাগাইয়াছেন, নিজে নাচেন নাই। দেশকে স্বাধীনতাযজ্ঞে ঝাপাইয়া পড়িতে প্রণোদিত করিয়াছেন, নিজে কোনোদিন ইষ্টানিষ্ট বিচার-বিবর্জিত হইয়া এ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই।···বিধাতা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ফললিপ্সু রাষ্ট্রকর্মী করিয়াই গড়িয়াছিলেন। ভাবুক ও অপ্রত্যক্ষ আদর্শের অনুরাগী করিয়া গড়েন নাই। বাঙালী চিরদিনই ভাবুকের জাত। আদর্শের সাড়া না পাইলে বাঙালী কোনোদিন আত্মহারা হইয়া কর্মের পথে ধাবিত হয় নাই। সুতরাং আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালীও কেবল সুরেন্দ্রনাথের সুবিধাবাদী রাষ্ট্রীয় কর্মের আহ্বানে মাতিয়া উঠিত না। সুরেন্দ্রনাথের যাহা ছিল না, আনন্দমোহনের তাহা ছিল; তাঁহার মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা ছিল। আনন্দমোহনের এই idealism-এর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের practical politics এবং অসাধারণ বাগ্মিতা মিলিত হইয়াই আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা করে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে পৃথক্ করা যায় না।"

এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন যে, "আনন্দমোহনের অন্তরের স্পৃহা ছিল লোকসেবা ও দেশসেবা—তাই

আইন-ব্যবসায়ে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি কোনোদিন ব্যারিস্টারি ব্যবসায়কে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত বলে গ্রহণ করেন নি।" নিঃসন্দেহে এ তাঁর আদর্শবাদেরই পরিচায়ক। বিপিনচন্দ্রও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "আইনের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিষ্কাসনে আনন্দমোহন বোধহয় কোনোদিন গভীর আনন্দবোধ করেন নাই। তাঁহার জীবনের আনন্দের উৎস ছিল স্বাধীনতার সাধনাতে। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র শ্রেষ্ঠতম স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য তাঁহার অন্তর আযৌবন লালায়িত হইয়াছিল। এই স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণাতেই তিনি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলার ইংরাজী-নবীশদিগের নূতন ও উদার রাষ্ট্রকর্মের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া দণ্ডায়মান হন।"

এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ দেশে রাষ্ট্রীয় চিন্তার উন্মেষসাধনে ও রাষ্ট্রীয় কর্মে প্রেরণা দানে এই দুজন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তির মিলন ইতিহাসের এক সুলগ্নে ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রায়েই ঘটেছিল। আনন্দমোহনের ছিল ভাব, সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ছিল বাণী; এই ভাব ও বাণীর মিলিত শক্তিই সেদিন আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় রচনা করেছিল। ভারতবাসীর অন্তরে রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার পিছনে এই দুই ব্যক্তির মিলিত প্রয়াস এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে তাঁদের সেই প্রয়াসের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, তার আনুপূর্বিক ইতিহাস বোধ হয় আজো রচিত হয়নি। যদি হোত তাহোলে বুঝতাম আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ের জীবন বাঙালীর কী মূল্যবান সম্পদ।

ছাত্রসভা গঠনে সুরেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন?

এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। স্বরচিত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন: "In my mind my educational and my political work were indeed interlinked. I felt that the political advancement of the country must depend upon the creation

among our young men of a genuine sobre and rational interest in public affairs. The beginnings of public life must be implanted in them" এখানে তিনটি শব্দ অনুধাবনযোগ্য, যথা—genuine, sobre ও rational; ভবিষ্যতে যাঁরা জনসাধারণের কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন, মনে হয়, রাষ্ট্রগুরু তাঁদের লক্ষ্য করেই এই কথা কয়টি বলে থাকবেন। তাঁর নিজের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও এই তিনটি বিশেষ গুণের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। তখন সুরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এই সংকল্পের উদয় হোল যে, তিনি ছাত্রদের মধ্যে একটি নূতন ভাব জাগিয়ে তুলবেন, একটি নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করবেন। এই সংকল্পেরই পরিণতি Students' Association বা ছাত্রসভা।

তাঁর এই উদ্যোগে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা সুরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন আনন্দমোহন বসুর নিকট থেকে, এ কথা তিনি সকৃতজ্ঞচিত্তে আত্মচরিতে স্বীকার করেছেন। "His heart was in the work of the country"—তিনি দেশহিতে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আনন্দমোহন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন দেশে ফিরলেন। ভারতে পৌঁছে তিনি বোম্বাইতে নেমে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন যে, শহরের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীরা মিলিত হোয়ে দেশে একটা নূতন শক্তি জাগাবার চেষ্টা করছিলেন। বোম্বাইতে তখন একটি নূতন ছাত্র আন্দোলন (student movement) গড়ে উঠছিল। এর থেকেই ক্রমে ক্রমে Deccan Education Society-র জন্ম। এই সমিতিটিই দাক্ষিণাত্যে আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করে। লোকমান্য টিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের ভারত-প্রসিদ্ধ লোকনায়কগণ এই এডুকেশন সোসাইটি থেকেই নিজেদের দেশসেবাব্রতের দীক্ষালাভ করেন। রাণাডে প্রমুখ তখনকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের ছাত্রজীবনে বোম্বাইয়ের ছাত্র আন্দোলন থেকে পরোক্ষভাবে কিম্বা অপরোক্ষভাবে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। আনন্দমোহন বিলাত থেকে ফিরবার পথে বোম্বাইয়ের এই ছাত্র আন্দোলনের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করে আসেন।

কলিকাতায় পৌছেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলে তিনি এখানে একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইলেন। এইভাবেই ১৮৭৫ সালের শেষাশেষি অথবা ১৮৭৬-এর প্রথমভাগে এই মহানগরীতে Calcutta Students' Association প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছাত্রমণ্ডলীকে আশ্রয় করেই সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন দুজনেই রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বাংলার ছাত্রসমাজ তখনো সংঘবদ্ধ হয়নি। অথচ এই উপাদানকে ঠিকভাবে গড়ে দেশের কাজে নিযুক্ত করতে পারলে যে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এ কথাটা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের পূর্বে এদেশে আর কেউ চিন্তা করেন নি। এই তরুণ ছাত্রগোষ্ঠীকে অবলম্বন করেই সুরেন্দ্রনাথ যেমন সেকালের শিক্ষিত বাঙালীদের রাষ্ট্রীয় জীবনগঠনে প্রয়াস পেয়েছিলেন, সেইরূপ এই ছাত্রগোষ্ঠীই সুরেন্দ্রনাথের ও আনন্দমোহনের রাষ্ট্রনায়কত্ব গড়ে তুলেছিল। এই ছাত্রসভার মঞ্চেই সর্বপ্রথমে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মী-প্রতিভার স্ফুরণ ও প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করি। তখন থেকেই সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন পাশাপাশি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হতেন আর বাংলার তরুণদল পাগলের মতন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তৃতা শুনত। উভয়েই সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই দুই স্বনামধন্য পুরুষ রাজনীতিক্ষেত্রে যুগপৎ অবতীর্ণ হয়ে কী যুগান্তর এনেছিলেন, সে ইতিহাস কি কখনো বিস্মৃত হবার?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৮৭৫ সাল থেকেই সুরেন্দ্রনাথ দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন আর ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল এই একটি মানুষ তাঁর দেশ ও জাতিকে কি অবস্থা থেকে কি অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস রচনা করা বড় সহজ কাজ নয়। বর্তমান ভারতের স্বাধীনতার সর্বপ্রধান পুরোহিত কিভাবে সমাজের একটি উপেক্ষিত শক্তির আশ্রয়ে নিজের শক্তিকে গড়ে তুলেছিলেন, সেই ইতিহাস না জানলে সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের পরিচয় গ্রহণ অসমাপ্ত থেকে যায়। দেশের শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীকে নিয়ে তিনি কিভাবে নূতন স্বাধীনতার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন এবং কিভাবে তিনি এই কাজে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, সেই ইতিহাসের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রগুরুর ভাবীজীবনের সূচনা।

এ কথা সত্য যে তাঁর আগে থেকেই ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় বাংলাসাহিত্যের আশ্রয়ে দেশে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। কিন্তু এই সাধনার কোনো প্রতিষ্ঠান বা মণ্ডলী গড়ে ওঠেনি। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দ-মোহন বসু প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটা নূতন স্বাধীনতার সাধকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন। আগেই বলেছি, বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আনন্দমোহন বোম্বাইতে ছাত্রসমাজের কার্যাবলী দেখে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই সমাজের সভ্যরাই বোম্বাই শহরে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। বোম্বাইয়ের ছাত্রসমাজের তত্ত্বাবধানে তখন দুই-একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলিকাতায় ফিরে আনন্দমোহন এখানে বোম্বাইয়ের মতন একটি ছাত্রসমাজ গড়ে তুলতে চাইলেন। ঠিক সেই একই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করবার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন। এই দুই মনীষির চিন্তা একত্র মিলিত হোয়েই সেদিন বাংলা দেশে ছাত্রসভার জন্ম দিয়েছিল। এর প্রথম নাম ছিল Calcutta Students' Association এবং এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন আনন্দমোহন বসু; সহকারী সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সম্পাদকপদে বৃত হয়েছিলেন নন্দকৃষ্ণ বসু। ইনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। এম-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নন্দকৃষ্ণ তখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তখনকার ছাত্র-সমাজে এঁর অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি পরে Statutory সিভিলিয়ান হয়ে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ক্রমে জেলার জজ পর্যন্ত হয়েছিলেন। নন্দকৃষ্ণের পরে কলিকাতা ছাত্রসমাজের দ্বিতীয় সম্পাদক যিনি হয়েছিলেন তিনি ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী।

কলিকাতায় ছাত্রসমাজের তখন নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না। সংস্কৃত কলেজের পশ্চিম দিকের একটি ঘরে তখন হিন্দুস্কুলের একটি গ্যালারি ছিল। ছাত্রসভার প্রথম সভা এইখানেই হয়। এ্যাসোসিয়েসনের পরবর্তী সাধারণসভার অধিবেশনগুলিও এইখানে হোত। তখনকার দিনে হিন্দুস্কুলের এই হলেই যতসব বড় বড় সভার অধিবেশন হোত। এইখানেই রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'একাল ও সেকাল' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। আবার

এখানেই রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রথম প্রস্তাব পঠিত হয়েছিল। এখানেই সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজের নিকট তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Rise of the Sikh Power in India' বা ভারতে শিখশক্তির অভ্যুত্থান। স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: "এমন বক্তৃতা বাঙালী আর কখনো ইতিপূর্বে শুনে নাই। যেমন বিষয়, তেমনই সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদিনী ভাষা। সেদিন সন্ধ্যার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর ঘন ঘন করতালিধ্বনিতে গোলদীঘির চারিদিকে যেন একটা প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের অলোকসামান্য বাগ্‌বিভূতির আশ্রয়ে গুরুগোবিন্দের সময় থেকে শিখজাতির জাগরণের ইতিহাস অভিব্যক্ত হইয়া কলিকাতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীর অন্তরে এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বদেশ-প্রীতি জাগাইয়াছিল।"

পরবর্তীকালের বহু ঝড়ের সংকেত বহন করে এনেছিল সেদিনের সন্ধ্যার সেই ঝড়। আগামীদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা বিরাট শক্তির উদ্বোধনই আমরা লক্ষ্য করি এই সংকেতের মধ্যে। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন: "সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের নূতন স্বদেশাভিমান প্রাচীনের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তারপর রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসের বীরকীর্তি গাঁথিয়া আমাদের নূতন স্বদেশপ্রেমকে উদ্দীপিত করিলেন। তাহার পর হেমচন্দ্র আকারে-ইঙ্গিতে বর্তমান হীনতার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া অন্যদিকে আমাদের এই নূতন স্বদেশপ্রীতিকে জাগাইলেন। কিন্তু ইহাদের কেহই খোলাখুলিভাবে প্রামাণ্য ইতিহাসের ভিত্তির উপরে দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। এ কাজটা সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে আরম্ভ করেন এবং শিখ খালসার উৎপত্তি ও অভ্যুত্থানের কাহিনী বিবৃত করিয়া ভারতের ক্ষাত্রবীর্য যে ইদানীংকালেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে এই সিদ্ধান্ত আমাদের মধ্যে প্রচার করেন।"

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের এই প্রথম বক্তৃতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অন্তরে একটা অভূতপূর্ব ভাবের বন্যা এনে দিয়েছিল। এমন অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে এর আগে আর কখনো দেখা দেয়নি। তার কারণ, এর আগে ইংরাজীনবীশ বাঙালী রাষ্ট্রীয়

বিষয়ে এমন বক্তৃতা কখনো শোনেনি। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরু যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শিখ ইতিহাসের প্রাণোন্মাদিনী স্বাধীনতার সংগ্রামের সংবাদ সেদিন আমাদের কাছে অজানা ছিল। এমন অবস্থায় এই জিনিস আমাদের কাছে সর্বপ্রথম উপস্থিত করে (রবীন্দ্রনাথের "শিখের বলিদান" কবিতাটি এর অনেক পরে রচিত হয়) তিনি যে কতখানি রাজনৈতিক বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে আরো একটু আলোচনা করা দরকার। তা নইলে আমরা বুঝতে পারব না কি করে সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাটি বাঙালীর জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয় আর কেনই বা তাঁর স্বাজাত্যাভিমান সেদিন থেকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লেথব্রিজের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসখানির মাধ্যমে শিখের সঙ্গে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির সংঘর্ষের কথা আমাদের জানা ছিল; কিন্তু মুষ্টিমেয় শিখসেনা কিভাবে ভারতবিজয়ী ইংরেজকে পরাস্ত করেছিল, শিখের ইতিহাসে সেইটাই ছিল আসল কথা। পঞ্চনদের তীরে গুরু তেগবাহাদুর ও গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে নবীন শিখের এই যে অভ্যুত্থান, এর অন্তরালে কতবড় একটা স্বজাতি-বাৎসল্যের প্রতিষ্ঠা ছিল, 'এ কথা লেথব্রিজ বোধ হয় জানতেন না, অথবা জানলেও আমাদিগকে বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নি। আর আধুনিককালে শিখ-ইংরেজে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার কথা বলতে গিয়ে উক্ত লেখক কখনো ইংরেজের পরাভব স্বীকার করেননি। শাসকজাতি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর মনে যাতে স্বাধীনতার স্পৃহা না জাগতে পারে তার জন্য কতদূর সচেতন ছিলেন, লেথব্রিজের এই পাঠ্যপুস্তকখানি ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত। সুরেন্দ্রনাথ কি করলেন? তিনি শিখশক্তির অভ্যুদয়ের কাহিনীর একটা নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। সত্যদর্শী ও সত্যবক্তা ঐতিহাসিক হিসাবে ইংরেজদের মধ্যে ম্যালকমের নাম শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ এই ম্যালকমের লেখা *Rise of the Sikh Power in India* গ্রন্থখানি যত্নের সঙ্গে পাঠ করে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং তারপর ছাত্রসভার প্রথম অধিবেশনে শিখ ইতিহাসের স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌বৈভবের সঙ্গে বাঙালীকে শোনালেন। ঝড় এইজন্যই উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের একটি অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "তাঁহার শিখের ইতিহাসের বক্তৃতাতে আমরা প্রথম দেখিয়াছিলাম যে, য়ুরোপের স্বদেশভক্তি আমাদের দেশেও ফুটিয়াছিল। ঐ দেশধর্ম বা দেশচর্যা বা Patriotism য়ুরোপের একচেটিয়া নহে। ভারতবর্ষের লোকেও অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংহত প্রজাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জনশক্তির হাতে এদেশেও একতন্ত্রী রাজশক্তি পরাভূত হইয়াছে।" এই সংবাদই তিনি তাঁর স্বজাতির গোচরে এনেছিলেন সেদিন। তাঁর শিক্ষা কেবল আধুনিক ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাস থেকেও তিনি বহুতর উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের এই নূতন মাতৃপূজার যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। প্রায় শতবর্ষপুর্বে, এ যে কী অসাধ্যসাধন ছিল তা আজ আমরা সহজে অনুমান করতে পারব না। আসলে শিখের ইতিহাসকে উপলক্ষ করে রাষ্ট্রগুরুর বৈপ্লবিক চিন্তা অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, "রাজশক্তির প্রতিকূলে একটা ভাব না জাগিলে প্রজাশক্তি কখনো আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আকুল হইয়া উঠে না।" তাঁর বক্তৃতা আমাদের মধ্যে সেদিন এই ভাবটাই জাগিযে দিয়েছিল।

ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল শ্রীচৈতন্য। ভবানী-পুরের লণ্ডন মিশন স্কুলের হলে তিনি এই বক্তৃতা দেন। এটিও তাঁর প্রথম জীবনের বহু বক্তৃতার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা। এমন কি পরবর্তীকালে তাঁর যে কোনো বক্তৃতার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসঙ্গের উল্লেখ অনিবার্য ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের এই যুগবিপ্লবীর প্রতি রামমোহনের দৃষ্টি কেন যে নিবদ্ধ হয়নি, সেটা একটা বিস্ময়ের বিষয়। সুরেন্দ্রনাথ মহাপ্রভুর জীবনের একটা নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের কিম্বা মহাপ্রভুর ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বা বিবৃতি ছিল না। ছিল কেবল তাঁর বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কারের কথা। তান্ত্রিকপ্রধান বাংলার হিন্দু-সমাজে চৈতন্যদেব কিভাবে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে হরিনাম বিলিয়ে এক নূতন ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং প্রাচীন জাতিবর্ণের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে একটা নূতন

সমাজবিধানের প্রতিষ্ঠা করেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় সে সকল কথাই বলেছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনার তত্ত্বের সঙ্গে আমরা এতকাল কম-বেশি পরিচিত ছিলাম; কিন্তু চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে যে একটা অসাধারণ স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা আছে, এটা আমরা তখনো পর্যন্ত চিন্তা করিনি। ধর্ম ও সমাজশাসনের শৃঙ্খলে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার হিন্দুসমাজ জড়বৎ অচল হয়ে পড়েছিল। রঘুনন্দন এই অচলায়তনের ভিত্তিকে ভাঙেন নি—ভাঙবার কথা চিন্তাও করেন নি। এই সমাজবন্ধন ভাঙবার জন্য একটা বিরাট প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। চৈতন্যদেবই সেই প্রতিভা। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে হরিনাম প্রচার—এ সমাজবিপ্লব ছাড়া আর কী? বাঙালীর সমাজজীবনে এই সিংহবীর্য পুরুষ সেদিন কী তরঙ্গই না তুলেছিলেন। এদেশে সামাজিক বিপ্লবের তিনিই তো পথিকৃৎ। সে বিপ্লবের পরিণতি? ব্রাহ্মণদের গুরুগিরির ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার নষ্ট হোল। সত্য কথা বলতে কি, ফরাসী বিপ্লবের বহু আগে চৈতন্যদেবই পৃথিবীতে সাম্যমৈত্রী এবং স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন। বিশ্বের পটভূমিকায় এই বিরাট অভ্যুদয়ের কাহিনী আজো রচিত হয়নি।

সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর সামনে চৈতন্যদেবের একটি নূতন রূপ তুলে ধরলেন—ব্যাখ্যা করলেন তাঁর সমাজবিপ্লবের দিকটা। কেশবচন্দ্র বাংলার বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ভক্তিরসের সন্ধান করেছিলেন; আর সুরেন্দ্রনাথ মহাপ্রভুর সামাজিক সংস্কারের কথাই বিশেষভাবে আমাদের বলেছিলেন। বলেছিলেন, স্বাধীনতা ও মানবতার নামে সমাজসংস্কার এবং সমাজের শাসনবন্ধনকে ছেদন করবার চেষ্টা কেবল য়ুরোপেই হয়নি, আধুনিক যুগে আমাদের এই বাংলা দেশেও একটা প্রবল সমাজসংস্কার ও সামাজিক বিপ্লবের তরঙ্গ ছুটেছিল। পঞ্চনদের তীরে ক্ষাত্রবীর্যের জাগরণ, ভাগীরথীর কূলে কূলে সমাজবিপ্লবের উদ্বেলিত বন্যা, ইতিহাসের গর্ভে কী স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল, সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠকে আশ্রয় করে তারই অভিনব বার্তা আমরা সেদিন প্রথম শুনেছিলাম। ঝড় এই কারণেই উঠেছিল।

বিপিনচন্দ্র এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "এই দুইটি বক্তৃতা দ্বারা

সুরেন্দ্রনাথ আমাদের নকলনবিশী দেশভক্তিকে বৈদেশিক ইতিহাসের কল্পিত প্রভাব ও প্রেরণা থেকে মুক্ত করে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। এ বড় কম কথা নহে।" এইভাবে পাঞ্জাবের ও বাংলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে দেশচর্যার নূতন বাণী শুনিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি যে দেশভক্তির ভাবমাত্র প্রচার কবেছিলেন, তিনি তাকে ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাবলীর উপরে গড়ে তুলেছিলেন। এইভাবেই তিনি আমাদের নিজেদের দেশের ইতিহাসের সাহায্যে আমাদের মধ্যে একটা নূতন স্বাজাত্যাভিমান এবং জাতীয় স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন। আর ধর্মের প্রেরণা দ্বারাই যে এই নূতন আদর্শের সফলতালাভের চেষ্টা করতে হবে, নিজের বুদ্ধি এবং বিবেকের শুদ্ধতা এবং স্বাধীনতার উপরেই যে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে গডে তুলতে হবে, এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। স্বাধীন ভারতের বর্তমান বাজনীতিতে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ বেশি করে দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শহরের ছাত্রসমাজে সুরেন্দ্রনাথের আধিপত্য স্থাপনের পুর্বে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ (কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যার-এ্যাট-ল) বলবীর্য, সৌজন্যে ও বন্ধুবাৎসল্যে বাংলার ছাত্রহৃদয় অধিকার করে জ্যেষ্ঠের কার্যপথ কতকটা সুগম করে দিয়েছিলেন। উত্তরকালে স্যাণ্ডহার্স্ট কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে দেশের সামরিক শিক্ষায় সহায়তা করে তিনি দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। অগ্রজের কণ্ঠোচ্চারিত বজ্রবাণী আর অনুজের শারীরিক বলবীর্য—বাংলার নবযুগের উদ্বোধনে এই দুইটি জিনিসই যুগপৎ সক্রিয় ছিল।

ছাত্রসভার সঙ্গে গোড়ায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ বিশ্বাস, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশঙ্কর গুহ, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালের বহু জননায়কেরই বক্তৃতার 'হাতে খড়ি' এই ছাত্রসভার মঞ্চেই হয়েছিল। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর একটি বিবরণের মধ্যে আমরা ছাত্রসভার আদিপর্বের একটি সুন্দর চিত্র পাই। তিনি

লিখেছেন: "সভা স্থাপনাবধি আমি সহকারী সম্পাদকপদে ব্রতী ছিলাম, পরে সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিও হইয়াছিলাম। স্বহস্তে হ্যাণ্ডবিল লিখিয়া ও বিতরণ করিয়া, বাজার হইতে মাটির ক'লকে ও মোমবাতি খরিদ করিয়া সভা আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া, চেয়ার, বেঞ্চ সংগ্রহ, সাজানো, ঝাড়া-পোঁছা পর্যন্ত করিয়া তখন সভার কাজ চালাইতে হইত; বক্তা সংগ্রহ, শ্রোতা সংগ্রহ সবই করিতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম ও সাঁতার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইত।—দপ্তরী পাড়ায় নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াইতাম, দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তুলিতাম। ছোট বড় সকল কাজই সুরেন্দ্রনাথকে অগ্রণী করিয়া হইত।

"হিন্দুস্কুলের থিয়েটার হলে আমাদের সভা হইত, পুরাতন এলবার্ট হলেও হইত। কিন্তু এলবার্ট হলে গ্যাসের দাম দিয়া উঠা দায় হইত বলিয়া হিন্দুস্কুল থিয়েটার হলে কলকে ও বাতির সাহায্যে সভার কাজ চলিত। সেই অর্ধান্ধকার সভায় দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্রবাবু গলা কাঁপাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন: 'Who shall be our Matzinies and Garibaldies ?"—'কে আমাদের মধ্যে ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডি হইবে?' আর ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে সমস্বরে উত্তর হইত: 'All, all'—'আমরা সবাই'। তদপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে গ্যালারির সর্বোচ্চ বেঞ্চের উপর হইতে জিতেন বাঁড়ুয্যের অব্যর্থ সন্ধানে কাঁইবীচি সেইসব ভাবী ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির মস্তকে বর্ষিত হইত। জিতেন্দ্রনাথ কাজ বুঝিতেন, কথা বুঝিতেন না। বুঝি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এই কাঁইবীচি বর্ষণ হইত। তাহাতে কোনো পক্ষের বিরক্তি উৎপাদন হইত না।"

নবযুগের বাংলায় রাষ্ট্রীয় সাধনার যে আয়োজন সেদিন হয়েছিল তার মধ্যে জৌলুষ হয়ত ছিল না, জাঁকজমক হয়ত ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে ছিল প্রাণের সাড়া, ছিল আকাঙ্ক্ষার বিশুদ্ধতা আর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটা আন্তরিক আগ্রহ। মাতৃপূজার এই আয়োজন-উপচার সামান্য হোলেও নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসে তা অসামান্যই ছিল। ছাত্রসভার মঞ্চে ঝড় এইজন্যেই উঠেছিল। আর সে ঝড় উঠেছিল একজনের কণ্ঠকে আশ্রয় করেই। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

॥ ছয় ॥

অতঃপর ইতিহাসের স্রোত দুর্বার বেগে প্রবাহিত হোয়ে চললো এবং সে প্রবাহপথে নানা আবর্ত রচিত হোতে থাকে। 'ভারত-সভা' তারই একটি। সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার ভিত্তি ছিল ইতিহাসবোধ। সেইজন্যই দেখতে পাই যে তাঁর অন্তরে যে দেশপ্রীতি জেগেছিল তা ছিল বেগবান ও কর্মপ্রেরণাময়। তার গতি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। দেশের চিত্ত থেকে সর্বভারতীয়তা-বোধ লোপ পেয়েছিল, তাকেই তিনি জাগিয়ে দিলেন। এই জননায়কের মনে ভারতবোধের সক্রিয় প্রেরণা যদি না থাকত, তাহলে তাঁর পক্ষে ঐ অসাধ্য-সাধন কিছুতেই সম্ভবপর হোত না। ভারত-সভার মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথের ভারতবোধ কিভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করব।

ছাত্র-সভা গঠন ও ছাত্রদের মধ্যে নূতন ভাব ও নূতন জীবন জাগিয়ে তুলবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ আর একটি কাজে হাত দিয়েছিলেন। সেটি হোল Indian Association বা 'ভারত-সভা' স্থাপন। তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক কার্যকলাপের শুরু এখান থেকেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জনমত প্রতিফলিত হয় এমন কোনো সংগঠন তখন দেশে ছিল না। অবশ্য কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান তখন এদেশে ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা জমিদারদেরই সভা ছিল এবং তাঁদের স্বার্থরক্ষাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জনসাধারণের স্থান সেখানে ছিল না, কিম্বা তাদের স্বার্থের জন্য লোকমত গঠন বা সাধারণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল না। তখন এমন একটি পৃথক রাজনীতিক সভা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সুরেন্দ্রনাথ চিন্তা করলেন যা প্রধানত গণতন্ত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে। তাঁর এই চিন্তারই পরিণতি ভারত-সভা। এক বছর ধরে উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহাই ভারত-সভার সবটুকু ইতিহাস নয়।

ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিপিনচন্দ্র পাল এইভাবে বিবৃত করেছেন : "এখনও সেদিনের কথা মনে আছে, যেদিন ভারত-সভার জন্ম হয়। কলিকাতার শিক্ষিত যুবকগুলির মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, কি করিয়া তাহা রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে গড়িয়া উঠে, ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তরবারি ধরিয়া আমরা স্বাধীন হইব, এ কল্পনাটা তখন জাগে নাই। ক্ষাত্রবীর্যের উপরে দেশের স্বাধীনতা যে একান্তভাবে নির্ভর করে, ইহা তখনও শিক্ষিত বাঙালী একান্ত-ভাবে অনুভব করে নাই। তখন আমাদের একটা রেষারেষি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এদেশের ইংরাজ অধিবাসীদিগের সঙ্গে, ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে তখনও আমাদের তেমন বিরোধ জাগে নাই। আমরা আইনের গণ্ডীর ভিতরে আসিয়া কেবল আমাদের অভাব-অভিযোগের আন্দোলন-আলোচনা করিয়াই ইংরাজ পার্লামেণ্টের ধর্মবুদ্ধিকে জাগাইয়া ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করিব। ইহাই আমাদের সেকালের রাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি ছিল। সুতরাং দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাগাইবার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে আপনার শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করেন। বিলাতে যেমন লোকমতের বা বহুমতের প্রভাবে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া থাকে, ব্রিটিশ-ভারতেও সেইরূপ হইবে। সকলেই সেকালে এরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। ইংরাজীতে ইহাকেই Constitutional agitation কহে। এইপথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল সমিতির বেড়াজালে সমগ্র দেশকে ঘিরিতে হইবে। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনের প্রথম পর্বের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

"এই লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হইয়াই তিনি সর্বপ্রথমে ভারত-সভার বা Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনুষ্ঠানে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ—ব্রাহ্ম-সমাজের এই সকল চিন্তা ও কর্মনায়করা সুরেন্দ্রনাথের এই নূতন রাষ্ট্রীয় কর্মে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কথাটা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা কখনই

ইহা ভাল করিয়া ধরিতে পারিবেন না যে কোন্ আদর্শের প্রেরণায় ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ একটা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াও বিগত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে একান্তভাবে আপনার অন্তরে বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। শাস্ত্রগুরু-বর্জিত আত্মপ্রত্যয়-প্রতিষ্ঠ ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও মহর্ষি একান্তভাবে এই আত্মপ্রত্যয়ের হাত ধরিয়া চলিলে শেষটা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইতে হয়, এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রামাণ্য ও প্রধান্যের উপরেই যে য়ুরোপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা Individualism-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, মহর্ষি এ কথাটা বড় করিয়া ধরেন নাই। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার যুবকশিষ্য ও সহধর্মীরা এই আদর্শের প্রেরণাতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। ক্রমে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব বাড়িয়া উঠিলে মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীনে-নবীনে একটি বিরোধ বাধিয়া উঠে। এই বিরোধের ফলে নবীন ব্রাহ্মের দল কেশব-চন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া দেবেন্দ্রনাথের দল হইতে ভাঙিয়া পড়েন। এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণাতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এখানেও আবার কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন সহকর্মীদের সঙ্গে আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, শিবনাথ প্রভৃতির একটা নূতন বিরোধ বাধে। কেশবচন্দ্র যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অথবা বিবেকের নামে দেবেন্দ্রনাথের নায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা এবং বিবেকের নামেই আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রভৃতি কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকগোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন।...আনন্দমোহন প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শে নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন এবং ইহা লইয়াই তাঁহাদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথমে বিরোধের সূত্রপাত হয়। অতঃপর বিরোধীদল নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ। এই নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধক ছিলেন। জীবনের সর্ববিভাগে এই স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি নূতন মনুষ্যত্বসাধন এবং সমাজজীবন ইঁহাদের ধর্ম ও কর্মজীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠে।

"যে বৎসর সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা করেন সেই বৎসরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বাহিরে নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা গভীর যোগ ছিল। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে এই সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আনন্দমোহন শিবনাথ প্রভৃতির নেতৃত্বাধীনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। এইজন্যই ইহারা এরূপ আন্তরিকতা সহকারে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। এই কথাটা না বুঝিলে বা ভাল করিয়া না ধরিলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কোন্ আদর্শের প্রেরণায় স্বদেশসেবায় আত্মসমর্পণ করেন, ইহা সুস্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না। আনন্দমোহন ভারত-সভার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদক এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ভুবনমোহন দাশ প্রভৃতি নূতন ব্রাহ্মসমাজের মুখ্যরা ভারত-সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত-সভার জন্মের ইতিহাসে কোন্ মহান্ আদর্শের প্রেরণায় একদিকে সেকালের ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যদিকে এই নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দেশের চিন্তা, ভাব এবং কর্মকে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিল, ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

"ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার পূর্বে, সত্য কথা বলিতে গেলে, আমাদের মধ্যে কোন প্রকারের গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার এবং অধিকাংশের (Majority) মতামতের দ্বারা রাষ্ট্রের সকল প্রকার বিধিব্যবস্থা নির্ধারিত হইবে, ইহাই গণতন্ত্র শাসনের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। ধনি-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলে মিলিয়া অধিকাংশের অভিপ্রায়ানুযায়ী রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে। ইহাই গণতন্ত্র শাসনের আদর্শ। এই আদর্শ লইয়াই ভারত-সভার জন্ম হয়। ইহাই আমাদের প্রথম প্রকৃত জনসভা। ইহার পূর্বে,—বহুপূর্বে, কলিকাতার জমিদার সভার বা British Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সকলে এই সভার সভ্য হইতে পারিত না। বিশেষভাবে জমিদারদিগের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করাই এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য এই সভা প্রজাসাধারণের হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন। জমিদারদিগের বিশেষ স্বত্ব-স্বার্থ বজায় রাখিয়া যাহাতে সাধারণ প্রজামণ্ডলীর সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়, অথবা তাহাদের সাধারণ স্বত্ব-স্বাধীনতা যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে যথেষ্টই চেষ্টা করিতেন। ইহার যখন জন্ম হয়, তখন এই সকল শিক্ষিত জমিদার ব্যতীত প্রজার স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করে, এমন আর কেহ ছিল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাংলার রাষ্ট্রীয় কর্মের ইতিহাসে একটা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

"কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দ্বারা আমাদের নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ছিল না। তখন দেশে মধ্যবিত্ত অবস্থার বহুলোক নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত লোক একটা নূতন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের সম্মুখে যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র ছিল না। ইহারা জমিদার নন বলিয়া, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যোগ দিতে পারিতেন না। আর উক্ত সভার নির্ধারিত চাঁদা দেওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য না হোক, দুঃসাধ্য ছিল। এই সভার দ্বারা আমাদের এই নূতন অভাব মোচন হইতেছিল না। এইজন্য শিশিরকুমার ঘোষ একটা নূতন রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ইহার নাম ছিল ইণ্ডিয়ান লীগ। স্যর রিচার্ড টেম্পল যখন বাংলার সুবাদার, সে সময়ে এই লীগের জন্ম হয়। কিন্তু যে কারণেই হউক, দেশের শিক্ষিত সাধারণ এই লীগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যেমন বড় বড় জমিদারদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ইণ্ডিয়ান লীগও সেইরূপ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। উহা সর্বসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এইজন্য আর একটি রাষ্ট্রীয় সভার বা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষিত সাধারণ একরূপ উন্মুখ হইয়াছিলেন, এ কথা বলা যায়।

"কলেজ ষ্ট্রীটে যেখানে এলবার্ট ইনষ্টিট্যুট, সেখানে তখন একটি হল ছিল; সেই হলে সাধারণ সভা-সমিতি হইত। এখানে তখন একটি স্কুলও ছিল। এই স্কুলেরই একটা ঘরে নীচের তলায় ভারত সভার জন্ম হয়। এখনকার

হিসাবে সভাটা যে বড় হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সভাগৃহ এবং তাহার পাশের ঘরগুলি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হউক, এই প্রস্তাব যখন উপস্থিত হয়, ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠে। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আপত্তি তুলেন। সুরেন্দ্রনাথের মতই প্রায় কালীচরণেরও অসাধারণ বাগ্-বিভূতি ছিল। কোন কোন দিক দিয়া কালীচরণের বাগ্মিতা সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যেভাবে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিতে পারিতেন, কালীচরণ ঠিক ততটা পারিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ demagogyতে সিদ্ধ। কালীচরণ খ্রীষ্টান ছিলেন; সম্ভবত এই কারণে তাঁহার বাগ্মিতা স্বদেশবাসীর উপর তাঁহার গুণের উপযোগী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ঐ দিনে বিশেষতঃ কালীচরণ লীগের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া শিক্ষিত লোকমতের প্রতিকূলতাই করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার বক্তৃতার প্রভাবে এমন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বুঝি বা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া উঠে।

"সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন না। সেদিন তাঁহার প্রথম পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। জীবনের আশা একরূপ ছিল না। কিন্তু কালীচরণের প্রতিবাদে সভার উদ্দেশ্য যখন বিফল হইবার আশঙ্কা হইল, তখন তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক ছুটিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন তালতলায় পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিতেন। সভার দূত যখন উপস্থিত হইল, তাহার অল্পক্ষণ পুর্বেই বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ শিশুর মৃতদেহের নিকটে ধূল্যবলুণ্ঠিত—জীবনের প্রথম শোকের তীব্র আঘাতে ছটফট করিতেছেন। কিন্তু যখন কর্তব্যের ডাক পৌঁছিল, তিনি না আসিলে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহা শুনিলেন, তখন অমনি গা ঝাড়িয়া উঠিয়া মৃতশিশু এবং তাহার শোকাকুলা জননীকে ছাড়িয়া সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রশোকাতুর জনকের এই দেশসেবা-নিষ্ঠা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার পরে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা আর আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। এই ঘটনায় দেশের শিক্ষিত লোক দেখিল যে, সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশ এবং স্বজাতির সেবা তাঁহার পুত্র হইতে প্রিয়। তাঁহার পুর্বে কোন বাঙালী তাহার দেশকে এবং দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে এতটা ভালবাসে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়

নাই। তাঁহার এই স্বদেশপ্রেমের উপরেই তাঁহার প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্র-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।"*

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হোল, কিন্তু ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসাবে এই বিবরণের যে একটি গুরুত্ব আছে, তা বিবেচনা করেই আমরা এই মূল্যবান রচনাটি এখানে সন্নিবেশিত করলাম। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এটি লিখেছিলেন। কি অবস্থার মধ্যে ভারত-সভার জন্ম হয় এবং এর পিছনে কোন্ আদর্শ সক্রিয় ছিল তার বিশ্লেষণ বিপিনচন্দ্র অপেক্ষা আর কেউ দিতে পারতেন না। সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রকে বুঝবার পক্ষেও এই রচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। "স্বদেশ এবং স্বজাতির সেবা তাঁহার পুত্র হইতে প্রিয়", সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আজ যখন আমরা কল্পনা করি যে, শিশুপুত্রের মৃত্যুতে শোককাতর এক তরুণ (তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর মাত্র) কিভাবে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে, মৃতপুত্রকে তার মায়ের কোলে রেখে ভারত-সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন আমরা বুঝতে পারি কী ধাতু দিয়ে তৈরি ছিল রাষ্ট্রগুরুর চরিত্র।

পুত্রশোকে আকুল না হোয়ে বীরের মত তিনি পুত্রের মৃত্যুর দিন বৈকালেই তাঁর পরিকল্পিত সভা স্থাপন করলেন। এই ঘটনার আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ; তিনি স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি লিখেছেন : "ইহাতে আমাদের মন বিস্ময়ে, ভক্তিতে ও উত্তমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দেবপ্রসাদের পিতা ও সুরেন্দ্রনাথের পিতা উভয়েই সহকর্মী ও পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সর্বাধিকারী পরিবারের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ভারত-সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আরেকজন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : "যখন ব্রাহ্মসমাজে কেশববাবুকে লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু,

* মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর-এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিনজনে কথাবার্তার পর স্থির হইল যে অপরাপর দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহনবাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। মনমোহন ঘোষের বাড়িতে এই পরামর্শ চলিল। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহনবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন এতদ্বারা দেশের একটি মহা অভাব দূর হইবে, আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্‌যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, 'যা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?'...তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। একটা সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আন্দমোহনবাবুর মুখে শুনিলাম, শিশিরবাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'এই সভার সম্পাদক হবেন কে?' মনমোহনবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, আনন্দমোহনবাবু সে-বিষয়ে মনোযোগই দেন না। তাঁহারা বলেন, সে পরে স্থির হবে, যাঁকে সকলে মনোনীত করিবেন, তিনিই হবেন। 'ভারত-সভা' স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে

জানা গেল যে, সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ সভা স্থাপিত হইতেছে। আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু আমরা ভারত-সভা স্থাপনের সংকল্প ত্যাগ করিলাম না। ইণ্ডিয়ান-লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দমোহন বাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার কথা এই মনে আছে যে সেদিন সুরেনবাবুর একটি পুত্র সন্তান মারা যায়, তিনি তৎসত্ত্বেও আসিয়া সভাস্থাপনে সাহায্য করিলেন। আনন্দমোহনবাবু সম্পাদক, সুরেশবাবু সহ-সম্পাদক আমরা কয়েকজনে কমিটির সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভা বসিল। আমরা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম।...বলিতে কি ভারত-সভা ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। শিশিরবাবুর লীগ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, অতি অল্পকালের মধ্যেই উহা উঠিয়া গিয়াছিল। তদবধি শিশিরবাবুদের প্রতি আমার আস্থা চলিয়া গেল।*"

বিদ্যাসাগর বরাবরই শিশিরকুমার ঘোষের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই বিরূপতার কারণ তিনিই উদ্যোগী হয়ে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরে ঢাকার জনৈক ব্যক্তিকে দিয়ে 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে একখানি প্যারডি লিখিয়ে নিজ অর্থব্যয়ে প্রকাশ করেন। একজন মহৎ কবির প্রতিভার প্রতি এতবড় অসম্মান প্রদর্শন বিদ্যাসাগর ক্ষমা করেন নি। তদবধি তিনি এই প্রতিক্রিয়াশীল লোকটির নামও সহ্য করতে পারতেন না—শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং এই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ছাত্রসভার পরই "The next important step in the history of our national awakening was the Indian Association which functioned for many years as the voice and organ of the

---

* আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী

middle class aspiration."* আমাদের জাতীয় জাগরণের দ্বিতীয়-সোপান হিসাবে এই ভারত-সভার অভ্যুদয়ের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে বৈকি এবং ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই সেটা অবগত আছেন। রামমোহনের মৃত্যুর ঠিক বিয়াল্লিশ বছর পরে সুরেন্দ্রনাথ দেশসেবাব্রত গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি সে যুগে এই নূতন সাধনা অবলম্বন করেন, বাংলা দেশে সে ছিল একটা অভিনব স্বাধীনতার যুগ। ক্ষেত্র উর্বর ছিল, বাকী ছিল শুধু বীজ বপনের। এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করবার নয় যে, ব্রাহ্মআন্দোলন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে একটা নূতন স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল তখন। রামমোহনের মৃত্যু ও সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের সূচনা—এই দুইটি ঘটনার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান ছিল, সেই সময়ের মধ্যেই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উচ্চ ও উদার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ ফুটে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পূর্বেই ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের অনুকরণে নব্যশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে একটা অভিনব স্বাজাত্যাভিমান এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শকে আশ্রয় করেই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার সংকল্প নিয়ে যুবক সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর এই কর্মক্ষেত্রের প্রথম সোপান ছিল ছাত্রসভা, আর ভারতসভা দ্বিতীয় সোপান।

পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় এসে বহু দিন পর্যন্ত এখানকার সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েছিলেন। সামাজিক হিসাবে একজন বিলাত ফেরৎ বলে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় তো ছিলেনই; এর উপরে সিভিল সার্ভিস থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হবার ফলে তিনি যেন কর্মক্ষেত্রে অনেকটা অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছিলেন—এমন ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন খুব কম ব্যক্তিকেই হোতে হয়েছে। আনন্দমোহনকে তাই তাঁর পাশে প্রয়োজন হয়েছিল। তখনকার দিনে রাজনীতির যা কিছু চর্চা আমাদের দেশে হোত তার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, একথা আগেই বলেছি। এই প্রতিষ্ঠানটিই তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলেচনার অগ্রণী ছিল। কৃষ্ণদাস পাল,

* Growth of Nationalism in India : Mukherjee

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি তখন এই সভার প্রধান সভ্য ছিলেন। কোনো বিষয়ে দেশের লোকের মতামত জানতে হোলে ইংরেজ রাজসরকার এঁদেরকেই জিজ্ঞাসা করতেন। এঁরাও ইংরেজ আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে যথাসম্ভব মিলে-মিশে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের হিতসাধনেরও চেষ্টা করতেন। সুতরাং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে সুরেন্দ্রনাথের ললাটে কলঙ্কের দাগ এঁকে দিয়ে রাজকর্ম থেকে বরখাস্ত করেছিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার অভিজাত কর্তৃপক্ষীয়েরা যে সর্বপ্রকারের দেশহিতকর্মে সেই সুরেন্দ্রনাথকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখবেন, এ কিছুই বিচিত্র নয়। যাঁরা দেশপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির প্রতিকূলে জনসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার নামে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, সকল দেশেই সেই রাজশক্তির বশম্বদগণ তাঁদেরকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ইহা স্বাভাবিক। আবার সকল দেশেই এই সকল স্বাধীনতার পুরোহিতগণ সমাজের নগণ্য জনমণ্ডলীর সংহত শক্তির আশ্রয়ে নিজেদের শক্তিকে গড়ে তোলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই কাজই করেছিলেন আনন্দমোহনের সহায়তায়। কথিত আছে, আনন্দমোহনই সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, শুধু agitation নয়, একটা organisation-ও দরকার। কথাটা তাঁর মনে লেগেছিল।

জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবে, প্রধানত এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত-সভা স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তারা এর জন্ম সুনজরে দেখেননি, এমন কি তাঁরা সুরেন্দ্রনাথকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলেন। যাই হোক, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের লোকহিতৈষণা, উৎসাহ, কর্মিষ্ঠতা ও সাহসের গুণে ভারত-সভা কালক্রমে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তিনি চল্লিশ বছরের বেশি এর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ববৎসরে মাত্র তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। কর্মী পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ, কাজ বুঝতেন, পদগৌরবের জন্য লালায়িত ছিলেন না।

কিন্তু ভারত-সভার জন্মের প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণ ও প্রয়োজনটা এখনো সম্পূর্ণ বলা হয়নি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের একরূপ অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কেশবচন্দ্র সেন বাংলায় তথা ভারতে স্বাধীনতার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা ও

পুরোহিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরে একটা নূতন স্বাধীনতার প্রেরণা এসেছিল। কিন্তু চিন্তায় এবং ভাবে, সিদ্ধান্তে এবং আদর্শে ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ মেনে নিলেও খুব কম লোকই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এই অভিনব স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করতে পারতেন। হিন্দু সমাজের শাসন তখন অত্যন্ত কঠোর ছিল। প্রকাশ্যে পাঁউরুটি-বিস্কুট খেলেও লোক সমাজচ্যুত হোত। সুতরাং সকলের পক্ষে এই কঠোর শাসনকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। অবস্থাটা তখন এই দাঁড়িয়েছিল যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একদিকে, আর সমাজশাসন অন্যদিকে। এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়ে অনেকেই ভাবের সঙ্গে কাজকে এক করতে না পেরে আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলেন এবং পরিণামে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী হয়ে ওঠেন। এই পরিবেশেই সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজালেন। "নাদিলা দুন্দুভি দামামা ঘোর রবে"—সত্যই এইরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল সেদিন নবজাত এই ভারত-সভাকে কেন্দ্র করে। পট পরিবর্তন হোল। সকলেই এই নিষ্কণ্টক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সংগ্রামে সমাজশাসনের ভয় ছিল না; পরিবার-পরিজনের স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ও ছিল না। নিজেদের স্বাভাবিক দায়াধিকার থেকে বঞ্চিত হোতে হোত না। শীঘ্রই এই স্বাধীনতার আন্দোলন দেশ ছেয়ে ফেললো। ইতিহাসের বুকে উঠল নূতন তরঙ্গ। বাঙালী সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, সে তরঙ্গ-শীর্ষে সমুন্নত মস্তকে আর সরল মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দৃপ্তভঙ্গিতে এক নবীন যুবক।

তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন: "যেদিন ভারত-সভা স্থাপিত হয়, সেইদিন হইতে বাংলা তথা ভারতের জাতীয়ভাবের সুদৃঢ় ভিত্তি সুরেন্দ্রনাথ স্বহস্তে স্থাপিত করিয়াছেন।" দেশসেবা, দেশপ্রেম ও দেশভক্তির মূলমন্ত্র আমাদের যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় নাম চারটি, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ আর আনন্দমোহন। আবার এঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশসেবার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৈধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এমন একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, যার তুল্য আন্দোলন সেদিন আর দেখা যায় না। এখন থেকে

সুরেন্দ্রনাথের কর্মের রথ বিরামবিহীনভাবে ধাবিত হোতে লাগলো। কী তাঁর কর্মের উৎসাহ আর কী তাঁর জলন্ত স্বদেশপ্রেম। মাতৃভূমি-প্রেমের তীব্র মমত্ববোধের সঙ্গে মিশেছিল আত্মনিবেদনের ঐকান্তিক সাধনা। আলোড়নে ও আন্দোলনে সেদিন তিনি সচকিত করে তুলেছিলেন সমস্ত দেশ; তাঁর কণ্ঠে ও লেখনী-মুখে ঝঙ্কৃত হোল মাতৃমন্ত্রের ঋক্—"Moral re-generation is the precursor of political re-generation"—নৈতিক পুনরুত্থানের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণ সম্ভব। দেশাত্মবোধক বীজমন্ত্রের শ্রেষ্ঠগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত ব্যাকুল, উগ্রতপস্বী সুরেন্দ্রনাথ, ভারতের বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকগণের একত্রীকরণে সর্বপ্রধান নায়ক সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভা স্থাপন করে, তাঁর স্বদেশবাসীর অন্তরে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধনে সেদিন নিজেকে কি অক্লান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন তা আজ আমরা সহজে ধারণা করতে পারব না। "I owe my allegiance to God and to my people"—ভারত-সভার মঞ্চ থেকে ঘোষিত তাঁর এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যেই আভাসিত সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা।

ভারত-সভা স্থাপিত হোল। কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ড্রাগিস্ট হলের (এখন এটি নেই) পাশে কিছুদিন ভারত-সভার অফিস অবস্থিত ছিল; পরে পশ্চিমের ফুটপাতে অপর একটি বাড়িতেও কিছুদিন ছিল। এই বাড়ির ঘর ও সাজ-সজ্জার দৈন্য উপলক্ষ করেই ব্যঙ্গরস-রসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।" জনসাধারণকে অহ্বান করে জনসাধারণেরই স্বার্থের জন্য লোকমত-গঠন বা সাধারণভাবে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালন—মুখ্যত এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত-সভার আবির্ভাব যে সেদিন ইতিহাসের এক নূতন সংকেতকে বহন করে এনেছিল, পরবর্তীকালের ইতিহাস তা অভ্রান্তভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "The Indian Association supplied a real need. It soon focussed the public spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of the educated community." সুরেন্দ্রনাথ নব-প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির সভাপতি হন নি কেন? এর উত্তর তিনি নিজেই

দিয়েছেন: "In view of my removal from the Government service, I kept myself in the background, but I worked zealously for the Association, knowing no higher pleasure in duty, and bent upon realising through this institution the great ideals which even at that early period had taken definite possession of my mind." এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরও আমরা কি বলব যে, সুরেন্দ্রনাথ আদর্শবাদী ছিলেন না? একটা মহৎ আদর্শের প্রেরণায় তিনি যদি উদ্বুদ্ধ না হোতেন, তাহলে কি তাঁর পক্ষে এইরকম একটা ভারতব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হোত?

কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন: "জনশক্তি জাগাইবার চেষ্টা সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মিগণই প্রথম করিয়াছেন। ভারত-সভা স্থাপনে শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ভারতসভা প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রজাশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য নদীয়া, হাওড়া ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ প্রভৃতি নানান জেলায় সুরেন্দ্রনাথ বিরাট সভা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সভায় ৪।৫ হাজার হইতে ২৫।৩০ হাজার লোক উপস্থিত থাকিত।" যেসব বিবিধ আন্দোলনে ভারত-সভা প্রবৃত্ত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা: (১) খোলাভাঁটি নিবারণ, (২) লবণের মাশুল হ্রাস, (৩) জুরির বিচার প্রবর্তন, (৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপন, (৫) উচ্চ রাজকর্মে ভারতবাসীর নিয়োগ এবং (৬) আদালতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের বিচার-বৈষম্য নিবারণ। এর প্রত্যেক বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার জন্য মফঃস্বলেই প্রবল আন্দোলন করতে হয়েছিল। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, সেকালে রাজনীতি চর্চা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বুঝেছিলেন, জনসাধারণের উত্থান ব্যতীত রাজনীতিচর্চা বৃথা। সেইজন্য উভয়ে মিলিত হোয়ে ভারত-সভা স্থাপন করেন। ছাত্রদের মধ্যেও রাজনীতির কোনো চর্চা ছিল না। স্বদেশপ্রেম তাদের জ্ঞানের অগোচর ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বিদেশ থেকে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে-ছিলেন যে, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করতে না পারলে জন্মভূমির কোনোপ্রকার

বন্ধন ছিন্ন হবে না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক মহাজাতিতে পরিণত করে জন্মভূমির বন্ধনমোচন করাই এই দুজনের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যেরই পরিণতি ছাত্র-সভা ও ভারত-সভা।

ভারত-সভা শীঘ্রই বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হোয়ে উঠল। জনমত সেই প্রথম প্রতিফলিত হোতে আরম্ভ করল এবং এই সভাই তাদের সকল রাজনৈতিক কাজের কেন্দ্রস্থল হোয়ে উঠল। আনন্দমোহন যদিও সভার সভাপতি ছিলেন, সভার সর্বস্ব বলতে একজনই ছিলেন - তিনি সুরেন্দ্রনাথ। আর এর অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসাবে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগেই বলেছি, ভারত সভার মাধ্যমেই সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অভীষ্টসিদ্ধির পথ রচনা করতে লাগলেন অনন্যচিত্ত হোয়ে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনমত গঠন করবার কাজ এই সভাকে উপলক্ষ করেই তিনি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর চিন্তায় ও স্বপ্নে এখন শুধু একটি বিষয় ঃ ভারত-সভা। এরই মাধ্যমে তিনি প্রধানত তিনটি জিনিস করতে চেয়েছিলেন, যথা. (১) দেশের মধ্যে প্রবল জনমতের সৃষ্টি; (২) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী সকলেরই রাজনীতিক স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা এক ও অভিন্ন বলে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বিগণকে মহামিলনসূত্রে আবদ্ধ করা এবং (৩) হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব বৃদ্ধি ও জনগণকেও বিরাট জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা। সুরেন্দ্রনাথের সমগ্র রাজনৈতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি সংকল্পসাধনেরই ইতিহাস। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ জনসেবায় ব্রতী থাকবার পর সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "আমার জীবনের সংকল্প সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হয়নি বটে, কিন্তু উহা পরিপুর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবার আর যে বড় বেশি বিলম্ব নেই, এ বুঝে আমি তৃপ্তি অনুভব করছি।" অতঃপর আমরা তাঁর জীবনের সেই কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করব।

॥ সাত ॥

আধুনিক ভারতবর্ষে স্বদেশচেতনার জন্ম রাজা রামমোহন রায়ের মনোভূমিতে আর এর প্রতিষ্ঠাভূমি সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মে। সেই কর্মের উদ্বোধন করলেন সুরেন্দ্রনাথ।

ইতিহাসে এইটাই ছিল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা।

নব্য ইতালির স্বাধীনতা যজ্ঞের গুরু ম্যাট্‌সিনির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই মহাবিপ্লবী তখন বাংলার বিগ্রহস্বরূপ হোয়ে উঠেছেন। ম্যাটসিনির মতো সুরেন্দ্রনাথও যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা স্বদেশপ্রেমের বাণীপ্রচার করতেন ভারত-সভার মঞ্চ থেকে। পরাধীনতার বিলাপধ্বনি নয়, স্বাধীনতার জয়ধ্বনিই শোনা যেত তাঁর কণ্ঠে। ম্যাটসিনির মতোই রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র ভারতকে এক মহান্ জাতীয়তাবন্ধনে সংঘবদ্ধ করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ম্যাটসিনির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের তুলনা অনেকখানি সার্থক। সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ম্যাটসিনির জীবনচরিত ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। "ম্যাটসিনির অতুলনীয় দেশাত্মবোধ আত্মত্যাগ পরার্থপরতা ও মানবহিতৈষণা যাহা তিনি তাঁহার *Duties of Man* নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারই প্রতি বাঙালী যুবকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান আসিয়াছিল।" ম্যাটসিনির জীবনচরিতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর, সকলেই ঐ বই কিনিতে থাকে। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন: "বন্ধু-বান্ধবের বিবাহে ঐ গ্রন্থ উপঢৌকন দেওয়া তখন খুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে বুকের রক্ত দিয়া কেহ কেহ দেশসেবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।" বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় যোগ দিলাম।...আমি একটি সমিতির কথা জানি, যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বুক চিরে রক্ত বের করতেন ও সেই রক্তে অঙ্গীকার-পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"

বলেছি, সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনির মন্ত্রশিষ্য। এই বিপ্লবী চিন্তানায়কের রচনাবলী তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন এবং তাঁর ভাবধারা যুবক সুরেন্দ্রনাথের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। ম্যাটসিনির অনন্যসাধারণ স্বদেশপ্রেম, স্বদেশবাসীর মুক্তিচেষ্টায় বিপুল আত্মত্যাগ, উচ্চ আদর্শ, মানবজাতির প্রতি অকপট প্রেম—এ সবই সুরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। ম্যাটসিনির বিপ্লবাদর্শ তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি, সে সময়টা এর অনুকূল ছিল না। ম্যাটসিনির চরিত্র থেকে তিনি সযত্নে আহরণ করেছিলেন তাঁর অতুলনীয় দেশাত্মবোধ আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা আর মানবহিতৈষণা এবং ম্যাটসিনির এই আদর্শকেই তিনি দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। এর একটা প্রত্যক্ষ ফল এই হয়েছিল যে দেশ ও জাতির কল্যাণকল্পে আত্মোৎসর্গ করবার প্রবৃত্তিটা যুবকদের মধ্যে সহজেই উদ্রিক্ত হয়েছিল। ভারত-সভার মঞ্চ থেকে সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনি সম্পর্কে তখন প্রায়ই বক্তৃতা করতেন এবং তার সেইসব বক্তৃতার মূল বক্তব্য এই ছিল: "নব্য ইতালিকে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন ম্যাটসিনি, ইতালির জনসাধারণকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ম্যাটসিনি। তিনিই ইতালিকে একতাবদ্ধ হোতে শিখিয়েছিলেন। ভারতবর্ষেও ঐক্যের অভাব; সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এক অখণ্ড অভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংহতিতে পরিণতি করতে না পারলে, সমগ্র ভারতবাসীকে একের সহানুভূতিতে অপরকে সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলতে না পারলে, সকলের হৃদয় একই সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত করতে না পারলে ভারতবর্ষের কল্যাণ নেই। বৈধ আন্দোলনের পথে দেশসেবার ব্রত আমাদিগকে উদ্‌যাপিত করতে হবে।" এই ছিল সেদিন সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্বপ্ন। এই ছিল তাঁর লক্ষ্য—তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা।

সুরেন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের কাছে ম্যাটসিনির পুণ্যকাহিনী প্রচার করেন। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন: "তাঁহারই মুখে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে ইতালির শিক্ষার্থী যুবকেরা কি করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া Young Italy সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এ কথা শুনিতে পাই। তিনিই প্রথমে ম্যাটসিনির জীবনী, চরিত্র, দেশচর্যার আদর্শ এবং স্বদেশের উদ্ধারকল্পে

যে প্রায় জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমাদিগকে বলেন। এইরূপে আধুনিক ইতালির স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস হইতে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করি। আয়ার্ল্যাণ্ডেও ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম দিকে টমাস ডেভিস এবং গাভান ডাফি প্রভৃতি আয়ার্ল্যাণ্ডের নব্যশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় কি করিয়া সুষুপ্ত স্বদেশবাসীদিগকে জাগাইয়া স্বাধীনতার নামে দেশচর্যাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের মুখেই প্রথমে আমরা সেই কাহিনী শুনিতে পাই। ম্যাটসিনির গ্রন্থ, ডাফির *Young Ireland* আমাদের এই নূতন দেশচর্যার বা মাতৃপূজার তন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা এই সকল কাহিনীতে একেবারে মশগুল্ হইয়া উঠিয়াছিলাম। ম্যাটসিনির প্রবন্ধাবলী, গাভান ডাফির বই, কার্লাইলের *French Revolution*, মার্কিনের স্বাধীনতার ইতিহাস—এই সকলই আমাদের এই নূতন রাষ্ট্রীয় সাধনার শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শাস্ত্রের অধ্যাপক, এই সাধনার প্রধান গুরু হইয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বাংলা যদি সুরেন্দ্রনাথের সেই প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা না পাইত, তাহা হইলে আমাদের নূতন স্বাধীনতা প্রচেষ্টা কোথায় থাকিত, এ কথা আজ নূতন করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে।”

বাঙালী তরুণকে ম্যাটসিনির রচনার সঙ্গে পরিচিত করে তুলবার জন্য তিনি দুইজনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, যথা, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত। আর্যদর্শন পত্রিকায় ম্যাটসিনির জীবনী ও উপদেশ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া মাত্র যেন বিস্ফোরণের কাজ করেছিল। একদিকে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি, অন্যদিকে রজনীকান্তের ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত ম্যাটসিনির জীবনচরিত, ম্যাটসিনিকে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের নিকটে সুপরিচিত করে তুলেছিল। দেখতে দেখতে নবীন বাংলা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হোয়ে উঠল ম্যাটসিনির স্বদেশপ্রেমের আদর্শে। দেশময় প্রবাহিত হোল দেশাত্মবোধের বিদ্যুৎ-স্রোত। বাঙালীর জীবনে সে এক নূতন অভিজ্ঞতা।

এইখানে একটা কথা উল্লেখ করব। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, “সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের ফলে দেশের লোকের মনে যে রাজনৈতিক চেতনা

তখন জেগেছিল তার অনেকখানি ছিল কৃত্রিম, সাময়িক হুজুগের প্রকাশ মাত্র। অনেকাংশেই তা সত্যোপলব্ধির আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তখনকার দিনে ম্যাটসিনি-গ্যারিবলডির আমদানী-করা কাহিনী এই কৃত্রিম উত্তেজনার ভাবাবেগ জুগিয়েছে।" এই ধারণা ঠিক নয়। তাই যদি হবে, তাহলে উনিশশতকের শেষপাদে কাব্যে, গানে ও নাটকে স্বদেশ প্রেমের অমন প্রবল বন্যা বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল কেন? সুরেন্দ্রনাথ যথার্থ দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হোয়েই দেশব্যাপী হুজুগ এনেছিলেন—এ সিদ্ধান্ত ইতিহাস সমর্থন করে না। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁকে এইখানেই ভুল বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো রাষ্ট্রগুরুর দেশপ্রেমকে নকল ও শৌখিন বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাকে ব্যঙ্গ করে তিনিই লিখেছিলেন: "অন্ধকারে ঐ রে কোণে, ভারতমাতা করেন গ্রোন"—ইত্যাদি। এসব হয়তো অবিবেচনাপ্রসূত চিন্তা। সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয়চেতনা কথার আতসবাজী নয়, যুক্তিহীন আবেগের প্রলাপ নয়—এ তাঁর গভীর স্বদেশচেতনা থেকেই উৎসারিত ছিল। দেশপ্রীতিকে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় কর্মের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইহাই ছিল তাঁর জীবনসাধনা।

১৮৭৭, ২৪শে মার্চ।

স্থান—টাউন হল। আজ এখানে একটি মহতী সভার অধিবেশন হবে। এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল ভারত-সভার পক্ষ থেকে। এত বড় সভা তখনকার দিনে আর হয়নি। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল একটি: সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স হ্রাসের আদেশ যাতে প্রত্যাহৃত হয় তার ব্যবস্থা করা ও আন্দোলনের সাহায্যে এই উদ্দেশ্যকে ফলবতী করা। প্রধান বক্তা ছিলেন একজনই—সুরেন্দ্রনাথ। এখানে এর একটু নেপথ্য ইতিহাসের কথা বলব; সভার পটভূমি হিসাবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে যেসব ঘটনা রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির জন্য মুখ্যত দায়ী, তাদের অন্যতম হোল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নতম বয়সকে আরো কমিয়ে দেবার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হবার এক

বছর গত হোতে না হোতেই ভারত-সচিব লর্ড স্যালিসবেরি নিয়ম করলেন যে, বিলাতে যারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা করবে এতদিন তাদের বয়স একুশ বছর হোলেই চলত; এখন থেকে তা আর চলবে না; উনিশ বছরের অধিক বয়স্ক কোনো ছাত্রকেই আর এই পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। ভারত-সচিবের এই আদেশে শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রই ক্ষুব্ধ হোল। এইভাবে বয়স কমিয়ে ভারতবাসীর পক্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার পথ রুদ্ধ করবার একটি অপচেষ্টা ছিল এই নিয়মের মধ্যে—এ কথাটি বুঝতে আর কারো বাকী রইল না। ভারত-সভা এগিয়ে এলো—দাঁড়ালো এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে। শুধু দাঁড়ানো নয়; এই অবিচারের প্রতিবাদ করবার জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী বিরাট আন্দোলন করবার সংকল্পই গৃহীত হয়। তারই প্রথম অভিব্যক্তি দেখা গেল টাউন হলের ঐ সভায়।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই মহতী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। শহর ও মফঃস্বলের শিক্ষিত বাঙালীর নেতৃস্থানীয় অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন জীবনে কখনো কোনো রাজনীতিক সভায় যোগদান করেননি; তিনি পর্যন্ত এই সভায় উপস্থিত থেকে সভাপতি-নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিলেন। সভার মূলে কিন্তু আরো গভীর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সিভিল সার্ভিসের বয়স হ্রাস ঘটিত আদেশের প্রতিবাদকে উপলক্ষ করে সুরেন্দ্রনাথ চাইলেন নবজাগ্রত ঐক্যের প্রেরণাকে তাঁর স্বদেশবাসীর হৃদয়ে একটি স্থায়ী রূপ দিতে—ন্যাশনালিজমকে আরো সুস্পষ্ট ও সংহতভাবে প্রকটিত করতে। টাউন হলে সেদিন যে লোক সমাগম হয়েছিল, তেমন লোক সমাগম সেযুগে একমাত্র কেশবচন্দ্রের সভাতেই হোত। তবে আজকের লোক সমাগম আরো বেশি, আরো প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল। সভায় আলোচ্য বিষয় যেমন ছিল আকর্ষণীয়, প্রধান বক্তা ছিলেন তার চেয়েও আকর্ষণীয়। বাগ্মিতার মূর্ত-বিগ্রহ স্বরূপ কেশবচন্দ্র সেদিন সবিস্ময়ে সুরেন্দ্রনাথের বাগ্-বৈদগ্ধ্য প্রত্যক্ষ করলেন। সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হোল যে, এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে একসূত্রে আবদ্ধ করতে হবে।

এর দু'মাস পরেই গ্রীষ্মের অবকাশে কলেজ বন্ধ হোল। সুরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আন্দোলন করবার জন্য তিনি ভারত-সভার বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হোলেন। ১৮৭৭ সালের ২৬শে মে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বেরুলেন। সঙ্গী ছিলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; ইনি ভারত-সভার কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় একজন সুবক্তা হিসাবেও ইনি খ্যাত ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন্ কোন্ শহরে উপস্থিত হয়ে কিভাবে আন্দোলন করতে হবে, সুরেন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নেই তার একটা কার্যসূচী তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই কার্যসূচী অনুসারে প্রথম সভা হয় লাহোরে। এখানকার সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। এইখানেই সুরেন্দ্র নাথের প্রথম অভিজ্ঞতা হোল যে, একই রকম শাসন-পদ্ধতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার এক সাধারণ পথ তৈরি করেছে। ভারতের সকল প্রদেশের লোক এই পথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। টাউন হলের সভায় যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, লাহোরের সভায়ও সেইসব প্রস্তাব গৃহীত হোল। তাঁর বক্তৃতায় সকলের প্রাণে যেন একটা নূতন সাড়া জাগল।

লাহোরে তিনি আর একটি সভায় ভারতবাসীর ঐক্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন এবং তার ফলে কলিকাতার ভারত-সভার আদর্শে 'লাহোর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই লাহোরেই সর্দার দয়াল সিং মাজিটিয়ার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় এবং পরে বন্ধুত্ব হয়। ইনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। এঁরই কীর্তি দয়াল সিং কলেজ; এঁর অপর কীর্তি—'ট্রিবিউন' পত্রিকা। পাঞ্জাবে জাতীয় ভাব প্রচারের মূলে দয়াল সিং কলেজ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই 'ট্রিবিউন' পত্রিকার দান অবিস্মরণীয়। এই পত্রিকাখানির সঙ্গে একজন নির্ভীক সম্পাদকের স্মৃতি বিজড়িত আছে; তিনি সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য কালীনাথ রায়। ইনি দীর্ঘকাল 'ট্রিবিউন' পত্রিকা সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর নির্ভীকতার জন্য ইংরেজ প্রভুশক্তির হাতে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

তাঁর এই পর্যায়ের ভ্রমণে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর সুকুল। কৃষ্ণকুমার লিখেছেন: "কলিকাতা হইতে লাহোর প্রভৃতি

সমস্ত বড় শহরে সুরেন্দ্রনাথ যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া বহু কালের নিদ্রার পর শিক্ষিতমণ্ডলী স্বদেশপরায়ণ হয়েন।” অমৃতসর, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্মৌ, আলিগর ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে সুরেন্দ্রনাথ যেসব বক্তৃতা করেন তার বিষয় ছিল ঐ একই—সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর উত্তেজনাময়ী বক্তৃতার ফলে প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক সভায় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ একমত হয়ে টাউন হলের সভায় গৃহীত মন্তব্যই গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়। প্রত্যেক স্থানেই ভারত-সভার আদর্শে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হোতে লাগল। এই ভাবে সেদিন কলিকাতা থেকে লাহোর—সমগ্র উত্তর-ভারতে দেশাত্মবোধের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হোল ; দেশসেবায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন একমন একপ্রাণ হোয়ে উঠলেন। প্রদেশে প্রদেশে দেখা দিল জাতীয়তার উন্মেষ, সকলেই নূতন উৎসাহে মেতে উঠল, দীক্ষা নিল জাতীয়তার নবীন মন্ত্রে। শিক্ষিত ভারতবাসীর কল্পনায় জেগে উঠল এক অখণ্ড মহাভারতের উজ্জ্বল চিত্র। শতাব্দীর সাধনা যেন এতকাল বাদে তার সার্থক পরিণতি লাভ করল। ভারতবাসীর জীবনে সে এক নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন শিহরণ। ভারতবাসীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হোল জাতীয়তার পুণ্য বেদী। দেশব্যাপী এই উদ্দীপনাকে সুরেন্দ্রনাথ স্তিমিত হোতে দিলেন না। প্রচারকার্যের এই সফলতা তাঁর হৃদয়ে যেন দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার করল। নবজাগরণের বার্তা বহন করে তিনি গেলেন মাদ্রাজ ও বোম্বাই। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি বোম্বাইয়ের জননায়কগণ সুরেন্দ্রনাথকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালেন। এখানেও বিরাট সভা আহূত হোল এবং কলিকাতার অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হোল। এখান থেকে সুরেন্দ্রনাথ একে একে সুরাট, আমেদাবাদ, পুণা প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করলেন। পুণায় তিনি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। পুণা থেকে এলেন মাদ্রাজ। তখনকার মাদ্রাজ, সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, রাজনীতিক শিক্ষা-দীক্ষায় ও আন্দোলনে খুবই পশ্চাৎপদ ছিল, তাই এখানে সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্য সভা আহ্বান করতে পারা যায়নি। স্থানীয় একটি কলেজভবনে মাত্র একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং সেই সভায় কেবলমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশব্যাপী ভ্রমণ শেষ করে এবং ভারতের সকল প্রদেশে সরকারী আদেশের প্রতিবাদে জনমতকে বিপুলভাবে জাগ্রত করে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরলেন। এইখানেই তিনি নিরস্ত হলেন না। পার্লামেণ্টের কমন্স সভাকে উদ্দেশ করে একটি আবেদনপত্র রচিত হয়েছিল। ভারত-সচিবের আদেশ খারিজ করে সিভিল সার্ভিসের বয়সের মাত্রা বাইশ বছর করা এবং বিলাতে ও ভারতে একই সময়ে এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা—আবেদনপত্রে এই দুইটি জিনিস দাবী করা হয়েছিল। এই দাবীর অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমতকে জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা ভারত-সভার নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন এবং তাঁরা সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিধিস্বরূপ সেইদেশে পাঠাতে চাইলেন। তিনি কিন্তু রাজী হোলেন না। বললেন: "আমার স্বদেশবাসীর জন্য যে উচ্চপদ-প্রাপ্তির আন্দোলন করিতে বিলাতে যাইব, আমি সেই উচ্চপদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। এমন অবস্থায় বিলাতের জনসাধারণ আমার কথা ভুল বুঝিতে পারে।" ভারত-সভা তখন লালমোহন ঘোষকে প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন। নির্বাচন ভুল হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "Mr. Lalmohan Ghose's phenomenal success in his mission fully justified the selection." লালমোহন যে একজন কতবড় বাগ্মী ছিলেন তা তখনো পর্যন্ত তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিলাত থেকে তাঁর আন্দোলনের সফলতার সংবাদ এদেশে এসে পৌছবার পর সেটা জানা গেল। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জন ব্রাইট পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লালমোহন ঘোষ সেইসময়ে পার্লামেণ্টে উদারনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁর নির্বাচন একরকম সুনিশ্চিত ছিল। মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তখনকার দিনে বিলাতে প্রতিনিধি-প্রেরণ কম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল না। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন রাজনীতিক কাজের জন্য অর্থসাহায্য বা চাঁদা সংগ্রহ করা খুব কঠিন ছিল। বাংলাদেশে তখন একজনই বদান্য মহিলা ছিলেন; তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ী। লালমোহন ঘোষকে বিলাতে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ কি প্রয়াস পেয়েছিলেন, সেই কথা বলতে গিয়ে আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন:

"I applied myself to the task of collecting subscriptions; and in less than six months time I had raised the necessary funds, chiefly among our middle class people. The only substantial sum that we obtained was from the Maharani Swarnamayee."

তাঁর আত্মচরিত থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছে সুরেন্দ্রনাথ সরাসরি আবেদন জানান নি। দেশব্যাপী এই আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি আছে, এই কথা অবগত হবার পর, সুরেন্দ্রনাথ একদিন কলিকাতায় সাহিত্য-সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাবার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁকে বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখনি মহারাণীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের নামে একখানি পত্র লিখে দেন। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় দুজনে সেই চিঠি নিয়ে বহরমপুর যান ও রাজীবলোচনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি, মহারাণী প্রচুর অর্থসাহায্য করেছিলেন। এই সংগৃহীত অর্থেই লালমোহন ভারত-সভার প্রতিনিধি হিসাবে বিলাত গিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ সফল হয়েছিল। লণ্ডনে প্রথম যে সভাটি আহুত হয় তাতে জন ব্রাইট (ইনি তখন পার্লামেণ্টের একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্য ছিলেন) সভাপতিত্ব করেন। লালমোহনের বাগ্মিতাশক্তি ও যুক্তিজাল-বিস্তার ব্যর্থ হোল না; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় এক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। এই প্রস্তাবের ফলেই ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় Statutory Civil Service প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল।

ভারত-সভার প্রতিনিধি হিসাবে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে, শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র জাগিয়ে ও জনমত গঠন করে সুরেন্দ্রনাথ কী অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন সেদিন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্যর হেনরী কটন। তিনি সেই সময়ে প্রকাশিত তাঁর *New India* গ্রন্থে লিখেছেন:

"The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Babus now rule public opinion from Peshawar to Chittagong. A quarter of a century ago there

was no trace of this...and at the present moment the name of Surendra Nath Banerjea excites as much enthusiasm among the rising generation of Multan as in Dacca." ভারতের অবিসম্বাদী জননায়ক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের যে প্রতিষ্ঠা সেইদিন দেখা গিয়েছিল, তা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৮৭৭। লর্ড লিটন তখন বড়লাট।

ইংলণ্ডে তখন সংরক্ষণশীল দল গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন। লর্ড সলিসবেরি ভারত-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড লিটনের শাসনকালে তিনটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। যথা, দিল্লী-দরবার, দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা আর অস্ত্র আইনের প্রবর্তন। এখানে দেশীয় সংবাদপত্র বলতে প্রধানত বাংলা সংবাদপত্রকেই বুঝতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও অস্ত্র আইনের প্রবর্তন করে ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করা—এই দুটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে ভারতে সেদিন বিরাট আন্দোলনের তরঙ্গ উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অস্ত্র আইন প্রবর্তনের অজুহাতটা ছিল আফগান যুদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "The Arms Act was unnecessary in the sense that it was not required as a measure of protection against internal revolt ; it was mischievous because it made an irritating and invidious distinction between Europeans and Indians. We protested against it at the time" কিন্তু এই প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়েছিল। এমন কি গ্লাডষ্টোন যখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হোলেন, তিনি ভার্ণাকুলার প্রেস আইন প্রত্যাহার করেছিলেন, কিন্তু অস্ত্র আইন বলবৎ রেখেছিলেন।

আন্দোলনটা অবশ্য তীব্র হয়েছিল প্রেস আইনকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রয়োজন। সিভিল সার্ভিস আন্দোলনে যেমন, তেমনি প্রেস আইনের আন্দোলনেও সুরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণই

সর্বদেশে সর্বকালে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হোল না। অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে এই তিনটি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই হয়েছিল যে, ভারতবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত জেগে উঠতে থাকে। এই সম্পর্কে একটি আধুনিক ইতিহাস-গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে : "The agitation against these non-popular measures shaped the political life of India and made it conscious of its strength and potentialities."* দিল্লী-দরবারে ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতেশ্বরী' বলে ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ 'হিন্দুপেট্রিয়ট'-এর প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা হিসাবে দরবারে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল তখন এর সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তখনো পর্যন্ত কোনো কাগজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব তখন ভারতবর্ষের সংবাদপত্র-জগতে আসন্ন হয়ে এসেছিল।

দিল্লীতে এসে তাঁর প্রথম কাজ হোল সমস্ত ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা প্রতিনিধিদল গঠন করা। উদ্দেশ্য ছিল—এই প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বিধি প্রত্যাহার-সূচক একটি আবেদনপত্র বড়লাটকে দেওয়া হবে। আবেদনপত্রের মুসাবিদা করলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং প্রতিনিধি-সঙ্ঘ তখন লর্ড লিটনের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন। সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হোল এবং বয়সে সবচেয়ে ছোট হোলেও প্রবীন সম্পাদকগণ সুরেন্দ্রনাথকেই প্রতিনিধি-সঙ্ঘের মুখপাত্র মনোনীত করলেন। এই আবেদনের ফল অবশ্য বিশেষ কিছু হয়নি। সুরেন্দ্রনাথের কথায় : "The Viceroy, as might have been expected, was reticent and said nothing in reply to the address."

কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হোল না। যথাসময়ে ভার্ণাকুলার প্রেস আইন প্রবর্তিত হোল ; ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোল। লাট-সভায় এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রতিবাদ উঠল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার

* *An Advanced History of India :* Majumdar, Raychaudhuri & Datta

সদস্য ছিলেন। লিটন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং প্রস্তাবিত এই আইন-সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সরকারের পক্ষেই তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। শাসক ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় অভিজাতশ্রেণীর কাছ থেকে ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। 'হিন্দুপেট্রিয়ট এই আইনের বিরুদ্ধে লিখল বটে, কিন্তু তার সুরটা ছিল নরম; হরিশ্চন্দ্রের 'পেট্রিয়ট' আর কৃষ্ণদাস পালের 'পেট্রিয়ট'—আসমান-জমীন তফাৎ ছিল। হরিশ্চন্দ্রের 'পেট্রিয়ট' নীলকর আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল—ভারতবর্ষে সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে এতবড় গৌরবের ভাগী সেদিন আর কোনো পত্রিকা হোতে পারেনি। প্রেস আইনের প্রতিবাদে সেদিন 'পেট্রিয়টের' লেখার মধ্যে না ছিল কোনো তীব্রতা, না ছিল অনুরাগের গাঢ়তা। তেমনি জমিদার সভা বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও এই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ বা আন্দোলন করা হোল না। এই অবস্থায় শিক্ষিত-সমাজে বিক্ষোভ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল।

এগিয়ে এলো ভারত-সভা। এগিয়ে এলেন সুরেন্দ্রনাথ। ভারত-সভা তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করল প্রেস আইনের বিরুদ্ধে। সুরেন্দ্রনাথ বুঝলেন লর্ড লিটনের গভর্ণমেণ্ট সহজে এই আইন তুলে নিতে রাজী হবে না, আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আন্দোলন করতে হোলে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মতি ও সহানুভূতি দরকার। এই উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হোতে হয়। সেদিন এমন প্রয়োজনীয় একটি আন্দোলনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মাত্র দুইজন—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড ডক্টর ম্যাকডোনাল্ড, এ কথা সুরেন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "Dr. K. M. Banerjee threw himself heart and soul into the movement, and his association with it and that of the Rev. Dr. Macdonald gave it a non-sectarian and cosmopolitan character." সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে সুরেন্দ্রনাথ "বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন" বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য যে যথার্থ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ্য। এই ভার্ণাকুলার প্রেস আইন যখন প্রবর্তিত হয়, তখন কলিকাতায় দেশীয়ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে শিশির-কুমার ঘোষ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অন্যতম ছিল। ইহা অর্ধেক ইংরেজী ও অর্ধেক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হোত। ভারত-সভার অভ্যুদয়ে শিশির ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক প্রতিষ্ঠানটির দরজা বন্ধ হোয়ে যায়। শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি তখন একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়েছে সুরেন্দ্রনাথের উপর; শিশিরকুমার বা তাঁর অনুজ মতিলাল কেউ-ই সেইজন্য তাঁকে সুনজরে দেখতেন না; মতিলাল তো রীতিমতো ঈর্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। সে কাহিনী সুবিদিত। যাইহোক, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য আইন প্রবর্তিত হোল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সে আইনের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নিরাপদে পৃষ্ঠদেশ রক্ষার জন্য রাতারাতি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ১৮৭৮ সালের ২১শে মার্চ তারিখে 'পত্রিকার' সম্পাদকীয় স্তম্ভে "It is with deep regret that we part with our Vernacular columns"—এর অতিরিক্ত আর কিছু লেখা হয়নি। অথচ সেই একই সময়ে, আমরা দেখতে পাই যে এই আইনের প্রতিবাদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে, সেদিনের সেই প্রতিবাদ আন্দোলনে পরোক্ষভাবে প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। দ্বারকানাথ, রামমোহনের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে যে সাহস দেখিয়েছিলেন, শিশিরকুমার ঘোষ সে সাহস দেখাতে পারেন নি। এই ঘটনার পঞ্চান্ন বছর আগে, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল রামমোহনের কণ্ঠে ও তিনি তাঁর 'মিরাৎ' বন্ধ করে দিয়ে নির্ভীক সাংবাদিকতার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেদিন।

দেখতে দেখতে ভারত-সভার মাধ্যমে ও সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন এই আইনের প্রতিবাদ করবার জন্য টাউন হলে একটা সভা করতে হবে। সভার দিনও ধার্য হোল। সভা হবে বিকেল পাঁচটায়, বেলা তিনটার সময়ে হঠাৎ আনন্দমোহন সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে এলেন। তাঁর চোখেমুখে একটা উদ্বেগ,

একটা চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার, আনন্দ? তুমি যে হঠাৎ?"

—আমাকে আসতেই হোল, সুরেন। সবাই বলছে আজকের সভাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা যেরকম সংকটাপন্ন তাতে এই সভার ফল খারাপ হোতে পারে।

—কিন্তু সভা স্থগিত রাখলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেটা তো বুঝতে পারছ। আর য়ুরোপের পোলিটিক্যাল সিচুয়েশনের কথা বলছ, তা রাশিয়ার সঙ্গে তো ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধল না। তাহলে আর সমস্যাটা কোথায়?

—উমেশ বলছিল, সভা করলে না কি উদ্যোক্তাদের আদালতে অভিযুক্ত হোতে হবে।

—আমার সুস্পষ্ট অভিমত শোনো। ভারত-সভা ও বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই প্রথম উদ্যম কিছুতেই নষ্ট হোতে দেওয়া হবে না। যদি একে আমরা অঙ্কুরেই নষ্ট করতে দিই, তাহলে আমাদের আর কোনো আশা-ভরসা থাকবে না। লোকে আমাদের উপর আর আস্থা রাখবে না। আন্দোলন যদি বৈধভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে আইনের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে না। সভা হবেই।

"সভা হবেই" এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সেদিন এই কথা দুটি উচ্চারণ করেছিলেন যা শুনে, আনন্দমোহন আর কোনো কথা বলেন নি। সভা হোল। জনসমাগমও খুব হয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেই বিরাট সভা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। বাঙালী সেই প্রথম উপলব্ধি করল যে, সংঘবদ্ধ হোয়ে আন্দোলন করলে সে আন্দোলনে সফলতালাভ সুনিশ্চিত। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু শুধু সভা করেই নিরস্ত হলেন না, আন্দোলন সমানভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভারত-সভার পক্ষ থেকে গ্লাডষ্টোনের নিকটে যথাসময়ে একখানি পত্র প্রেরিত হোল। পত্রের মুসাবিদা করলেন সুরেন্দ্রনাথ। আর সেই মুসাবিদা সংশোধন করে দিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: "The agitation against the Vernacular Press Act sounded its death-knell, and what is

even more important, it disclosed the growing power of the middle-class. It was a lesson that the middle class of Bengal never forgot, and which they have since utilised in many useful directions. It indeed marked a definite and progressive stage in national evolution."

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ভারত-সভা তথা সুরেন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের তাৎপর্য যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এই সত্যটা পরিষ্কার হোয়ে যাবে যে সুরেন্দ্রনাথের বৈধ আন্দোলনই এদেশে পরবর্তী আর সব রাজনৈতিক মত ও পথকে প্রশস্ত করে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বাস্তবপন্থী রাজনীতিক ছিলেন; জীবনের কোনো সময়েই তিনি আবেগ বা উচ্ছ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হন নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজশাসনের তাৎপর্যকে তিনি যে গভীরভাবেই অনুধাবন করেছিলেন, সেটা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যখন লর্ড রিপনের আমলে শাসনব্যবস্থায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হোল।

একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, "Lord Ripon made a real beginning in the direction of local self-government in modern India." লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকালে এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, লর্ড রিপন কার্যভার গ্রহণ করবার পূর্বেই সেটা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায় যে, ভারতশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু-নিন্দিত এই প্রেস-আইন উঠিয়ে দিলেন। তবে লিটনের কুশাসনের একটা সুফল এই দেখা গিয়েছিল যে, ভারতবাসীর মনে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠেছিল এবং তারা সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মূল্য বুঝতে শিখেছিল। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ্য: "In the evolution of political progress, bad rulers are often a blessing in disguise. They help to stir a community into life.—Lord Lyton

was a benefactor, without intending to be one." কিন্তু রিপন প্রকৃতপক্ষেই একজন প্রগতিবাদী সুশাসক ছিলেন। ভারতবর্ষে উপনীত হোয়ে তাঁর প্রথম ঘোষণা ছিল যে, এদেশের মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধন করা হবে, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইহাই বিশেষভাবে অভিপ্রেত।

ভারত-সভার পক্ষ থেকে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান হোল। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, মিউনিসিপ্যালিটিই প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের পাঠশালা; রাজনীতির ক-খ-গ এইখানেই শিখতে হয়। অতঃপর তিনি ভারত-সভার মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসনতন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের রাজনীতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর হোলেন। লর্ড রিপনের এই ঘোষণার পর ভারত-সভায় কর্ম-চাঞ্চল্য দেখা দিল; মফঃস্বলে প্রতিনিধি প্রেরণ ও ইস্তাহার প্রচার-দ্বারা এই কথাটা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হোল যে, যাতে স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটিগুলিতে গভর্ণমেণ্ট নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করে, সেজন্য যেন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তিত না হোলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সংস্কার হবে না। স্বায়ত্ত-শাসনের এই মূলনীতি যাতে দেশমধ্যে প্রবলভাবে প্রচারিত হয়, অতঃপর তিনি সেই কার্যসাধনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এদেশে এই কারণেই তাঁকে স্বায়ত্তশাসনের জনক বলা হয়েছে। এ গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা কি অসাধ্যসাধন করেছিল তা পরবর্তীকালে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তাঁর পরিকল্পিত ও রচিত মিউনিসিপ্যাল আইনে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ আবার প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হোলেন। মফঃস্বলের বহু শহরে ঘুরে ঘুরে তিনি সেখানকার অধিবাসীগণকে স্বায়ত্তশাসনের উপকারিতা বোঝাতে লাগলেন। তিনি যখন এই উদ্দেশ্যে মফঃস্বলে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এই দেশে, সত্য কথা বলতে, রাজনীতিক আন্দোলনের উষাকাল মাত্র। স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে রাজনীতিক আন্দোলনই জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই ভাবেই সেদিন রাষ্ট্রগুরু বাঙালীকে রাজনীতিক মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

দেশে যখন রাজনীতির ক-খ-গ কেউ জানত না, বুঝত না, ভোটের কথা কল্পনাতেও কেউ আনত না, তখন তিনিই আশার আলো জ্বেলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের উপদেশে দেশবাসীকে পথ দেখিয়েছিলেন। মফঃস্বলে উপস্থিত হয়ে তিনি প্রথমে যেতেন বার লাইব্রেরিতে। সেখান থেকেই তিনি তাঁর প্রচারকার্যে বেশী সহায়তা লাভ করতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন বাংলার প্রত্যেক মফঃস্বল শহরে এমন উকিল অনেক ছিলেন যাঁরা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র। বাংলা তথা ভারতবর্ষে যদি কেউ স্বায়ত্ত-শাসনের ইতিহাস প্রণয়ন করতে চান তাঁদের উচিত সর্বাগ্রে সুরেন্দ্রনাথের এই সময়কার বক্তৃতাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। এইভাবে প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে তিনি যেমন দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তেমনি তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকাও বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই অক্লান্ত ও ব্যাপক প্রচারকার্যের সুফল দেখা দিল। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য বাংলা দেশের জনমত সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হোল। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন করবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করতে বদ্ধপরিকর হোলেন। এইভাবে লর্ড রিপনের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রস্তাবে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সম্মতি আছে বুঝতে পেরে সুরেন্দ্রনাথ টাউনহলে একটি বিরাট সভার আয়োজন করলেন। এই সভার তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১। এই সভায় একটিমাত্র প্রস্তাবই গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি তাঁরই রচনা এবং তিনিই এটি উত্থাপন করেছিলেন। তাতে বলা হোল: (১) মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ডে নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন করতে হবে; (২) সভাপতি বা চেয়ারম্যান-নিয়োগ নির্বাচন দ্বারা হবে এবং কোনোক্রমেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টরকে চেয়ারম্যান করা হবে না; (৩) বর্তমান কমিটিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি করতে হবে। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। দেখা গেল যে, লর্ড রিপনের গভর্ণমেণ্ট স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা করবার সংকল্প করেছিলেন, টাউনহলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে অর্থাৎ জনসাধারণের মতের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিল না। ভারতবর্ষের এই নবজাগ্রত জনমতের প্রাবল্য অনুভব করেই,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে পরবর্তীকালে লর্ড রিপন একবার এই মন্তব্য করেছিলেন : "Time is fast approaching when popular opinion in India will become the irresistible and unresistible master of the Government." পরবর্তীকালের ইতিহাস লর্ড রিপনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর অভ্রান্ততা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছিল। আর এই জনমত জাগ্রত করেছিলেন একটি মানুষ। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ আট ॥

"The *Bengalee* may be regarded as the voice of India."

'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রকে ভারতবর্ষের মুখপত্র হিসাবে গণ্য করা যায়।"

এ উক্তি করেছিলেন একজন বিদেশী সাংবাদিক।

এই 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-জীবনের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। বাঙালী তথা ভারতবাসীর রাজনীতিক দীক্ষাগুরু সুরেন্দ্রনাথ যে একজন কতবড়ো সাংবাদিক ছিলেন এবং সংবাদপত্রের সম্পাদনায় তিনি যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, সে ইতিহাস না জানলে তাঁর কর্মজীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জীবনের শেষভাগে (তখন তাঁর বয়স সাতাত্তর বছর) তিনি একই সময়ে তিনখানা দৈনিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। জনমত জাগ্রত করতে হোলে নিজস্ব সংবাদপত্রের প্রয়োজন, রামমোহনের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথেরও এই সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় নি। কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হোয়ে তিন বৎসরকালের মধ্যেই তিনি 'বেঙ্গলী' পত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সংবাদপত্র যে কতবড়ো শক্তিশালী হোতে পারে তা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পর দেখালেন সুরেন্দ্রনাথ।

তাঁর পূর্বে এদেশে সংবাদপত্র যে ছিল না তা নয়। ১৮৬০-৭০ সালে ভারতবর্ষে কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হোত বটে, কিন্তু তখনো ভারতীয় সংবাদপত্র তেমন প্রভাবশালী হোয়ে উঠতে পারে নি; এমন কি দেশের জনমত গঠনে এর তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও ছিল না। বাংলা দেশে তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদপত্রের খুব প্রতিপত্তি; কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন তখন এর সম্পাদক। পরবর্তীকালে ইনি সরকারের অত্যন্ত বশম্বদ হয়েছিলেন এবং ছোটলাট এসলি ইডেনের শাসনকালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অনেকটা সরকারের

মুখপত্রস্বরূপ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তার পূর্ব ঐতিহ্য থেকে অনেকখানি ভ্রষ্ট হয়েছিল। তৎকালীন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সংঘর্ষই তাঁর কাগজ করার অন্যতম কারণ ছিল। হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদনাকালে 'পেট্রিয়ট' সত্যই বাংলাদেশে সংবাদপত্রগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের উপর এর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এই প্রতিপত্তি দেখে এবং মুখ্যত ভারত-সভার প্রচারকার্যের সুবিধা হবে মনে করে সুরেন্দ্রনাথ একখানি কাগজ বের করবার সঙ্কল্প করলেন। তিনি লিখেছেন: কোনো পুরাতন কাগজ লইব, কি নূতন কাগজ বাহির করিব, এ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম—কোনো পুরাতন কাগজই আমি লইব এবং উহার সংস্কার সাধন করিব।" পুরাতনের ভিত্তির উপরে তিনি কিভাবে নবীনের* সৌধ গড়ে তুললেন, অতঃপর সেই কাহিনীর আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হব।

'বেঙ্গলী' পত্রিকার ইতিহাস তাঁর আত্মচরিতে সুরেন্দ্রনাথ যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি এর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কাগজখানির প্রচার তখন খুব কমে গিয়েছিল এবং তার অস্তিত্ব নামে মাত্র বজায় ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মাত্র দশটাকা মূল্যে 'বেঙ্গলী'-র goodwill কিনে নিলেন আর যে প্রেসে তখন ঐ কাগজ ছাপা হোত তা সাজ-সরঞ্জামসহ কিনে নিতে তাঁকে ১৬০০৲ টাকা দিতে হয়েছিল। অত টাকা তখন তাঁর কোথায়? তখন তাঁর জীবিকানির্বাহের উপায় তো অধ্যাপনা। কাজেই জনৈক বন্ধুর কাছ থেকে ৭০০৲ টাকা ধার করলেন। বন্ধুটি বিনা সুদে তাঁকে এই টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং দুই বছর পরে সুরেন্দ্রনাথ ঐ টাকা পরিশোধ করেছিলেন। গুড উইলের দাম দশটাকা হোল কেন?—অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা এই যে, বেচারামবাবু সুরেন্দ্রনাথকে বিনামূল্যেই কাগজখানি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আইনজ্ঞ বন্ধুরা তাঁকে এই উপদেশ দিলেন যে, কিছু মূল্য গ্রহণ না করলে স্বত্ব-প্রদানের লেখাপড়া আইনের চক্ষে সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য বেচারামবাবু গুড উইল বাবদ দশটাকা নিয়েছিলেন। বলেছিলেন: "এর আধপয়সাও বেশি নেব না।"

১৮৭৯, ১লা জানুয়ারি।

সুরেন্দ্রনাথ তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। ঐ দিন তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তাঁর হাতে 'বেঙ্গলী' এসেছে শুনে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই আনন্দিত হোলেন। সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, যে কাগজখানি তিনি ভারত-সভার হাতে তুলে দেবেন এবং একটি পয়সাও না নিয়ে এর সম্পাদনা করবেন; প্রকাশনার ভার থাকবে ভারত-সভার উপর। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যেমন জমিদার-সভার (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন) সম্পত্তি ছিল, 'বেঙ্গলী' কাগজও তেমনি ভারত-সভার সম্পত্তি হয়, এই-ই তিনি ইচ্ছা করেছিলেন। কাজেই এর থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ব্যবসায় হিসাবে পরিচালনা করে তার থেকে অর্থ উপার্জন করবেন, এমন ইচ্ছা বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের ছিল না; জনসাধারণের সেবাই তাঁকে এই কাজে প্রণোদিত করেছিল। কাগজ থেকে এক পয়সা আয় হোত না, বরং লোকসানই হোত। ভারত-সভাও নূতন, তারো সঙ্গতি সামান্য, এমন অবস্থায় পত্রিকা পরিচালন করা এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অসম্ভব ছিল। এইসব কারণেই ভারত-সভার পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেটা ছিল সাপ্তাহিক কাগজের যুগ। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কাগজ সবই সাপ্তাহিক। দৈনিক সংবাদপত্রের যুগ আরম্ভ হয় এদেশে এই শতাব্দীর শুরু থেকে। 'বেঙ্গলী' যখন সুরেন্দ্রনাথের হাতে আসে তখন উহা সাপ্তাহিক ছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত একমাত্র *Indian Mirror* ভিন্ন, বাংলার আর সব সংবাদপত্রই তখন সাপ্তাহিক ছিল। সপ্তাহে একবার করে খবর জানতে পারলেই লোকে তৃপ্ত হোত। প্রত্যহ নূতন নূতন সংবাদপাঠের আগ্রহটা তখনো পর্যন্ত দেখা দেয় নি। তালতলার বাড়িতেই সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী'র ছাপাখানা ছিল। প্রতি শনিবার বেরুত। একুশ বছর সাপ্তাহিকরূপে পরিচালিত করবার পর সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'কে দৈনিক কাগজে পরিণত করেন এই শতাব্দীর সূচনায়। ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকাই সর্বপ্রথম রয়টার-পরিবেশিত সংবাদের গ্রাহক হয়েছিল। বঙ্গবিভাগের সময় 'বেঙ্গলী'র খুব প্রভাব হয়। 'দি

ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামক পুস্তকে লিখিত হয়েছে : "Indian opinion found expression in the columns of the *Bengalee*, edited by the talented Surendranath Banerjea, who is remembered for, amongst other things, his vigorous campaign against the partition of Bengal."* সত্যই, এই শতাব্দীর সূচনা থেকে দৈনিক বেঙ্গলীর পৃষ্ঠায় জনমত যেভাবে প্রতিফলিত হোত, তখনকার অন্য কোনো দেশীয় সংবাদপত্র সে রকম দাবী করতে পারে না। শুধু তাই নয়। সংবাদপত্রে ইংরেজের ভাষায় ইংরেজকে কড়া কথা শুনিয়ে দেবার সাহস আমরা বোধ হয় বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রথম দেখলাম। আগ্নেয়স্রাবের মতো জ্বলন্ত ভাষায় সরকারের কার্যাবলীর প্রতিবাদ করে 'বেঙ্গলী' সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন কী ভাবে উদ্দীপ্ত রেখেছিল, সে ইতিহাস তো আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি, যেমন বিস্মৃত হয়েছি সেই ইতিহাসের স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথকে।

বাগ্মিতায় তিনি যেমন বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন, 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক হিসাবেও সুরেন্দ্রনাথ তেমনি বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও 'বেঙ্গলী' তাই এক এবং অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি সংখ্যায় তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়বার জন্য সহস্র সহস্র লোক আকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করত ; রাজপুরুষেরা পর্যন্ত 'বেঙ্গলী'র অভিমত জানবার জন্য ব্যগ্র থাকতেন। সাংবাদিকতায় তাঁর প্রতিভা সহজাত ছিল। দ্বিতীয়বার পদচ্যুতির বিরুদ্ধে তিনি যখন বিলাত গিয়েছিলেন, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে, অভিজ্ঞ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল সুরেন্দ্রনাথের ডেসপ্যাচ পড়ে বলেছিলেন : "He will one day shine as a journalist"—তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়নি। দিল্লী-দরবারের সময়ে উক্ত 'পেট্রিয়ট'-এর দিল্লীর সংবাদদাতা হিসাবে তিনি যেসব তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা পাঠ করে তাঁর বন্ধু রমেশচন্দ্র একপত্রে বিহারীলাল গুপ্তকে লিখেছিলেন : "হিন্দু পেট্রিয়টে সুরেনের লেখা নিশ্চয়ই পড়েছ। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে যে, ও যদি একমাত্র

---

* *The Indian Press :* Margarita Burns.

সাংবাদিকতাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে ভবিষ্যতে একজন দিগ্বিজয়ী সম্পাদক হবে।" এ ভবিষ্যদ্বাণীও নিষ্ফল হয়নি।

'বেঙ্গলী' প্রতি শনিবার সকালে বেরুত। প্রথম পাঁচ বছর 'বেঙ্গলী'র সম্পাদনা কার্যে যিনি সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন তিনি আশুতোষ বিশ্বাস। গোড়ার দিকে তিনি নিঃস্বার্থভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সহায়তা করেছিলেন। ভবানীপুরে লণ্ডন মিশন সোসাইটির স্কুলে যেদিন তিনি শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, সেদিন তরুণ আশুতোষ বিশ্বাসও সেই সভায় একটি বক্তৃতা করেন। তরুণের বক্তৃতাশক্তি, অল্প কথায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা দেখে সুরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন এবং তিনি বুঝলেন যে এই তরুণের মধ্যে বস্তু আছে। তারপর তিনি আশুতোষকে একদিন তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। সেই পরিচয় ক্রমে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ওকালতিতে পশার বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদপত্র জগৎ থেকে দূরে সরে যান। আলিপুর বোমার মামলার সময়ে এই আশুতোষ বিশ্বাস* সরকার পক্ষের উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন; এইজন্য বিপ্লবীদের হস্তে তিনি শোচনীয়ভাবে নিহত হন।

যাইহোক, সুরেন্দ্রনাথ ও আশুতোষ বিশ্বাস দুজনে মিলে 'বেঙ্গলী' সম্পাদন করতে লাগলেন। লাভ বিশেষ কিছু হোত না, তবে পত্রিকা পরিচালনের ব্যয় পত্রিকার আয় থেকেই নির্বাহিত হোতে লাগল। স্যর এসলি ইডেন তখন বাংলার ছোটলাট। সেকালের ছাঁচে ঢালা একজন জবরদস্ত সিবিলিয়ান। শাসক হিসাবে প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় দিলেও, তিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর autocrat এবং নিজের খোসখেয়ালে চলতেন। দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন এঁর কাছে পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল। স্বাধীন সংবাদপত্র, স্বাধীন রাজনৈতিক সভাসমিতি—এসব তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। বাংলায় তখন যে নূতন রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল তার সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা নবীন ভারত গড়ে তোলা। এই চেতনার যাঁরা ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁরা যে ইডেনের মতো শাসনকর্তার প্রতি অনুরাগী হোতে পারেন নি, ইহা স্বাভাবিক।

* বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস এঁরই পুত্র ছিলেন।

'বেঙ্গলী' ছিল এই দলের মুখপত্র। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি দেশীয় সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্যেরা স্যর এসলি ইডেনকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাবার জন্য টাউন হলে একটা বিরাট সভা করবেন বলে স্থির করেছিলেন এবং তাঁরা এই সভাকে একটি জনসভা বা 'Public meeting' বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'তে লিখলেন: "স্যর এসলির বন্ধু ও অনুরাগিগণ তাঁদের নামে তাঁর বিদায়-সম্বর্ধনা করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু জনসাধারণের নামে এ কাজ করবেন বলে ঘোষণা করলে আমরা তাতে আপত্তি করব। যদি তাঁরা আমাদের পরামর্শ না শুনে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন, তাহলে এর প্রতিবাদস্বরূপ আর একটি সভা ডাকা হবে।" এই তীব্র মন্তব্যের পর উদ্যোক্তাগণ সর্বসাধারণের নামে আর সভা ডাকেন নি। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: This was a notable triumph of middle class educated opinion in Bengal." 'বেঙ্গলী'-তে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভিমতই প্রতিফলিত হোত আর এই পত্রিকাখানিকে আশ্রয় করেই সেদিন সেই অভিমত একটি 'living force বা জীবন্ত প্রভাব হিসাবে ক্রমেই দানা বাঁধছিল।

১৮৮৩, ২৮শে এপ্রিল।

ঐ দিনে 'বেঙ্গলী'-তে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। মন্তব্যের শেষাংশটি এই রকম: "What are we to think of a Judge who is so ignorant of the feelings of the people and so disrespectful of their cherished conviction, as to drag into court, and then to inspect, an object of worship which only Brahmins are allowed to approach ?" এই মন্তব্যটিই ছিল সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার সূচনা। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই।

জন ফ্রিমেন নরিস ১৮৮২ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচাপতি নিযুক্ত হয়ে বিলেত থেকে এদেশে এলেন। সেই নরিস

সাহেবের এজলাসে কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সেই মোকদ্দমা উপলক্ষে, বড়বাজারের বটুকনাথ পণ্ডিতের নিকট যে শালগ্রাম ছিল, তা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষের এ্যাটর্ণি-ব্যারিস্টারের পরামর্শক্রমে হাইকোর্টের বারান্দায় নীত হয়। সেই সময় ভুবনমোহন দাস* *Brahmo Public Opinion* নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কাগজে নরিসসাহেবের কাজের সমালোচনা করে ১৮৮৩ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে কিছু লিখেছিলেন। অতঃপর ২৪শে এপ্রিলের 'বেঙ্গলী'তে সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। সেইসব সমালোচনার কোনো প্রতিবাদ তখন হয়নি। ২৬শে এপ্রিল তারিখে ভুবন-মোহনের কাগজে আবার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর ২৮শে এপ্রিল 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় হাইকোর্টে শালগ্রাম-আনয়ন ব্যাপার নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঐ সম্পাদকীয়টি রচনা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ যে সনাতনী হিন্দু ছিলেন, তা নয়। বরং তিনি ছিলেন ঘোরতরভাবে পাশ্চাত্য-সংস্কারাপন্ন। তাঁর শিক্ষালাভ আদ্যোপান্ত ইংরেজদেরই নিকটে। পিতা দুর্গাচরণের কাছ থেকে তিনি যেসব শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাতে হিন্দুয়ানীর সম্পর্ক ছিল বলে বোধ হয় না। পিতার কাছ থেকে হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে পুত্র কোনো শিক্ষাই পান নি। হিন্দুধর্ম-সম্পর্কীয় আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবার অবসরও সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। মেজাজে ও আচারে যদিও তিনি 'সাহেব' ছিলেন, তথাপি, "হিন্দুত্ব-গৌরবের অনুভূতির ফলে, নিজত্বের প্রতি আস্থাবলে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা জনসাধারণগত স্বত্বের বহুমূল্যতা-জ্ঞানে হিন্দু-সমাজের মর্মস্পর্শী বেদনা" তিনি যে প্রাণের মধ্যে অনুভব করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। ২৮শে এপ্রিলের ঐ সম্পাদকীয়টি রচনার হেতু ইহাই।

সমকালীন 'সখা' (প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত) ও 'সময়' (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত) পাঠে জানা যায় যে, 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় 'বেঙ্গলী'-র ঐ রচনা উদ্ধৃত করা হয় এবং 'ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদক মন্তব্য করেন যে—

---

* ইনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ও ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠ সহোদর ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতা।

"বেঙ্গলীর রচনাটির দ্বারা হাইকোর্টের অবমাননা করা হয়েছে।" মহামান্ত হাইকোর্ট ২রা মে তারিখে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক রামকুমার দে-র নামে রুল (Rule) জারি করবার অনুমতি দিলেন। ৩রা মে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় রুল জারি হোল। রুলের মর্ম: "আদালতের অবমাননা করা অপরাধে কেন জেলে যাইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।"

রুল জারি হবার পর সুরেন্দ্রনাথ (তিনি নিজে তখন অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট—১৮৮২ সালে তিনি এই পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯০৬ পর্যন্ত চব্বিশ বছর ধরে এই পদে সমাসীন ছিলেন) স্বলিখিত মন্তব্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অনুসন্ধানে জানতে পারলেন যে, 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় হাইকোর্টে শালগ্রাম আনার ব্যাপার নিয়ে যা আলোচিত হয়েছিল তাতে বিচারপতি নরিসের ওপর দোষারোপ করার কোনো সঙ্গত কারণই বিদ্যমান ছিল না; যেহেতু—বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কয়েকজনের পরামর্শ নিয়েই নরিস সাহেব হাইকোর্টে শালগ্রাম আনিয়েছিলেন। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় তখন হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার বা দোভাষীর কাজ করতেন। তিনি হিন্দু, কিন্তু হিন্দুসমাজের গণ্যমান্য কেউ নন। নরিস সাহেব তাঁরই পরামর্শ নিয়েছিলেন। অথচ রমেশচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অথবা মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এঁদের কারো পরামর্শ নিলে হয়ত হিন্দু-সমাজের মর্মপীড়াদায়ক এই ঘটনাটি ঘটত না। শালগ্রাম হিন্দুসমাজের পরমারাধ্য। হাইকোর্টে ইহা আনয়ন করা যে সঙ্গত হয়নি, তা সেদিনের বাংলার বিক্ষুব্ধ হিন্দুসমাজের প্রবল অভিমতের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল। সিভিলিয়ানের চাকরি থেকে পদচ্যুত হওয়ার মতো সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করা এবং সেজন্য মানহানির দায়ে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হওয়া আর একটি প্রধান ঘটনা। সমকালীন বাংলার জাতীয়জীবনেও ইহা একটি প্রধান ঘটনা। তাঁর সুতীক্ষ্ম মন্তব্যে জজ নরিসকে তিনি ইংলণ্ডের কুখ্যাত জজ জেফ্রিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

৫ই মে তারিখে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। এত কম সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করা কষ্টকর ছিল সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে। ব্যারিস্টার

মনোমোহন ঘোষ তখন রোগে শয্যাগত। ইংরেজ ব্যারিস্টাররা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে অসম্মত হোলেন। অবশেষে তাঁর বন্ধু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে সম্মত হোলেন এই শর্তে যে, সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং মন্তব্যটি প্রত্যাহার করবেন। এই মামলায় সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এ্যাটর্ণি ছিলেন গণেশচন্দ্র চন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হোলেন, কারণ ঐ তুলনামূলক মন্তব্যটি যে আদৌ সমীচীন হয়নি তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ৫ই মে আদালতের ফুলবেঞ্চে বিচার আরম্ভ হোল—প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ, মিঃ কানিংহাম, মিঃ ম্যাকডোনেল, রমেশচন্দ্র মিত্র এবং স্বয়ং মিঃ নরিশ—এই পাঁচজনকে নিয়ে ফুলবেঞ্চ গঠিত হয়। সম্পাদক ও মুদ্রাকর দুজনেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যে কতবড় লোকপ্রিয়, এই মোকদ্দমায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। কলিকাতা শহরে তথা সমগ্র বাংলাদেশে সেদিন এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তার তুলনা বিরল।

বিচারের দিন আদালতে লোকারণ্য। ছাত্রদের ভিড়ই বেশী ছিল। অধ্যক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা পর্যন্ত হাইকোর্টে ভীড় করেছিল। স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। অনেক ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "হাইকোর্ট ও ইডেন গার্ডেনের মধ্যস্থিত ঝাউগাছগুলির ডাল ভাঙ্গিয়া কোন কোন ছাত্র আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়াছিল।" বিচারের দিনে পাইকপাড়ার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ একলক্ষ টাকা নিয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন—যদি জরিমানা হয় ঐ টাকা দিয়ে তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রনাথকে খালাস করে আনবেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন বারাকপুরের সন্নিহিত মণিরামপুরে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। মোকদ্দমার দিন সকালে তিনি বারাকপুর থেকে কলিকাতায় এলেন। আসবার সময় সহধর্মিণীকে বলেছিলেন: "সম্ভবতঃ আমার প্রতি কারাবাসের আদেশ হবে।" এইজন্য তিনি বিছানাপত্র ও জেলে পড়বার জন্য কতকগুলি বই সঙ্গে করে কারাবাসের জন্য প্রস্তুত হোয়েই এসেছিলেন।

বেলা সাড়ে দশটা। নির্ধারিত সময়ে সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে হাজির হলেন। আদালতের সামনেই ছাত্রেরা তুমুলভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালো। তিনি যে তাদের হৃদয়-দেবতা। সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। দৃপ্ত ভঙ্গিতে সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন আসামীর কাঠগড়ায়। বিচার আরম্ভ হোল। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমবেত দর্শকবৃন্দ প্রধান আসামীর জবানবন্দী শুনলো। সুরেন্দ্রনাথ বললেন: "মুদ্রাকর আমারই আদেশে ছাপার কাজ করে থাকে। সুতরাং তার কাজের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আমি কর্তব্যবোধে সাধারণের হিতের জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলাম এবং যে সংবাদের উপর ভিত্তি করে তা করেছিলাম তা আমি সত্য বলে মনে করেছিলাম। আদালতের অবমাননা করবার জন্য বা বিচারপতি মিঃ নরিশের মনে ক্লেশ দিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। সরল বিশ্বাসে অভ্রান্ত মনে করে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম, এখন তা আমি অকপটে প্রত্যাহার করছি।"

রায়ে আসামীর প্রতি দুইমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। বিচারপতি রমেশ মিত্র স্বতন্ত্র রায় দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, আসামীকে জরিমানা করলেই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রায় দিয়ে বিচারপতিগণ এজলাস ত্যাগ করলেন। ক্রমে এজলাস জনশূন্য হোয়ে গেল। আদালতের বাইরে হাজার হাজার লোক বিচার-ফল শুনবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা যখন শুনল যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে, তখন তারা ক্রোধে ও ক্ষোভে উত্তেজিত হোল। আদালতের ফটকে জেলখানার ভ্যান অপেক্ষা করছিল—সেই গাড়িতে চড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু বিপুল জনসঙ্ঘের উত্তেজনা লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হোলেন; বিচারপতিদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ দিয়ে তাঁকে হাইকোর্টের বাইরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয় এবং ভিন্ন পথে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন সর্বপ্রথমে যিনি জেলে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ বিহারীলাল গুপ্ত। ইনি তখন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বন্ধুর কারাবাসকে যতদূর স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করা যায় তিনি তার সকল ব্যবস্থাই করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা এই ঘটনায় যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি দণ্ডদানের নিন্দা করে উপর্যুপরি কয়েকটি সম্পাদকীয় উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবার্ট নাইট তখন 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের সম্পাদক ছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের পত্নী যখন জেলে স্বামী-সন্দর্শনে আসেন, রবার্ট নাইট-ই তাঁকে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কারাদণ্ড হওয়ার পর সুরেন্দ্রনাথ অবৈতনিক বিচারপতির পদ পরিত্যাগ করে গভর্ণমেন্টের কাছে একখানি পত্র লেখেন। কিন্তু লর্ড রিপনের আদেশে, বাংলা সরকার তাঁর পদত্যাগ নামঞ্জুর করেন। কাজেই তাঁকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকতে হোল। দণ্ডিত আসামীর প্রতি এই মর্যাদা প্রদর্শন এইদেশে এই প্রথম।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড সেদিন কেবল কলিকাতা ও বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতে একটা বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। কলিকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যেই বিক্ষোভটা সবচেয়ে প্রবল হোয়ে দেখা দিয়েছিল। বস্তুত বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে ছাত্র-বিক্ষোভের সূচনা এই সময় থেকেই। আদালত গৃহের জানালার সার্সির কাচ ভাঙা ও পুলিশের ওপর ঢিল নিক্ষেপ করা—এসবই সেদিন ঘটেছিল। সমগ্র দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সেদিন এই তীব্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধ কী রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল এবং সেই বিচারের অনিবার্য ফলস্বরূপ সমগ্র দেশবাসীর চক্ষে সুরেন্দ্রনাথ কিভাবে একদিনেই hero ও martyr হোয়ে উঠেছিলেন—সে ইতিহাস কি ভুলবার? ১৮৮৩ সালের এই বিচার ও কারাদণ্ড দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলো একশো আট বছর আগের অনুরূপ একটি ঘটনা—মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী। সেদিন, ১৭৭৫ সাল, মাত্র কয়েকটি তুচ্ছ অভিযোগে ব্রাহ্মণ নন্দকুমার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মেকলে এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "The feeling of the Hindus was infinitely stronger. They were indeed, not a people to strike one blow for their countrymen, but his sentence filled them with sorrow and dismay." সেই বিক্ষুব্ধ

মনোভাব—সেই sorrow and dismay দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথের বিচার ও কারাদণ্ডের সময়েও।

৮ই মে তারিখের সাপ্তাহিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় 'The Contempt Case' শীর্ষক যে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয়টি বেরিয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল: "The action of the High Court in the case of the editor of the *Bengalee* requires to be considered from various points of view. The whole occurrence is deeply to be regretted, and a prosecution of this unusual kind, ending in a sentence of some severity, against a popular Bengalee editor, is likely to exasperate feelings already too bitter... Under what law then, can the court inflict a penalty of two months' imprisonment, without the option of a fine, when the offence happens to be committed outside the Court?" কিন্তু 'স্টেটসম্যান' এর চেয়েও গুরুতর মন্তব্য করেছিল। ফুল-বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় সদস্যদের খুব সুনজরে দেখতেন না, তাঁর যেন একটা প্রচ্ছন্ন জাতক্রোধ ছিল এঁদের ওপর। তাঁর রায়ে তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'স্টেটসম্যান' তাই লিখলো: "And unfortunately the Chief Justice has allowed an allusion to slip into his judgment which, we are afraid, will be regarded as a link of connection between the case and the political controversy What evil genius led Sir Richard Girth to drag into his judgment an uncalled for reference to the fact that the accused was once a member of the covenanted Civil Service?" প্রধান বিচারপতির এই অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত উক্তির লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথ উপলক্ষ মাত্র ছিলেন—এই কথাটাই সেদিন সকলের কাছে পরিষ্কার হোয়ে গিয়েছিল।

শুধু সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা নয়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক

রবার্ট নাইট সুরেন্দ্র-গৃহিণীকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য স্বয়ং তাঁর গাড়ি করে জেলে নিয়ে যেতেন। একজন ইংরেজ সম্পাদকের এই মহৎ আচরণ সত্যই প্রশংসণীয়।

তখনকার আর একটি সংবাদপত্রে এই উপলক্ষে লেখা হয়েছিল। "It is no exaggeration to say that there is scarcely any remarkable town in India that has not echoed the sound of sorrow, sympathy and indignations and we are strictly within the limit of truth when we say that there is scarcely an educated community in India that has not contributed its mite to swell the universal chorus, nay, the masses proverbially inert and indifferent as to the outside world, have spoken and made signs. Nay our ladies have not been slow in signifying their heartfelt sympathy with the wife of the illustrious husband in her hours of grief and sorrow. The rich and the poor, the young and the old, the high and the low—all of one mind and of one voice." *

সুরেন্দ্রনাথের যেদিন জেল হয়, সেদিন বেথুন স্কুলের ছাত্রীরা পর্যন্ত ফ্রকের উপর চওড়া কালো ফিতের 'বো' বেঁধে স্কুলে গিয়েছিল। স্কুল-কলেজের ছেলেরাও বুকে কালো ফিতের ফুল লাগিয়েছিল। স্পষ্টত একটা সর্বজনীন বিক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল; শহরে দেশীয়গণের দোকান-পাট বন্ধ হয়েছিল, কাজ-কারবার স্থগিত রাখা হয়েছিল। এর জন্য কোনোরকম আন্দোলন করতে হয়নি, আবেদনও জানাতে হয়নি। সবটাই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। শহর ও মফঃস্বলের সর্বত্র প্রতিবাদসভার আয়োজন হয়েছিল; সে-সব সভায় জনসমাগম এত হয় যে কোনো সভাগৃহই সেজন্য পর্যাপ্ত বলে মনে হয়নি। উন্মুক্ত স্থানে সভা করতে হয়। তখন থেকেই হাটে মাঠে—ফাঁকা জায়গায় সভা করবার রীতিটা আরম্ভ হয়। এই বিক্ষোভ প্রকাশ কেবল যে শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নিম্নস্তরের জনসাধারণও এতে যোগ দিয়েছিল। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের

* *Indian Empire*, May 20, 1883

ফলে যেরকম দেশব্যাপী আন্দোলন ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল তা সেদিন সত্যই অভূতপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত ছিল। শুধু কি উত্তেজনা? জাতীয়তার তীব্র অনুভূতি জেগে উঠলো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে। এই উত্তেজনা আর অনুভূতি আরো তীব্র, আরো ব্যাপক হোয়ে উঠলো যখন এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্র সেন এক পয়সা দামের 'সুলভ সমাচার' বের করলেন আর যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্র যথাক্রমে বের করলেন 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'। এই সব কাগজ হাজার হাজার লোক পড়তে লাগল। মোট কথা, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করল। এইটাই ছিল আমাদের প্রত্যক্ষ লাভ। এর প্রয়োজনও ছিল সেদিন।

এই যে জাগরণের উন্মেষ—এর শিক্ষাটা কি ছিল? আমরা সবাই বুঝলাম এইবার নূতন ইতিহাস লিখবার সময় এলো। সুরেন্দ্রনাথের এই কারাদণ্ডের ফলে দেশব্যাপী যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার বিররণ আরো একটু এখানে দিই। "সেদিন পথে ঘাটে হাটে বাজারে রেলে স্টীমারে, অফিসে প্রাসাদে, সর্বত্রই সুরেন্দ্রনাথের কথা। অতঃপর নগরে নগরে, পাড়ায় পাড়ায় সে আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই সুরেন্দ্র-কারাদণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে ভারতে এক সাড়া পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্র-কারাবাসে ব্যথিত হইয়া, কবি-রবির সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ফ্রি চার্চ কলেজে বক্তৃতা করেন।* কৃষ্ণনগরে রায় যদুনাথ বাহাদুর, প্রসন্নকুমার বসু, রামগোপাল সান্যাল, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিতমণ্ডলী কৃষ্ণপতাকা উঠাইয়া কৃষক ও মুটে মজুরের সহিত একত্র হইয়া সভার উপর সভা করিয়া, সুরেন্দ্র-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রসম্প্রদায় কৃষ্ণবর্ণের ফিতা গ্রহণ করিয়া শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার 'রেইস এণ্ড রাইয়ত' (এর সম্পাদক ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ও বোম্বাইয়ের

---

* শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ডে লেখা হয়েছে যে, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের সময়ে কবি কারোয়ারে অগ্রজের কাছে ছিলেন, তাই তখন তিনি এই বিষয়ে নীরব ছিলেন।

'ইন্দু প্রকাশ' পত্র সুরেন্দ্রের শোকে কৃষ্ণরেখাঙ্কিত শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া পাঠকসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল। পাইকপাড়ার ধনকুবের, তেজস্বী রাজকুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ময়দানে বিরাট সভায় সভাপতিরূপে এবং পীড়িত, দুর্বল অশীতিবর্ষবয়স্ক পলিতকেশ খ্রীষ্টান পাদ্রী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পীড়ার যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া, বিজ্ঞানময়জীবন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সামান্য বেশে লোকতরঙ্গের সহিত মিশিয়া, জনসাধারণের ঠেলাঠেলিতে থাকিয়া, সভায় যোগদানপূর্বক সুরেন্দ্র-কারাবাসে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য স্বাধীনচেতা সৈয়দ আমেদ মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া এক মহতী সভার আহ্বান করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ...সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে মহামতি লর্ড রিপনের নিকট প্রায় পাঁচশত টেলিগ্রাম গিয়াছিল। তাঁহার হিতৈষিগণ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন।"*

উদ্ধৃতি আর বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কলিকাতা ও বাংলাদেশে যেসব পত্র-পত্রিকায় এই ঘটনা উপলক্ষে মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল সেগুলির মধ্যে 'স্টেটসম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সাপ্তাহিক অবতার', 'বৈষয়িক তত্ত্ব', প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা', শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সঞ্জীবনী', দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাহ', 'নব-বিভাকর' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তো এই উপলক্ষে একখানি ছোট-খাটো প্রহসন রচনা করে ফেলেছিলেন। এমন কি 'সুরেন্দ্র-বিজয়' নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কাব্য পর্যন্ত এই উপলক্ষে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রকাশক ছিলেন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। সমকালীন ইতিহাসে ঠিক এই রকম উত্তেজনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন; তাঁরই 'মিরারে' এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৯শে মে যে জনসভা হয় তাতে একটি প্রস্তাবের

---

* 'কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ': সূর্যকুমার ঘোষাল।

স্থলে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন আর সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার মন্মথকুমার মল্লিক। দেশবাসী একদিকে সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির জন্য চাঁদা দিতে লাগলেন এবং অন্যদিকে দেশের মঙ্গলের জন্য একটি 'ন্যাশনাল ফণ্ড' স্থাপন করে এই তহবিলে টাকা সঞ্চয় করতে লাগলেন। ৪ঠা জুলাই, সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির দিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'ন্যাশনাল ফণ্ড' স্থাপিত হয়। বাগ্মী লালমোহন ঘোষ সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করবার জন্য বিলাত ছুটলেন। কিন্তু প্রিভি-কাউন্সিল হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন।

৪ঠা জুলাই, ১৮৮৩।

সুরেন্দ্রনাথের আজ কারামুক্তি। ৩রা জুলাই মঙ্গলবার জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ল্যারিমোর* তাঁর কাছে এসে জানালেন, আগামী কাল ৪ঠা জুলাই বুধবার প্রাতে ছয়টার সময় কারাগার থেকে আপনার মুক্তিলাভ হবে; আপনি প্রস্তুত হোয়ে থাকবেন। চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্স সাহেব স্বয়ং জেলে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চাইলেন যে, তাঁর মুক্তি উপলক্ষে তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ কিরকম আয়োজন করবেন?—"আমি কেমন করে বলব," উত্তর দিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর মুক্তির সময়েও তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "যেদিন সুরেন্দ্রনাথের খালাস পাইবার কথা, সেইদিন অতিপ্রত্যুষে হাজার হাজার লোক প্রেসিডেন্সী জেলের অভিমুখে যাত্রা করে। উহা তখন হরিণবাড়ি জেল নামে অভিহিত ছিল এবং গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিকট উহা অবস্থিত ছিল। সেদিন শেষ রাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে। আমরা ভিজিতে ভিজিতে জেলের ফাটকের নিকট পৌছিয়া কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাকে রাত্রি থাকিতেই মুক্তি দিয়া গাড়ি করিয়া তালতলায় তাঁহার পৈতৃক বাড়িতে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন আবার জনতা তালতলার অভিমুখে রওনা হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথের গৃহ জনাকীর্ণ, আর স্থান নাই; তাঁহার বন্ধু আনন্দমোহন বসু বক্তৃতা করিতেছেন।"

---

* সুরেন্দ্রনাথ ও ল্যারিমোর দুজনেই একসঙ্গে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন।

সেইদিনই প্রেসিডেন্সী ইনষ্টিটিউসনে (রিপন কলেজের তথনকার নাম) ছাত্রদের এক সভায় সুরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করা হয়। হাইকোর্টের উকিল ও ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র দাস ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহনের জীবনচরিতকার) 'কতকাল পরে' গানটি ঐ সভায় সেদিন গেয়েছিলেন এবং বক্তৃতাও করেছিলেন। শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে প্রায় একশত টাকা মূল্যের দোয়াত, কলম ও বই উপহার দিলেন। বইগুলি সবই য়ুরোপের বিখ্যাত দেশহিতৈষীর জীবনচরিত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে সংযুক্তভাবে যে অভিনন্দন তাঁকে দেওয়া হয়, তাতে এক স্থানে বলা হয়েছিল: "We trust that your patriotic heart has found ample consolation in the fact that your detention in jail has been the means of at least partially realising one of your most cherished wishes, namely, the eliciting of a united voice from your countrymen for a public cause."

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর এই কারাদণ্ড সম্পর্কে আত্মচরিতে দাবী করেছেন যে, তিনিই প্রথম উচ্চপদস্থ ভারতীয় যিনি জনসাধারণের কাজে সর্বপ্রথম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কথাটি ঠিক নয়। আধুনিক কালে এই দাবী একজনই করতে পারেন—তিনি লোকমান্য টিলক। জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করে ১৮৮২ সালে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবে এ কথা ঠিক যে, সুরেন্দ্রনাথের এই কারাদণ্ডে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বভারতীয় যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, টিলকের ক্ষেত্রে তেমন কিছু দেখা যায়নি। যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকে জাতির অন্তরের বীণার তারে ঐক্যের যে সুর ঝঙ্কৃত হোতে থাকে, তারই মধ্যে আভাসিত হয়েছিল আগামী দিনের নূতন ইতিহাস আর জাতীয়তাবোধের এক নূতন প্রাণ-চাঞ্চল্য। সেই ইতিহাসের নায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ আর সে প্রাণ-চাঞ্চল্যের স্রষ্টাও ছিলেন তিনি। মাইকেলের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলাদেশ যখন শোকাচ্ছন্ন হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে, "ইহা আশার কথা, বাঙালী আজ কাঁদিতে শিখিয়াছে।" কান্নার মধ্যে মহত্ব নেই, যদি না সকলে মিলে কাঁদে—এটাই বোধহয় বঙ্কিমের আসল বক্তব্য ছিল। একটা জাতির

সংহতি-বোধের পরিচয় আমরা তখনি পাই যখন দেখি জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে উঠে কোন একটা জাতীয় ব্যাপারে এক মন এক প্রাণ হোয়ে তার অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করতে শিখেছে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড উপলক্ষে এই একতার ভাবটাই সেদিন আচমকা কেবলমাত্র বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রত্যক্ষ হোয়ে উঠেছিল।

॥ নয় ॥

এইবার আমরা সুরেন্দ্রনাথের জীবনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করব।

তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি যেমন কর্মবহুল তেমনি গৌরবোজ্জ্বল। এই পর্বের সুরেন্দ্রনাথ 'সম্রাট সুরেন্দ্রনাথ,' জাতির মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ, কংগ্রেসের প্রধানতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনের এই পর্বেই আমরা দেখতে পাই তাঁর সর্বভারতীয় খ্যাতি আর তাঁর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। সে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ভারত মহাসমুদ্র অতিক্রম করে টেমস নদীতে পর্যন্ত তরঙ্গ তুলেছে আর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে করেছে রীতিমত সচকিত। এই পর্বের সুরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর স্বজাতির চক্ষে প্রকৃতই হোয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাজনৈতিক মুক্তির প্রতীকস্বরূপ। মোট কথা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা সবকিছু সেদিন এই একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর জীবনচরিত আলোচনায় তাঁর জীবনের এই অধ্যায়-টির বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর ভারত-সভায় যেমন কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল, তেমনি তিনিও পূর্ণোদ্যমে স্বদেশবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ-সঞ্চারের কাজে প্রবৃত্ত হোলেন। 'ন্যাশনাল ফণ্ড' স্থাপন এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ভারতবাসীর প্রদত্ত চাঁদায় একটি স্থায়ী ভাণ্ডার গঠনের প্রয়াস এই প্রথম। পরবর্তীকালে ইহারই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 'টিলক স্বরাজ ফণ্ড', যা টিলকের মৃত্যুর পর স্থাপিত হয়েছিল। এই 'ন্যাশনাল ফণ্ড' স্থাপন থেকে স্পষ্টতই বুঝা গেল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্যসত্যই একটা জাগরণ এতকাল বাদে দেখা দিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আমাদের জাতীয়জীবনে যে কতদূর ব্যাপক হয়েছিল সেইকথা বলতে গিয়ে আনন্দমোহন বসু এই সময়ে লিখেছিলেন: "That good cometh out of evil was never more fully illustrated than in this notable event. It has now been demonstrated, by the

universal outburst of grief and indignation which the event called forth, that the people of the different Indian provinces have learnt to feel for one another ; and that a common bond of unity and fellow-feeling is rapidly being established by them. And Babu Surendranath Banerjea has at least the consolation, that his misfortune awakened, in a most marked form, a manifestation of that sense of unity among the different Indian races, for the accomplishment of which he has earnestly striven and not in vain."* আনন্দমোহনের এই সুচিন্তিত উক্তির প্রত্যেকটি কথা অনুধাবনযোগ্য। তিনি আরো বলেছিলেন :

"It has been demonstrated that people of different provinces have learnt to feel for one another ; that a common bond of unity and fellow-feeling is being rapidly established," সেদিন পরাধীন ভারতবর্ষে যা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা তা বুঝি হারাতে বসেছি।

দেখা গেল, সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতির জীবনে 'শাপে বর' হয়েছিল, তেমনি তাঁর এই কারাদণ্ডকে উপলক্ষ করেই সেদিন দেশব্যাপী যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তারই ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হোতে চাইলো এক বিপুল ঐক্যবোধ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস যাঁরা সচরাচর আলোচনা করে থাকেন তাঁরা এই ঘটনাটিকে আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাসে কেন যে একটি বড় রকমের দিক-পরিবর্তন বা 'turning-point' বলে স্বীকার করেন না, তা আমাদের নিকটে একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলেই প্রতিভাত হয়। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—জন্মভূমির প্রতি এই মমত্বপূর্ণ অনুরাগ ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালীজাতির অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি, এ কথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই

* Report of the Indian Association, 1883.

বলব। এ বৃত্তি বাঙালীর স্বাভাবিক, চেষ্টার্জিত বস্তু নয়, এই কথাটা সকলের আগে স্মরণ রাখা দরকার। মাতৃভূমির প্রতি তার চিরকালই একটা সহজ মমত্ব ও আকৃতি দেখা গিয়েছে, যা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক পরে দেখা গিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে যাও, দেখতে পাবে এই মমত্ব ও আকৃতিই বাঙালীকে যুগে যুগে সর্বস্বপণ ও আত্মবলিদানের দুর্জয় প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই সুমহৎ ও প্রাণপাতী বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে গ্রথিত হোয়ে বাঙালীর দেশাত্মবোধকে একটা আশ্চর্য মহিমাদীপ্তিতে ভাস্বর করে রেখেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরাই সেই ইতিহাসের কোনো সন্ধান রাখি না। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে শুধু বলেছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি; আমরা বলব, বাঙালী আত্মবিস্মৃত ও আত্ম-প্রবঞ্চিত জাতি। যাক্ সে কথা।

বাঙালীই শিখিয়েছে দেশপ্রেম জিনিসটা উচ্ছ্বাস নয়, ভক্তি। হৃদয়ে দেশ-মাতৃকাকে আরাধ্যাদেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে জীবন-অর্ঘ্যকে তাঁর চরণে ভক্তিপূর্ণচিত্তে নিবেদন করে দিয়ে দেশসেবার তপস্যাই একদিন বাঙালী বরণ করেছিল। বাঙালীর Patriotism সামান্য জিনিস নয়—প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বধর্মপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম, এই তিনটি জিনিসের সমাবেশে পূর্ণতা লাভ করেছিল। ভারতের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে প্রাণ দিয়ে স্বীকার করেই সার্থক হয়েছে বাঙালীর স্বদেশপ্রেম। এই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তির উপরেই রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর রাষ্ট্রপ্রেমকে একটা নূতন ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ সবাই ছিলেন এই পথের পথিক। ভারতীয় জাতির যুগ-যুগবাহী জীবনধারাকে এঁদের কেউই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবার চেষ্টায় বিভ্রান্ত হননি। মাতৃসাধনার সিদ্ধমন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বাঙালীর দেশপ্রেম। সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম হোমাগ্নির মতোই পবিত্র। তাঁর সেদিনকার অনন্যলব্ধ নেতৃত্বের রহস্য ইহাই। প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ্য। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ঐ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লেখা শেষ করেন ও উহা প্রকাশ করেন। বাংলার জাতীয়তাবোধের ইতিহাসে এই দুটি ঘটনাই মনে রাখবার মতো।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ও সেইসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হবার পর দেশাত্মবোধ যেন বাঙালীর অন্তরে স্থায়ী আসন নিলো। অতঃপর

সুরেন্দ্রনাথ পূর্ণোত্থমে দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন এবং স্বজাতির হৃদয়ে দেশাত্মবোধ সঞ্চারে প্রবৃত্ত হোলেন। সেদিন তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র জাতি পরিচালিত হবার জন্য যেন উন্মুখ ছিল। সেদিনের সুরেন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কারো কারো মুখে শুনেছি, তিনিই যেন তখন দেশপ্রেমের একটি ভাস্বর প্রতীকস্বরূপ হোয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শাসকজাতির দৃষ্টি তখন থেকে তাঁর উপর যেমন নিবদ্ধ হোতে থাকে, তেমনি দেশের লোক তাঁরই নেতৃত্বে এক-মন এক-প্রাণ হোয়ে সমবেত হোতে চাইল। বাংলার সেই সদ্য-জাগ্রত প্রাণ-প্রবাহকে ভগীরথের মতোই শঙ্খধ্বনি করে তার গন্তব্যস্থলে পৌছে দেবার কাজে এইবার সুরেন্দ্রনাথ পূর্ণোত্থমে অগ্রসর হলেন।

১৮৮৩, ১৭ই জুলাই।

স্থান : উত্তর কলিকাতায় অনাথবাবুর বাজার।

এইদিন এইখানে একটি বিরাট সভায় কলিকাতাবাসিগণ সুরেন্দ্রনাথকে বিরাটভাবে সম্বর্ধনা করলেন। এই সভায় তিনি সর্বপ্রথম 'ন্যাশন্যাল ফণ্ড' সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল বাবদ টাকা খরচ হয়েও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেন সভায় ঐ টাকা যখন সুরেন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করেন তখন তিনি সেই টাকা গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ উহা 'জাতীয় ধন ভাণ্ডারে' দান করলেন এবং বললেন,—"ইতিহাসে মাঝে মাঝে আমাদের অতি আশ্চর্য ঘটনার মুখোমুখী হোতে হয়। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। ভারতবর্ষ আজ ইতিহাসের সেইরকম একটি ঘটনার মুখোমুখী হয়েছে, যে ঘটনা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের রাজপথে নিয়ে যাবে।' ঐ সভায় আরো দুজন ব্যক্তি বক্তৃতা করেন, যথা—রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কালীচরণ ও নগেন্দ্রনাথের প্রাণ-মাতানো বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন তৎক্ষণাৎ ঘড়ি ও চেন 'ন্যাশনাল ফণ্ডে' দান করেন ও কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা উকিল তারাপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় নগদ একশত টাকা দান করেন। এই তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের স্মৃতিকে জাতির মনে স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরে একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন : "ইহাই প্রথম 'জাতীয়

ধনভাণ্ডার' (National Fund) স্থাপনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। অতঃপর ইহারই আদর্শে অনেক স্থলে 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' স্থাপিত হইয়াছিল। মোট কুড়ি হাজার টাকা তখন উঠিয়াছিল। সংগৃহীত এই অর্থ রাজনৈতিক কর্মের উন্নতিসাধনের জন্য ভারত-সভার হস্তে প্রদান করা হয়।"

অতঃপর এই 'ন্যাশনাল ফণ্ডে'র বৃদ্ধিসাধনে তৎপর হোলেন সুরেন্দ্রনাথ। 'জাতীয় ধনভাণ্ডারে'র প্রাথমিক প্রয়াস ও পরিকল্পনাকে একটা স্থায়ী রূপ দেবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ এইবার অগ্রণী হোলেন। একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এইবার আরম্ভ হোল। ১৭ই জুলাই টাউন হলে আর একটি সভা হোল। এইদিনকার সভায় দশহাজার লোক উপস্থিত ছিল। আশীবছর আগে এই শহরে একটি সভায় দশহাজার লোকের সমাবেশ বড়ো কম কথা নয়। জাতীয়তাবোধ যে সেদিন একটি প্রত্যক্ষ শক্তিরূপেই বাঙালীর হৃদয়ে জেগেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই সভাতেই স্থির হয় যে, রাজনৈতিক উন্নতিলাভের জন্য ইংলণ্ডে ও ভারতে বৈধ আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'ন্যাশনাল ফণ্ড' স্থাপনের সংবাদ সেদিন সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সমাজে একটা রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুললো এবং দেখা গেল যে সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতীয় অনুভূতির স্পন্দনও ভারতের সকল প্রদেশে সঞ্চারিত হোল। এ কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যে সেদিন বাংলাদেশই সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই ভাব ও শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী হয়েছিল। বাঙালি সাগ্রহে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহযোগিতালাভের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এরই পরিণতি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশ-ব্যাপী এই যে জাতীয় অনুভূতি, একে পরোক্ষভাবে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল এইসময়কার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহাই ইলবার্ট বিল আন্দোলন। ভারতীয়েরা সিভিল সার্ভিস পাশ করে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ হোয়েও ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমতুল্য অধিকার পেতেন না। এমন কি, গর্হিত অপরাধে অপরাধী শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচারের অধিকার পর্যন্ত দেশীয় সিভিলিয়ানদের ছিল না। লর্ড রিপন তখন বড়লাট। তিনি এই অদ্ভুত নিয়ম পরিবর্তন করতে চাইলেন এবং তাঁর আইন সচিব স্যর চার্লস ইলবার্ট

আইনসভায় এক বিল উপস্থিত করলেন। ইহাই ইলবার্ট বিল। শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রবল বিরোধিতার ফলে বিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শ ক্রমে তাঁর বন্ধু বিহারীলাল গুপ্ত হাওড়ার জজ থাকাকালীন যে মন্তব্যলিপি বাংলা সরকারকে লিখে পাঠান তারই ফলে এই ইলবার্ট বিলের উদ্ভব। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাদের স্বার্থরক্ষার ও বিশিষ্ট অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার উদ্দেশ্যে দেড়লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছিল। তাদের সমবেত শক্তি ও অর্থ তাদের সাফল্যের হেতু হয়েছিল। সকল প্রদেশের শিক্ষিত ভারতবাসী এ জিনিসটা লক্ষ্য করলেন। সংঘবদ্ধ শক্তির মূল্য তাঁরা সেই প্রথম অনুভব করলেন। Agitation বা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মহা অস্ত্র, তা বাঙালী সেই প্রথম বুঝলো। এর ফলে শিক্ষিত সমাজে যে চেতনা দেখা দিলো, তাই সেদিন আমাদের রাজনৈতিক জীবন বিকশিত হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন কলিকাতার ব্যারিস্টার ব্রানসন আর এই বিলের স্বপক্ষে ভারতবাসী যে আন্দোলন করেছিল তার নেতৃত্ব করেছিলেন লালমোহন ঘোষ। বিপিনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, এই ব্রানসন সাহেবই সেদিন ঢাকায় যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তা বিস্ফোরকের কাজ করেছিল। উক্ত বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও ভারতবাসীর চরিত্র সম্পর্কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এর সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন লালমোহন। ঐ ঢাকা শহরেই তিনি এক বক্তৃতায় ব্রানসনকে কিভাবে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন, সমসাময়িক বিবরণ থেকে তা জানা যায়। লালমোহনের এই বক্তৃতার ফলেই কলিকাতার সলিসিটাররা একযোগে সেদিন ব্রানসনকে 'বয়কট' করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "The Ilbert Bill controversy helped to intensify the growing feeling of unity among the Indian people...It was fruitful of results. It strengthened the forces that were speeding up the birth of the Congress movement." আর উইলফ্রিড ব্লান্ট বলেছেন : "The Ilbert Bill controversy was

a turning point in the history of India's Nationalism."* এই ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালীর বিক্ষোভ সেদিন কতদূর তীব্র হয়েছিল তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'নেভার নেভার' কবিতাটির মধ্যে। বিল যথাসময়ে পাশ হোল ; বাঙালী তথা ভারতবাসী বিস্ময়ে ও বেদনায় আর একবার তাদের অসহায়তার কথাটা অনুভব করলো। সেই বিক্ষুব্ধ অনুভূতির গর্ভেই জন্ম নিলো এক নূতন রাজনৈতিক চেতনা। এই চেতনারই প্রকাশ ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সম্মেলন। এদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় নেতাদের সম্মেলন সেই প্রথম। সত্যই এই ইলবার্ট আন্দোলন সেদিন জাতির জীবনে যেন 'শাপে বর' হয়েছিল—আমরা দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলাম। এই নবোন্মেষিত রাজনৈতিক চেতনাকেও হেমচন্দ্র তাঁর 'মন্ত্রসাধন' কবিতাটির মধ্যে রূপায়িত করে গেছেন।

ন্যাশনাল কনফারেন্স আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম তখনো হয়নি। বাংলাদেশই এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল ; সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় এই সম্মেলন আহূত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। তিনিই বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে কলিকাতায় নিয়ে আসেন এবং এ্যালবার্ট হলে তিন দিন ধরে সভা করেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত হোয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে এক জাতীয়তার স্বর্ণ সূত্রে আবদ্ধ করতে সংকল্প করেছিলেন। এর আগে কখনো নানা প্রদেশের লোকদের একত্র করে রাজনীতির চর্চা করা হয়নি। জাতীয় সম্মেলনের একটা প্রত্যক্ষ ফল এই দেখা গিয়েছিল যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—এই তুইটি রাজনৈতিক সভা তাদের পৃথক সত্তা ভুলে গিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। তরুণ ও প্রবীণে মিলে দেশের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলবার জন্য সেদিন কিভাবে বদ্ধপরিকর হয়েছিল, তার আনুপূর্বিক ইতিহাস কৌতূহলী পাঠক সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের আত্মচরিতে পাঠ করে দেখতে পারেন। বৃদ্ধ

* *India Under Ripon* : W. S. Blunt.

রামতনু লাহিড়ী আর পক্ককেশ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তরুণ আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মিলে এই যে সর্বভারতীয় সভার আয়োজন করেছিলেন, সেদিন তা বৃথা হয়নি। প্রথম দিনের সভায় আনন্দমোহন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই ন্যাশন্যাল কনফারেন্সকেই "First stage towards a National Parliament" বলে অভিহিত করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সকল রাজনৈতিক প্রয়াসে আনন্দমোহনকে পুরোভাগে রেখেই চলতেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেছিলেন রামতনু লাহিড়ী। মোট কথা, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম যে বৈঠক বসেছিল তাতে শিক্ষিত সমাজেব রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনের শক্তির আভাস বুঝতে পারা গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ করব। রবীন্দ্রনাথ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি এই নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে তো ছিলেনই, বরং সদ্যজাগ্রত দেশহিতৈষণার প্রতি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষপূর্ণ রচনা পর্যন্ত পারিবারিক 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে লিখেছিলেন "ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটার, ন্যাশনল মেলা প্রভৃতি। সম্প্রতি ন্যাশনল ফণ্ড আর একটা কথা শোনা যাইতেছে। একমাত্র পোলিটিক্যাল এজিটেসনই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল এজিটেসন করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।" একটি পরাধীন দেশে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার বিকাশের ইতিহাস-নির্দিষ্ট যেসব সোপান থাকে তারই প্রথমটি যে বৈধ আন্দোলন—এই কথাটা সেদিন রবীন্দ্রনাথ যেমন বুঝতে পারেননি, তেমনি অনেকেই বুঝতে পারেন নি।

এই সম্মেলন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "The National Conference was the reply of educated India to the Ilbert Bill agitation—a resonant blast on their golden trumpet." সম্মেলনের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, সরকারী কর্মে অধিক-সংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। সিভিল সার্ভিসের প্রচলিত নিয়মাবলীরও যথেষ্ট সমালোচনা হয় এবং এই বিষয়ে সবচেয়ে

জোরালো বক্তৃতা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সম্মেলনে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উইলফ্রিড ব্লাণ্ট; তিনি এই সম্মেলন সম্পর্কে এবং বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি সম্পর্কে লিখেছেন: "I was the only European there, and am very glad to have been present at so important an event. The meeting took place upstairs in the Albert Hall, and about one hundred persons were present. The proceedings, on the whole, went off very creditably.. But the real feature of the meeting was an attack on the covenanted civil Service by Surendranath Banerjea. His speech was quite as good a one as ever I heard in my life, and entirely fell in with my own views on the matter." এই উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেদিন একজন য়ুরোপীয় দর্শকের দৃষ্টিতে ন্যাশনাল কনফারেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই বিবেচিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন, এই দুজনের বক্তৃতাই যে উচ্চদরের বক্তৃতা হয়েছিল, ব্লাণ্ট তাঁর বিবরণের মধ্যে সে কথাও উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশে সুরেন্দ্রনাথ আবার উত্তরভারত ও পাঞ্জাব ভ্রমণে বেরুলেন। তখন প্রচণ্ড গরমের সময়। তাঁর এবারকার ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন রিপন কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ও কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি গোবিন্দচরণ দাস। এই পর্যায়ের ভ্রমণে তিনি লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, রাওলপিণ্ডি, আম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী ও বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল একই—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঙালীর সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সামরিক-জাতিগুলির বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রবীর শিবাজী একদিন সংকল্প করেছিলেন: 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' দেখা যাচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকে একই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন, একই ঐক্যের সূত্রে বাঁধতে চাইলেন আর চাইলেন বাঙালীর নরম কোমল প্রকৃতির

সঙ্গে পাঞ্জাবের ক্ষাত্রশক্তির মিলন ঘটাতে। সেই যে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স বৃদ্ধির জন্য সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত সেই আন্দোলন তিনি সমানভাবে চালিয়ে অবশেষে ইহাকে জয়যুক্ত করেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলেই একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় এবং এই কমিশনের সুপারিশক্রমেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ আর একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন ও এই নিয়ে আন্দোলনও করেন। বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলির সম্প্রসারণ প্রয়োজন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অধিকসংখ্যক ভারতবাসীর যোগদান যে বাঞ্ছনীয়, এই কথাটা তিনি বিশেষভাবে শাসকজাতির সামনে সেদিন তুলে ধরেছিলেন। ১৮৮৪ সালে রিপন বিদায় নিলেন, নূতন বডলাট এলেন লর্ড ডাফরিন। তিনি যখন দ্বিতীয়-বার ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন নিজের আপিলের মামলা নিয়ে, ডাফরিনের সঙ্গে তাঁর তখন থেকেই পরিচয়। সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তাই দেখা যায়, যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দেশের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ সব সময়ে তাঁর সঙ্গে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। একমাত্র রমেশচন্দ্র ব্যতীত এ গৌরবের দাবী সেযুগে আর কেউ করতে পারতেন না। লর্ড ডাফরিন কলিকাতায় এসে পৌঁছবার পর ভারত-সভার পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। এর মুসাবিদা করেন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই অভিনন্দনপত্রে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির সংস্কারের প্রতি বড়লাটের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হয়। কাউন্সিলের সংস্কার ভিন্ন আইন-সভায় জনমতের যথার্থ প্রতিফলন যে সম্ভবপর নয়, এই কথাটার উল্লেখ করে উক্ত অভিনন্দনপত্রে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "The reconstitution of the Provincial Legislative Council is one of those reforms which public opinion seems to demand with increasing urgency...This may safely be asserted, that the Provincial Legislative Assemblies as at present constituted, without the right of interpellation or any share in financial

management, with their official majorities, for the most part, and the non-official members owing their appointment entirely to nomination, admit of little room for the successful expression of popular opinion, and fail to command that degree of confidence which is so needful for their efficient working."

ভারতবর্ষে জনমত বিকাশের ইতিহাস যাঁরা গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন, তাঁদের কাছে এ সত্য অজানা নয় যে, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের আদিপর্বে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছিলেন। শাসনসংস্কার আর কাউন্সিলের সম্প্রসারণ এই দুটিই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয়। ভারতের জনমতকে তার ন্যায়সঙ্গত ও বিধাতৃ-নির্দিষ্ট অধিকারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই কর্মীপুরুষের একমাত্র জীবনব্রত।

॥ দশ ॥

ইতিহাসের গতিপথেই কংগ্রেসের আবির্ভাব। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল সেদিন। ক্রোচে বলেছেন, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কতকগুলি স্তর আছে এবং সেই স্তরগুলির মধ্যে একটির সহিত অপরটির নিগূঢ় সংযোগ বা পারম্পর্য থাকে—থাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা যা কার্য-কারণের ভিতর দিয়ে অবশেষে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে। এই দুর্জ্ঞেয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিবর্তনের পথ দিয়েই যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দেশে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে লর্ড লিটনের আমল থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁর সময়ে প্রবর্তিত ভার্নাকুলার প্রেস আইনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী যে অসন্তোষ ধূমায়িত হোতে থাকে, ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক জীবনগঠনে তা যে অনেকখানি সহায়তা করেছিল, সে বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশই নেই। এই সময়টাই ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্রমবিকাশের সময় এবং ভারতের রাজনৈতিক চেতনার আকাশ তখন থেকেই একটি মহত্তর আদর্শে উদ্ভাসিত হোতে আরম্ভ করে। কালক্রমে এই আদর্শ একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুখ হোল। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের শিক্ষা ব্যর্থ হোল না। এই আন্দোলন-জনিত প্রবল বিক্ষোভ ইতিহাসের উত্তপ্ত কটাহে সেদিন যে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছিল, তা বৃথা হোল না। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা হয়ে উঠলো দুর্বার আর তার ঐক্যবোধ প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। কংগ্রেসের জন্ম আসন্ন হোয়ে উঠেছিল ইতিহাসের সেই সুলগ্নেই।

কংগ্রেসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৮১-৮৫, এই চারটি বছর বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং তার পরের বছরে এই মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক মহামেলা; তারপরেই মাদ্রাজের মহাজন সভার (ইহা ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়) উদ্যোগে আয়োজিত প্রাদেশিক সভা এবং ১৮৮৫ সালের প্রারম্ভেই ফিরোজ শাহ মেহতা, ত্র্যম্বক তেলাঙ ও আব্বাস তায়েবজী প্রভৃতির নেতৃত্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা—এই কয়টি ঘটনা থেকেই বোঝা গেল যে, "India was feeling the need for some sort of an All-India organisation"—এবং এই যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কার্য-কারণের সমাবেশ, কংগ্রেসের জন্মের এইটাই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ। হিউমের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন স্থাপনের আইডিয়াটা ছিল উপলক্ষ মাত্র। উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে—ভারতবর্ষের সর্বত্রই তখন যুগপৎ জেগে উঠেছিল এক অপূর্ব ঐক্যের চেতনা। সেই চেতনার পথ দিয়েই কংগ্রেসের আবির্ভাব।

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি এর জন্মকালের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন: "It will probably be news to many that the Indian National Congress, as it was originally started and as it has since been carried on, is in reality the work of the Marquis of Dufferin when that noble man was the Governor-General of India. Mr. A. O. Hume, had in 1884, conceived the idea that it would be of great advantage to the country if leading Indian politicians could be brought together once a year to discuss social matters and be upon friendly footing upon one another. He did not desire that politics should form part of their discussion, for there were recognised political bodies in Calcutta, Bombay and Madrass and other parts of India."*

এইখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের জন্মের আগে থেকেই কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে

* *Introduction to Indian Politics* : W. C. Bonnerjee.

রাজনৈতিক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ দেশের শিক্ষিত লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ভালোভাবেই হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের এই রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন একটি মিলনভূমিতে সমবেত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। আসলে হিউমের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী একটি আধা-সামাজিক, আধা-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেখানে প্রাদেশিক গভর্ণর পৌরোহিত্য করবেন এবং সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যের ভাব স্থাপিত হবে। হিউমের এই প্রস্তাব কিন্তু ডাফরিনের মনঃপুত হোল না। তিনি বললেন, না, বিলেতে Her Majesty's Opposition-এর ন্যায় এইদেশেও একটি সরকার বিরোধীদলের বিশেষ প্রয়োজন এখন। ডাফরিন বলেছিলেন: "It would be very desirable in the interests of the English in India as well as the interests of the ruled that Indian politicians should meet yearly and point out to the Government in what respects the administration was defective and how it could be improved." কাজেই হিউমের প্রস্তাবটি ডাফরিন অনুমোদন করলেন না। অবশেষে ভারতবর্ষের তৎকালীন বিশিষ্ট জননায়কদের বিচারের জন্য যখন হিউম ও ডাফরিনের প্রস্তাব দুটি উপস্থাপিত করা হোল, তখন ডাফরিনের প্রস্তাবটাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেসের জন্মের ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।

সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় বৈঠক ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে তারিখে কলিকাতায় বসিয়াছিল। এই বৈঠকে ভারতের কয়েকটি প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এখানে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের এই বৈঠক যখন কলিকাতায় বসিতেছিল ঠিক সেই সময়ে বোম্বাই শহরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রথম বৈঠক বসে। ইহারও কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য এক ছিল। তবে উভয়ের উদ্যোগ-আয়োজন স্বতন্ত্র ছিল; এমন কি, পরস্পর পরস্পরের উদ্যোগ-আয়োজনের সংবাদ পর্যন্ত রাখে নাই। যখন উভয়ের বৈঠক উভয়স্থানে বসিবার সংবাদ প্রচারিত হইল তখন উভয়ের অস্তিত্ব উভয়ে জানিতে পারিল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের প্রথম

কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে কংগ্রেসে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু যেহেতু আমি কলিকাতার কনফারেন্সের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ও একরূপ উহার পরিচালক ছিলাম, সেই কারণে বোম্বাই কংগ্রেসে যোগ দিতে পারি নাই। কলিকাতা ও বোম্বাইতে যে দুইটি সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাদের একই উদ্দেশ্য এবং কার্যপদ্ধতিও একই প্রকার। অতঃপর আমরা সকলেই ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে যোগদান করি এবং ক্রমে ইহাই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে।"

সেইদিন থেকে কংগ্রেস ও সুরেন্দ্রনাথ এক ও অভিন্নরূপে শিক্ষিত ভারত বাসীর নিকট প্রতিভাত হোতে থাকে। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ মাত্র দু'বার কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি—এই একবার বোম্বাইয়ে ও পরে করাচীতে। ১৯১৭ সালের পর মডারেট দল যখন কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ত্রিশ বছরকাল তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা এবং এই দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে এদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষসাধন এবং বৈধ পথে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনে তিনি যে একনিষ্ঠতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই ইতিহাসই রাষ্ট্রগুরুর জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। কংগ্রেসের আদিপর্বে এর সংগঠনে আরো অনেকেরই নাম আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। দাদাভাই নৌরজী, আনন্দ চার্লু তেলাং, স্যর দীনশ ওয়াচা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুব্রমনিয়া আয়ার, বদরুদ্দীন তায়েবজী, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকমান্য টিলক, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, স্যর ফিরোজ শা মেহতা, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়রাঘবচারিয়ার, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি কংগ্রেসের এইসব পিতৃপুরুষগণকে আমরা যেন কোনোদিন বিস্মৃত না হই।

"এই কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একতা স্থাপন করবে এবং জাতীয়

ভাব, জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি করবে। আমরা য়ুরোপের দেশগুলির মতো আমাদের শাসনকার্যে আমাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ গ্রহণ করতে চাই"—কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এর প্রথম সভাপতির ভাষণের মধ্যে এই কয়টি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল। সভাপতি—দাদাভাই নৌরজী। কলিকাতায় ইহাই প্রথম কংগ্রেস; তাই সকল সম্প্রদায় একযোগে এর উদ্যোগ-আয়োজনে ব্রতী হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যেমন, তেমনি বিত্তবানেরাও অর্থাৎ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনও এই ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এমন উৎসাহ ও সহানুভূতি জমিদার সভার পক্ষ থেকে এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যুর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন এবং বাংলার মুখ্য জমিদার অশীতিপর বৃদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতিত্বে বরণ করবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কোনো কোনো লেখক বলতে চেয়েছেন যে, "কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেরই উত্তরাধিকারীরূপে দেখা দেয় এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থা বা ভিক্ষা-নীতিই ছিল তাহার প্রধান পন্থা।" আমরা এই জাতীয় ধারণার সঙ্গে একমত নই। কংগ্রেসের পিতৃপুরুষগণ স্বদেশপ্রেমবর্জিত ছিলেন না; আত্মশক্তির দ্বারা জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে হবে, এ সত্যটা তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, এ কল্পনাও উদ্ভট। "ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি"—এই মহৎ আদর্শের প্রেরণা কি তাঁদের মধ্যে ছিল না? থাক সে কথা। ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসে জোড়াসাঁকোর উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন এবং "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" স্বরচিত এই গানটি গেয়ে উপস্থিত সকলের আনন্দ বর্ধন করেন।

কলিকাতা কংগ্রেস ও পরবর্তী কংগ্রেস-সমূহে সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত শাসন-সংস্কার ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করতেন। এই প্রস্তাব তাঁর অতীব প্রিয় ছিল। কারণ ইহার জন্য আন্দোলনই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ও লক্ষ্য। সিভিল সার্ভিস সমস্যা, স্বায়ত্তশাসন, ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ, স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ-বিভাগ রহিতকরণ—এই কয়টি বিষয়ের জন্য কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরে সুরেন্দ্রনাথ তীব্র আন্দোলন

করেছিলেন। এই ছিল তাঁর দিনের সাধনা ও রাত্রির স্বপ্ন। একে অবলম্বন করেই তাঁর অস্তিত্ব বিকাশলাভ করেছিল আর এইগুলির সিদ্ধির দিকেই তিনি ছিলেন স্থিরলক্ষ্য। তাঁর রাজনৈতিক জীবন গভীরভাবে আলোচনা করলে পরে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর দৃষ্টি অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে এই সকলেই কেন্দ্রীভূত ছিল। যখন গভর্ণমেণ্ট সদম্ভে ঘোষণা করলেন—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হবার নয়, ইহা অপরিবর্তনীয়,—তখন অনেকের বিশ্বাস বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হবেই হবে। তাঁর এই অবিচলিত বিশ্বাস ও দুর্বার আশাই তাঁকে তাঁর লক্ষ্যপথে উপনীত করেছিল; সরকারকে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ করতে হয়েছিল। সে কাহিনী যথাস্থানে বলব। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এরূপ সাফল্য অর্জনের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সে সাফল্য তাঁকে একের পর এক তীব্র সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়েছিল।

কংগ্রেস ছিল সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বভারতীয় সমস্যা-গুলিই আলোচিত হোত। প্রাদেশিক সমস্যার আলোচনা কংগ্রেসে হবার সুবিধা হোত না। সুরেন্দ্রনাথ তখন চিন্তা করলেন যে, এই সর্বভারতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি প্রাদেশিক আন্দোলনও দরকার। তাঁর এই চিন্তারই পরিণতি প্রাদেশিক সম্মিলন বা Provincial Conference; বাংলাদেশের পরবর্তীকালের রাজনীতিতে প্রাদেশিক সম্মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের সূচনা যেমন বাংলা দেশে, দেখা যাচ্ছে, প্রাদেশিক সম্মিলনের সূচনাও বাংলা দেশে। গোখলে মিথ্যা বলেন নি, বাংলা আজ যা ভাবে, সমগ্র ভারতবর্ষ আগামী কাল তা চিন্তা করে। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালীর এই দুর্লভ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিরা। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বা historical process-এর কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, প্রাদেশিক সম্মিলনের আইডিয়া তারই একটি অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "The National Congress, being a convention of India, could not take up for discussion questions

affecting any particular province, unless such questions had *assumed the proportion of a national problem.'* পরবর্তীকালে বাংলার এই দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনুসৃত হয় এবং প্রদেশে প্রদেশে 'প্রাদেশিক সম্মিলন' গড়ে উঠতে থাকে এবং তা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনাকে পরিস্ফুট করতে থাকে। আবার এই প্রাদেশিক সম্মিলন থেকেই জেলা সম্মিলনের উদ্ভব হয় এবং এইভাবেই বাঙালী তথা ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে নিয়মানুগ পথে ক্রমবিকাশলাভ করতে থাকে। কংগ্রেসের পিতৃপুরুষগণ যদি আত্মশক্তির সাধক না হোতেন কিম্বা তাঁরা যদি স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাস পোষণ না করতেন, তাহলে কি তাঁদের কর্ম ও চিন্তা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার পথে অগ্রসর করে দিতে সক্ষম হোত? স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাবের বিকাশ একদিনেই সম্ভব হয় না, ইতিহাস-নির্দিষ্ট স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করেই উহা তার সার্থক পরিণতি লাভ করে—এই কথাটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

"অন্যেরা যেটা সহজ সত্য বলে মনে করত আমি সেটা সেভাবে দেখতাম না। বিশ্বাসের চক্ষে দেখতাম বলে অবিশ্বাসীর কাছে যা অসম্ভব তা আমি সম্ভব বলে মনে করতাম।" সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের সফলতার সূত্র তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে আমরা পাই। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে। কংগ্রেসের আদিপর্বে এর স্থায়িত্ববিধানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, এই কথাটা তিনি যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমন কোনো কোনো প্রবীণ নেতাও বুঝেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে অর্থসংগ্রহ গান্ধীযুগে যেমন সহজসাধ্য ছিল, সুরেন্দ্রনাথের সময়ে একাজটা অতটা সহজ ছিল না। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে তাঁর উপর অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অর্থসংগ্রহের জন্যই বোম্বাইয়ের বিরাট কংগ্রেস মণ্ডপে সেদিন তিনি যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তার ফলে সমাগত দর্শকবৃন্দের হৃদয় উৎসাহে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। ফলে, একঘণ্টার মধ্যেই চৌষট্টি হাজার টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়; তার মধ্যে বিশ হাজার টাকা সভাস্থলেই সংগৃহীত হয়। মহিলাগণও তাঁদের অঙ্গের অলঙ্কার

উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এর পরে আরো দুইবার—একবার ১৮৯২ সালে এলাহাবাদে এবং আর একবার ১৯০৯ সালে লাহোরে, অর্থসংগ্রহের জন্য সুরেন্দ্রনাথ এইরকম বক্তৃতা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত ভারত-সভার নিজস্ব একটি ভবন নির্মাণের জন্য তাঁর অর্থসংগ্রহের প্রয়াসের কথা উল্লেখ্য। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মাদ্রাজ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার পরিচয় হয়। পরে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মহারাজা সুরেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর একদিন সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার গৃহনির্মাণ ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের জন্য মহারাজার নিকটে উপস্থিত হন। "এ পর্যন্ত আপনাদের কত টাকা উঠেছে?"—জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজা। এর উত্তরে তিনি বললেন, "বাড়ি তৈরি করতে মোট বিশহাজার টাকা দরকার। এ পর্যন্ত আমরা মাত্র পাঁচহাজার টাকা তুলতে পেরেছি। এর মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী দিয়েছেন দু'হাজার টাকা।" দেশপ্রাণ ও উদারচেতা মহারাজা তখন রাষ্ট্রগুরুকে যে কথা বলেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন: 'দেশের কাজের জন্য আপনার পক্ষে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। আপনি আর এখানে-ওখানে ঘুরে আপনার সময় নষ্ট করবেন না, সে সময় অন্য মূল্যবান কাজে নিয়োগ করুন। আমি বাকী পনর হাজার টাকা দেব।" ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার সেই উদার দানে ভারত-সভা যে স্থায়ী নাম ও ধাম পেয়েছে, সেকথা সুরেন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর আত্মচরিতে স্বীকার করেছেন।

কংগ্রেস স্থাপিত হবার পর থেকেই সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বহু প্রস্তাব উত্থাপন করে সেইসব বিষয়ে বহু বক্তৃতা করেছেন। তাঁর সেইসব বক্তৃতার বিশদ আলোচনার জন্য একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। ১৮৮৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে অস্ত্র-আইন (Indian Arms Act) নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। এই কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা কংগ্রেসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি অস্ত্র-আইনের প্রতিবাদ করেন এবং এই আইন যে উঠিয়ে দেওয়া দরকার, তা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। বস্তুতঃ তাঁর বক্তৃতা কেবলমাত্র বাক্যের তুবরী ছিল না—যুক্তি-তর্কের বিভায় তা ছিল

জ্যোতির্ময়। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাই জলের রেখার মতো মিলিয়ে যেত না, শ্রোতার চিত্তে একেবারে গেঁথে যেত। এ শক্তি ছিল তাঁর বিধিদত্ত আর এই অনন্যলব্ধ শক্তির বলেই তিনি সেদিন কংগ্রেসে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ তাঁরই বক্তৃতা শুনবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। কিন্তু যে কথা বলছিলাম। অস্ত্র-আইন আর সংবাদপত্র দমন আইন প্রবর্তিত হয় লর্ড লিটনের আমলে। শেষোক্ত আইনটির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার পক্ষ থেকে তুমুল আন্দোলন করেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তার ফলে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সংবাদপত্র দমন আইন উঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অস্ত্র আইন তখনো পর্যন্ত ভারতবাসীর প্রতি শাসকজাতির ঘোর অবিশ্বাসের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সুরেন্দ্রনাথ এরই তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সাহেবরা বন্দুক রাখবার জন্য সহজেই লাইসেন্স পাবে আর ভারতীয়গণ পাবে না, এই যে বৈষম্যমূলক নিয়ম, কংগ্রেস এই নিয়মের পরিবর্তন দাবী করল।

সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস বক্তৃতাগুলি গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ সবসময়েই থাকত। তিনি নিজেই আত্মচরিতে লিখেছেন: "আমি বরাবরই দুটি বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করতাম; এই দুটির মধ্যে একটি হোল—ভারতীয়গণকে সরকারী উচ্চপদে নিয়োগ এবং দেশে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা। আমার ধারণা যে, ভারতের সকল সমস্যার মূলেই এই দুটি সমস্যা বিদ্যমান এবং এই দুটির সমাধান হোলেই অন্যান্য সমস্যাগুলিরও সমাধান হবে। আমরা যদি আমাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিজেরা প্রণয়ন করতে পারি, দেশের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যদি আমাদের হাতে থাকে আর আমাদের দেশের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নির্দেশিত পন্থা অনুসারে দেশের শাসনকার্য যদি আমরা নিজেরা, নিজেদের লোক দিয়ে চালাতে পারি, তাহলে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনাধিকার যাকে বলে তাই আমরা পেতে এবং সর্বপ্রকারে আমাদের যোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে ও পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য আসন লাভ করতে সক্ষম হব।" তাঁর এই উক্তির মধ্যেই

আমরা স্থরেন্দ্রনাথের Political philosophy-র মূল স্থত্রটিকে যেন খুঁজে পাই। গ্লাডষ্টোনীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হোয়ে রাজনীতিতে তিনি একজন confirmed মডারেট ছিলেন,—একথা যেমন সত্য, আবার এই মডারেট স্থরেন্দ্রনাথই নিয়মানুগ পথে আন্দোলন চালিয়ে দেশের জন্য স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ অধিকার অকুণ্ঠচিত্তে দাবী করতেন, একথাও তেমনি সত্য।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পাঁচ বছর পরেই স্থরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ উপলব্ধি করলেন যে, ভারতে স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত গঠিত করা দরকার এবং এরই জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকটে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচার করা। ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা হয় ও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় তখন শীঘ্রই একটা পরিবর্তন আসন্ন হয়ে আসছিল ; এদেশের ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিলাতের পার্লামেণ্টে তখন সবেমাত্র আলোচনা হতে আরম্ভ হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এইবার পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব যাতে উঠতে পারে সেজন্য ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা দরকার। বোম্বাই কংগ্রেসের এই প্রস্তাব অনুযায়ী যাঁদের নিয়ে এই প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন স্তর ফিরোজ শা মেহতা, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সর্বসমেত আটজন। এঁদের মধ্যে হিউমও ছিলেন। ইহাই ইংলণ্ডে প্রথম প্রতিনিধি প্রেরণ এবং মূলতঃ এখান থেকেই আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর স্থত্রপাত। কংগ্রেসের নিজস্ব তহবিল তখন উল্লেখযোগ্য হোয়ে ওঠেনি। তাই প্রতিনিধিদলের প্রত্যেককে নিজ নিজ খরচে ইংলণ্ডে যেতে হয়েছিল। জনসাধারণের চাঁদায় এঁদের কেউ-ই সে বছর বিলাত যান নি। এঁদের মধ্যে একমাত্র স্থরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর সকলেরই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন : "হিসাব করে দেখা গেল যে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে চার হাজার টাকা খরচ করতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থা তখন আদৌ সচ্ছল ছিল না। আমার মোট সম্পত্তির

পরিমাণ তখন তেরো হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট কাগজ; তাও আবার আমার স্ত্রীর নামে। দেশের কাজে সঞ্চিত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে আমি দ্বিধা করি নি। আমার স্ত্রীও স্বেচ্ছায় ও সানন্দে উক্ত অর্থ আমার হাতে অর্পণ করেন।"

দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা হয়, এই আগ্রহ নিয়েই যুবক সুরেন্দ্রনাথ একদা ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। কংগ্রেসের জন্মের ছ'বছর আগে ভারত-সভার মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "আমাদের দেশ-শাসনে আমরা কার্যভার কতকাংশে গ্রহণ করতে চাই। আমরা কেবলমাত্র ব্যুরোক্রেসীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব না। কর ধার্য করা ব্যাপারে এবং দেশ-শাসনে আমরা জনমত প্রতিষ্ঠা করতে চাই।" কতকাল আগে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিলেন। সেই স্বায়ত্তশাসনের পথ প্রশস্ত করবার জন্য এইবার তিনি আর একপদ অগ্রসর হোলেন—ইংলণ্ডের জনমতকে এর অনুকূলে জাগ্রত করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস-নির্বাচিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করলেন।

১৮৯০, মার্চ মাস।

প্রতিনির্ধিদল ইংলণ্ড যাত্রা করলেন এবং এপ্রিলের প্রথমেই লণ্ডনে উপস্থিত হোলেন। সেই দেশে সুরেন্দ্রনাথের এই সময়কার কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেবার অবকাশ এখানে নেই। কৌতূহলী পাঠক তাঁর আত্মজীবনীতে এর বিশদ বিবরণ পাঠ করতে পারেন। লণ্ডনে তখন কংগ্রেসের একটি ব্রিটিশ কমিটি ছিল; এই কমিটির পক্ষ থেকেই প্রতিনিধিদলের সভানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। প্রথম যে সভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। ভারতের প্রধানতম রাজনীতিক নেতা এবং একজন বিখ্যাত বাগ্মী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন বিলাতে পৌঁছেছে। সকলেই তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য উৎসুক ছিল। ইংলণ্ডের জনসভায় এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা এবং স্বভাবতঃ এজন্য তাঁর নিজেরও কতকটা উৎকণ্ঠা ছিল। কিন্তু সভাস্থলে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজি এবং ততোধিক বিশুদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গী সহকারে তিনি যখন বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন তখন সমবেত দর্শকবৃন্দ

মন্ত্রমুগ্ধবৎ তা শুনতে থাকে। তাঁর বক্তৃতায় ভারতের শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতির যেমন তীব্র সমালোচনা ছিল, তেমনি ছিল ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সহানুভূতিপরায়ণ হবার জন্য আন্তরিক আবেদন। লণ্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'টাইমস'-এর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাটি সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছিল; "His (Mr. S. N. Banerjea,) speech on the occasion was magnificent and electrified his learned hearers by its close reasoning, by the appropriate language in which he clothed his ideas, and by the spirit which breathed in his utterances. Experienced speakers in and out of parliament found in Mr. Surendranath Banerjea a good deal which recalled the sonorous thunders of a William Pit, the dialectical skill of a Fox, the rich freshness of illustration of a Burke and the kin wit of a Sheridian."

এইখানে তাঁর বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র ওজস্বিতা নয় অথবা ইহা প্রাবৃটের প্রাক্কালে মেঘমন্দ্রের গর্জনও নয়—তদতিরিক্ত কিছু। তাঁর বাগ্মিতার ভিতর দিয়ে গিয়ে উদ্ভাসিত হোত তাঁর চরিত্র, তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, রাষ্ট্রগুরুর জীবনচরিত অনুশীলনের সময়ে এই কথাটি বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখা দরকার।

ইংলণ্ড, ওয়েলস্ এবং স্কটল্যাণ্ডের অনেক শহরেই সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তৃতা করেছিলেন এবং অবশেষে তাঁরা গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন। মোট কথা, কংগ্রেস প্রেরিত এই প্রতিনিধি-দলের চেষ্টায় ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম সোপান রচিত হয়। কংগ্রেসের এই প্রচারকার্য, বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথের প্রয়াস ভিন্ন Act of Parliament, 1892 (এই বিধি অনুসারেই মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলাবোর্ড-গুলি ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য প্রেরণের অধিকার পায় আর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপ্রেরণের অধিকার

লাভ করেন; ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে পার্লামেণ্টের এই বিধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।) পাশ হোত কি না সন্দেহ এবং এটা পাশ না হোলে স্বায়ত্তশাসনের প্রথম সোপানে আমরা সেদিন পৌছতে পারতাম কি না সন্দেহ। দাদাভাই নৌরজি তখন পার্লামেণ্টের ভারতীয় সদস্য ছিলেন। তিনি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের এই সময়কার কোনো কোনো বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অক্সফোর্ড ইউনিয়নে সুরেন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত বক্তৃতা করেন। এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। বহু বিদগ্ধ শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন বলেছিলেন:

"বলা হয়ে থাকে যে, ইংরেজরা আসবার আগে ভারতীয়গণ বর্বর ও অসভ্য ছিল। এই সভায় সমবেত ব্যক্তিগণকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমি হিন্দু বলে গৌরব বোধ করি। কারণ এই জাতি এক মহৎ ও সুপ্রাচীন বংশসম্ভূত। যখন সুসভ্য য়ুরোপীয় জাতিদের পূর্বপুরুষগণ বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন, তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিশাল রাজ্য স্থাপন, সুদৃশ্য নগরী প্রতিষ্ঠা, ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের প্রচার এবং এক মহৎ ভাষা অনুশীলনদ্বারা যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন আজো তা সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করছে।··· আমরা প্রতিনিধিমূলক যে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি দাবী করছি সেই স্বায়ত্তশাসন-মূলক রাষ্ট্রবিধি আর্যসভ্যতারই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল এবং আমরা আর্যসম্ভূত। অতএব আমরা যখন এই প্রকার দাবী করি তখন আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করছি মাত্র। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার। সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতিরই ইহা জন্মগত অধিকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরেজ জাতির নিকট আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হবে না।"

সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারা বুঝবার পক্ষে তাঁর এই উক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান। সেদিন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দাবীকে শাসকজাতির সামনে এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের মতো একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডে আন্দোলন চালিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হোয়ে তিনি ভারতে ফিরলেন। বোম্বাই থেকে কলিকাতা পর্যন্ত প্রত্যেক বড় বড় স্টেশনে বিপুল জনসংঘ তাঁকে যেরকম সম্বর্ধনা করেছিল, সে ইতিহাস অতুলনীয়।

১৮৯৪ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তখন সেখানে একটি ছাত্র সভায় সুরেন্দ্রনাথ একটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: "Students and politics"। বস্তুতঃ তখন ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা ও রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান উচিত কি না—এই বিষয়টি সাধারণের আলোচনার বস্তু হোয়ে উঠেছিল। সভায় এ নিয়ে খুব তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও খাপার্দে উভয়েই বলেন—ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চা করা কিম্বা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করা—এর কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধু আনন্দমোহন বসু এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। সুরেন্দ্রনাথ তো আজীবন ছাত্রদের রাজনীতি-চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বরাবরই বলে এসেছেন ছাত্রদের রাজনীতি-চর্চা করতে দাও এবং যোগ্য লোকের নেতৃত্বে তাদের রাজনীতিক আন্দোলনেও যোগদান করতে দাও। কেন তিনি এই কথা বলতেন? সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি ঐ বক্তৃতায় বলেছিলেন: "মালব্য ও খাপার্দে দুজনেই এই বিতর্কে আমার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তখন আমি যে মন্তব্য করেছিলাম তা চিরকাল দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করে এসেছি। আমি সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি ও সরকারী উচ্চ রাজকর্মচারীগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বলেছিলাম যে, ছাত্রদের রাজনীতি-চর্চা করা প্রয়োজন এবং কর্তব্য। আশার কথা এবং আনন্দের কথা, এখন অনেকেই আমার অনুকূলে মত পোষণ করছেন। ছাত্রদের রাজনীতিক চর্চার সুযোগ না দেওয়া যে মূঢ়তা তা আজকাল সকলেই বুঝছেন। ভালো বা মন্দ যা হোক, রাজনীতি আলোচনা তারা করবেই এবং যদি তাদেরকে যথার্থ রাজনীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে তাদের মনে উৎকট হৃদয়োচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হবে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ নয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেখানে প্রায় ছাত্রদের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনায় আমন্ত্রিত হন। ভারতবর্ষ বিলাত না হোলেও, ছাত্র সকল দেশেই ছাত্র এবং ছাত্রদের মন সর্বত্র সমভাবাপন্ন।" রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ যে কতখানি প্রগতিশীল ছিলেন, তাঁর এই মন্তব্যই তার অভ্রান্ত প্রমাণ। ভারতবর্ষের ভাবী-কালের রাজনৈতিক রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর দূরদৃষ্টিতে এই

সত্যটা ধরা পড়েছিল যে, যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ দেখা গিয়েছে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে, কালক্রমে এই চেতনার আবর্ত বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় জীবনে ফলপ্রসূ হবে যদি তার ধারক ও বাহক এই ছাত্রদল হোতে পারে। ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাস সুরেন্দ্রনাথের এই দূরদৃষ্টির অভ্রান্ততা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছে। 'রাষ্ট্রগুরু' উপাধিটা তাঁর বৃথা নয়।

মাদ্রাজে ছাত্রদের সভায় সুরেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম। তিনি বলেছিলেন: "Bear this in mind that in the great work of political regeneration of our country upon which we are all engaged, the foundations must be broad based and deep upon the eternal principles of morality. We ask you to incur self-sacrifice—we ask you to give up your personal interests—we ask you to abandon your comforts and personal conveniences at the altar of your country's political deliverance. The keynote of politics is self-sacrifice and the abandonment of personal interests, personal considerations and motives of personal convenience for the promotion of the public good." রাজনীতির মূলকথা আত্মত্যাগ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা বিসর্জন, সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি আজো তার মূল্য হারায়নি। জনসাধারণের কল্যাণে যাঁরা আত্মনিয়োগ করবেন, তাঁরা যেন রাষ্ট্রগুরুর এই মূল্যবান উপদেশ স্মরণে রাখেন।

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করতে সুরেন্দ্রনাথ যেমন উৎসাহ দিয়েছিলেন, তেমনি আবার এও দেখতে পাই যে তাদের নৈতিক শৈথিল্য সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে তিনি বিস্মৃত হননি। বলেছিলেন: "কিন্তু আজকাল কতকগুলি যুবকের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও পরমতের প্রতি অমার্জনীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তার আমি নিন্দা করি। সহিষ্ণুতা হিন্দু জাতির বহু প্রাচীন ধর্ম এবং নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রজীবনের প্রাণস্বরূপ। বদ্ধমূল ও আবহমানকাল অনুষ্ঠিত এই অভ্যাস ত্যাগ সুষ্ঠুভাবে রাজনৈতিক অগ্রগতির

প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমার মনে হয় আমাদের গৃহে ও শিক্ষায়তনে অধুনা সংযমের অভাব ও বিশৃঙ্খলার প্রসার দেখা দিয়েছে। যাইহোক, আশা করি ইহা চিরস্থায়ী হবে না এবং যে কারণ পরম্পরায় এদের উৎপত্তি, সেগুলির অবসান ঘটলেই এই মনোভাবেরও অবসান হবে।"

সুরেন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী আজো স্মর্তব্য। দেশের ছাত্রদের উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল বলেই না কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি ছাত্রসভা গঠনে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং অধ্যাপনার মাধ্যমে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তিনি জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। ছাত্রদের জীবনে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে সেদিন তিনি যে কতবড়ো একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সূচনা করেছিলেন এই দেশে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, তার সম্যক মূল্যায়ন করতে না পারলে রাষ্ট্রগুরুর প্রকৃত মহত্ত্ব আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। রাজনীতি ছিল তাঁর জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস, রাজনীতি ছিল তাঁর ধমনীর প্রতি রক্তবিন্দুতে। যে মহাশক্তি ধারণ করে সুরেন্দ্রনাথ বিগত শতাব্দীর শেষপাদে এইদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই শক্তিকেই গুরু হিসাবে তিনি দেশময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এবং এরজন্য তিনি একটিমাত্র উপায়ই বেছে নিয়েছিলেন—ছাত্রদের রাজনীতিক চর্চায় উৎসাহ দেওয়া। সেদিন এটি যে কতবড়ো দুঃসাহসিক কাজ ছিল তা আজ আমরা অনুমান করতে পারব না। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করি।

উনিশ শতকের শেষভাগে কলিকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন এর উদ্যোক্তা। এর প্রতিষ্ঠার সময়ে সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। ইনষ্টিট্যুটের প্রথম বার্ষিক সভায় যোগ দিবার জন্য সেক্রেটারি মিঃ উইলসন তাঁকে বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সভার প্রথম প্রস্তাবটি সুরেন্দ্রনাথ উত্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, একটি শর্তে আমি এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারি—ছাত্রদের আপনারা রাজনীতি-চর্চা করতে উৎসাহ দেবেন। স্যর চার্লস ইলিয়ট তখন বাংলার ছোটলাট। বিষয়টি তাঁর গোচরে আনা হয়। তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ এলো: "The authorities of the Calcutta

University Institute should never agree to the proposal of Mr. Benerjea. It will be dangerous to allow the students to meddle in politics" এর ফলে সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিট্যুটে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, এর সংস্পর্শেও ছিলেন না। দেশসেবার মহৎ আদর্শে ছাত্রদের তরুণ হৃদয় উদ্দীপ্ত করে তুলবার জন্যই তিনি সকল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে ছাত্রদের রাজনীতি-চর্চায় উৎসাহ দিতেন। ভবিষ্যতের বহু দেশপ্রেমিক কর্মী ও নেতা সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন আর ছাত্র ছিলেন না এমন অনেক কর্মী ও নেতা তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের অনেকখানি এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রগুরু তিনি এইজন্যই।

॥ এগারো ॥

বিলাতে কংগ্রেসের প্রচারকার্য সাফল্যের সঙ্গে করে ১৮৯০ সালের ৬ই জুলাই সুরেন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই থেকে তাঁর সকল বক্তৃতা ও সকল রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হোতে থাকে। স্বায়ত্তশাসন। এই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা। এইসময়ে দেখা যায় যে প্রত্যেক সভাতেই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলতেন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ করা হয়েছে তা যেন চালিয়ে যাওয়া হয়; আরো বলতেন—সংগ্রামে সাফল্যের জন্য মাঝে মাঝে ইংলণ্ডে প্রতিনিধি পাঠানো উচিত। জন্মাবধি কংগ্রেসের দাবী ছিল: "The supreme and existing Local Legislative Councils should be expanded by the admission of a considerable proportion of elected members." তখনো পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা (যুক্তপ্রদেশ) এবং পাঞ্জাবে কোনো ব্যবস্থাপক সভা ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঐসব প্রদেশে কাউন্সিল প্রবর্তনের জন্য দাবী করা হয়। বিলাতে কংগ্রেসের প্রথম দফার প্রচারকার্য যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ ১৮৯২ সালের শাসন-সংস্কার।

এইখানে একটু গোড়ার কথা বলা দরকার। কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয় ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে। পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সদস্য চার্লস ব্র্যাডলফ এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই ভারতীয় নেতাগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ যাতে করা যেতে পারে সেই মর্মে একটি বিল রচনা করেন। ১৮৯০ সালে ব্র্যাডলফ পার্লামেণ্টে এই বিলটিই উত্থাপন করেছিলেন। এই বিলটির বিরোধিতা করবার জন্য সরকারী ভাবে হাউস অব কমন্স-এ একটি বিল প্রবর্তিত হয় এবং উহা ১৮৯২ সালে গৃহীত হয়। ইহাই ইতিহাসে *Indian Councils Act of 1892* নামে পরিচিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই কাউন্সিল-আইনকে কংগ্রেসের পরোক্ষ সাফল্যলাভ

বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং ১৮৯০ সালে কংগ্রেস যাঁদের বিলাতে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা একেবারে খালি হাতে ফিরে আসেন নি। ভারতে প্রতিনিধি-মূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত করা আবশ্যক এবং এটা করতে হোলে ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ ও শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচন-নীতি প্রয়োগ করা দরকার—এই কথাটা যখন সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ গ্লাডষ্টোনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তখন, অনেকেরই হয়ত জানা নেই, সুরেন্দ্রনাথই ইংলণ্ডের বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, "The franchise must be real." অর্থাৎ নির্বাচনাধিকার যেন খাঁটি হয়, সেটা যেন ভূয়া না হয়। গ্লাডষ্টোন কথা দিয়েছিলেন কিন্তু কার্যকাল্পে দেখা গেল যে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে স্বীকৃত বা রক্ষিত হোল না। এই নূতন শাসন-সংস্কার ভারতবাসী যেটা লাভ করলো সেটাকে বলা যেতে পারে Limited franchise অর্থাৎ সীমাবদ্ধ নির্বাচনাধিকার। তথাপি এ কথা আজ স্বীকার্য যে, যে ব্যবস্থার প্রবর্তন সেদিন হয়েছিল, তা প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ১৮৯২ সালের পার্লামেণ্টের বিধান অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তাতে মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলাবোর্ড সমূহকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয়; তবে এরূপ প্রতিনিধি নির্বাচন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। শুধু তাই নয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সদস্যগণকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পঠাবার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। আর ছিল সেইসঙ্গে right of interpellation অর্থাৎ সদস্যদের প্রশ্ন করবার আর বাজেট আলোচনা করবার ক্ষমতা।

অতঃপর এই পটভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ১৮৭৬ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে সর্বপ্রথম যখন নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হয় তরুণ সুরেন্দ্রনাথ তখন থেকেই পৌর-সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার ও কালীনাথ মিত্র প্রমুখ বর্ষীয়ান জননায়কগণের সঙ্গে মিলে তিনি পৌরসভার উন্নতিবিধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সুদীর্ঘকাল। ম্যাকেঞ্জি আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত তিনি

নিরবচ্ছিন্নভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাই তিনি যখন নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় পৌরসভার পক্ষ থেকে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন, তখন 'পাইওনীয়ার' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটি জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। ইহা শ্বেতাঙ্গ সমাজের অন্যতম মুখপত্র ছিল।

১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হন। এই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তুজন—কালীনাথ মিত্র ও জয়গোবিন্দ লাহা। কিন্তু তিনিই অধিকসংখ্যক ভোটে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম কাউন্সিলে যোগদান। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "কলিকাতা পৌরসভার প্রথম প্রতিনিধিরূপে আমি নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করলাম। আমার এই জয়ের অনুকূলে কি ছিল তা বলা কঠিন। বোধহয় জনসাধারণের কাজে আমার অনুরাগ এবং নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তনে আমার অংশ গ্রহণ, আমাকে জয়লাভে সমর্থ করেছিল।" আসল কথা, তাঁর দেশসেবার ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত ছিল এবং শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট তিনি তখন অবিসম্বাদী নেতারূপে স্বীকৃত; এবং তারই জন্য বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ আন্তরিকতার সঙ্গে কাউন্সিলের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। আইন সভায় দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি যে কি পরিমাণ কাজ করেছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার পুরাতন নথীপত্রের মধ্যে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এখানে মাত্র দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি আট বছর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিলেন। কেবলমাত্র খ্যাতি লাভের জন্য তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করেন নি, এই আট বছরকাল তিনি যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলেন, তার পরিচয় মিলবে কাউন্সিলে প্রদত্ত তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাগুলির মধ্যে। যাঁরাই এগুলি একটু যত্নের সঙ্গে পাঠ করবেন তাঁরাই বুঝবেন যে জনপ্রতিনিধিত্ব করতে হোলে কিরূপ পরিশ্রমের সঙ্গে তথ্যনির্ণয় ও সংগ্রহ প্রভৃতি করে প্রস্তুত হওয়া দরকার।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে কাউন্সিল-পর্বটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে তিনি দুটি উল্লেখযোগ্য আইনের প্রস্তাব সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। এই দুটির মধ্যে একটি হোল বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন প্রস্তাব আর অপরটি হোল কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনকে আগাগোড়া ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব। যখন নূতন কাউন্সিল গঠিত হয়, তখন প্রথমোক্ত আইনের সংশোধন প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবী ছিল এবং শেষের আইনটির প্রস্তাব ১৮৯৭ সালে পরিষদে উপস্থিত করা হয়। প্রথমটির কথা আগে বলি। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, পৌরসভা পরিচালনার কাজে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। সেই অভিজ্ঞতা এইবার তিনি কাজে লাগাবার সুযোগ পেলেন। স্যর চার্লস ইলিয়ট তখন বাংলার ছোটলাট; বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিলটির (Bengal Municipal Bill, 1892) সংশোধন তাঁরই আমলের একটি ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথের মতে: "The measure was re-actionary, prompted by the official distrust of municipal institutions....It was now proposed under the Bill to deprive them of their power." দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা সরকার যে খুব প্রীতির চক্ষে দেখতেন না, সেটা বিশেষভাবেই এখন বুঝতে পারা গেল যখন প্রস্তাবিত বিলের সাহায্যে তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পূর্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে অগ্রসর হোলেন। সুরেন্দ্রনাথ পরিষদের বাইরে এর বিরুদ্ধে যথোচিত আন্দোলন শুরু করেন। সংবাদপত্রে প্রতিবাদ, জনসভার অনুষ্ঠান এবং পরিষদের কোনো কোন ভারতীয় সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও বিশেষ কোনো ফল হয়নি। প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল আইনে ব্যবস্থা ছিল যে, একবার কোনো মিউনিসিপ্যালিটিকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষমতা দিলে, সে ক্ষমতা আর প্রত্যাহার করা চলবে না। কিন্তু প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল আইনে মিউনিসিপ্যালিটির এই ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট কেড়ে নিতে উদ্যত হোলেন। যখন কিছুতেই কিছু হোল না, তখন সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে হিউম সাহেবকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন। এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে তাঁর এই পত্রখানি একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে। লর্ড রিপন তখন পার্লামেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী। সুরেন্দ্রনাথ হিউম সাহেবকে উক্ত পত্রে এই বিষয় নিয়ে লর্ড

রিপনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। হিউম সেই পত্রখানি রিপনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; তিনি আবার সুরেন্দ্রনাথের ঐ চিঠিখানির একটি কপি ভারত-সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ; "যে উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলাম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল। একদিন স্যর চার্লস ইলিয়ট কাউন্সিলে এলেন এবং সভার কাজ আরম্ভ হবার আগেই ঘোষণা করলেন যে, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল সম্বন্ধে ভারত-সচিবের সিদ্ধান্ত তাঁর মীমাংসার অনুকূল। সুতরাং প্রস্তাবিত আইনের যে দুটি বিষয় নিয়ে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে, সেই দুটি বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করা হবে না।"

সুরেন্দ্রনাথের প্রয়াস জয়যুক্ত হোল। মফঃস্বলে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির স্বার্থ বজায় থাকল। এইবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে আলোচনা করব। এর প্রণেতা ছিলেন স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি। এতদিন কলিকাতা পৌরসভা যেভাবে চলে আসছিল নূতন ছোটলাট ম্যাকেঞ্জির তা মনঃপূত হোল না। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনকে এমনভাবে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব করেন যে, তার ফলে পৌরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনার বা করদাতাদের প্রতিনিধিগণের অধীন থাকবেন না এবং তাঁর কাজের জন্য তিনি কমিশনার বা কর্পোরেশন কারো কাছেই দায়ী থাকবেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সিভিলিয়ানদেরই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হোত। তাঁরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন ; সুতরাং তাঁরা এই প্রস্তাবিত 'ম্যাকেঞ্জি আইন' সমর্থন করলেন। পৌরসভা সম্পর্কে ম্যাকেঞ্জির একটি উদ্ধৃত উক্তি এখানে উল্লেখ্য। পামার ব্রীজ পাম্পিং ষ্টেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে কর্পোরেশনকে "বাক্যবীরদের আগার ও বিলম্বের দপ্তরখানা" ("Armoury of talk and an arsenal of delays") বলে উল্লেখ করেছিলেন। শহরের বর্তমান পৌরসভা সম্পর্কে আমরা এই ধিক্কারবাণী আজ নিঃসঙ্কোচেই উচ্চারণ করতে পারি। ম্যাকেঞ্জির এই প্রয়াসকে রমেশচন্দ্র দত্ত "unworthy attempt to rob the people of Calcutta of their valued rights" বলে উল্লেখ করেছেন। এই কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিল যাতে আইনে পরিণত না

হয় সেজন্য এদেশে সুরেন্দ্রনাথ এবং লণ্ডনে রমেশচন্দ্র সমানভাবেই পরিশ্রম করেছিলেন এবং এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের ভূমিকা কি ছিল তা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।* সুতরাং এখানে আমরা সুরেন্দ্রনাথের প্রয়াসের কথাই বলব।

যথাসময়ে ম্যাকেঞ্জি বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হোল। প্রায় দু'বছর এই বিলকে উপলক্ষ করে ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বিলটি যখন সিলেক্ট-কমিটিতে পাঠান হয় তখন লর্ড কার্জনের আমল। তিনি নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা মনোনীত সদস্যের সমান করবার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে তাঁর কলমের একটিমাত্র খোঁচায় কলিকাতা পৌরসভা একটি খাস সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়। শহরে অধিবাসীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ সিলেক্ট-কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং সেখানেও তিনি বিলের প্রবল বিরোধিতা করেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল সে কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : "সিলেক্ট-কমিটিতে আমাদের বিবরণী পেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ কঠোর পরিশ্রম করতে হোত। এই সময়ে একপক্ষ কালের অধিক প্রত্যহ মাত্র জলযোগের সময় ব্যতীত বেলা এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলে। অনেকদিন যাবৎ আমি ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিলাম, কিন্তু এমন কঠোর পরিশ্রম কখনো করতে হয়নি।" এই ঐতিহাসিক বিতর্কের শেষ দিনে তিনি যে বক্তৃতাটি করেছিলেন তা সুরেন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত বক্তৃতার মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হবার দাবী রাখে। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তিনি যে কত দূরদর্শী ও ভবিষ্যদশী ছিলেন তার প্রমাণ আছে এই বক্তৃতাটির ছত্রে ছত্রে।

১৮৯৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর।

ম্যাকেঞ্জি বিল ব্যবস্থাপক-সভায় গৃহীত হোল। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা সবাই নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে থাকেন। ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলে চলেছেন : "Sir, most earnestly and most emphatically do I renounce all responsibility in connection with this measure ; and I will continue to live in the hope, the trust and the confi-

* লেখক-প্রণীত 'রমেশচন্দ্র' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

dence, based upon my unswerving faith in the dispensation of a God of Righteousness—I will live in the hope and the trust that better days are yet in store for my native land, that the wisdom of the past will soon be vindicated, and that the inestimable boon of Local Self-Government will, within a measurable distance of time, be restored to the city of my birth, the house of my sires, the destined home of my children and children's children, round which cluster my dearest, fondest and tenderest associations." 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণকে "most eloquent denunciation" বলে উল্লেখ করেছিল।

এই ঘটনার চব্বিশ বছর পরে, ঐ ব্যবস্থাপক-সভাগৃহেই এই ম্যাকেঞ্জি আইনের সংশোধন করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। তিনি তখন স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিন্তু সে কাহিনী যথাস্থানে বলব। এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলার আছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর বিতর্কের শেষ দিন ম্যাকেঞ্জি বিল আইনে পরিণত হয়। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ঐ দিনই রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী দিবস। যখন আমি সভাগৃহে প্রবেশ করেছিলাম তখন ঐ মহাত্মার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য আমি একটি আমন্ত্রণলিপি পাই। ইহা আমার মনে গভীর বিষাদের সঞ্চার করে এবং শেষবার বিলটির প্রতিবাদ করে আমি বলি: প্রাতে সভাগৃহে প্রবেশকালে আমি যে আমন্ত্রণলিপিখানি পাই তা আমাকে আজ রাজা রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার মনে হয় এ ঠিক হয়েছে যে ভবিষ্যৎবংশীয়গণ বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর তিরোধানের দিনটিই তাঁর প্রিয় বাসস্থান ও কর্মভূমি এই মহানগরীর স্বায়ত্তশাসনাধিকারের সমাধি দিন বলে স্মরণ করবে।"

"বর্তমানযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী'—রামমোহন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তিটি একালের বাঙালী সন্তানদের আর একবার স্মরণ করতে বলি। তাঁর প্রিয় বাসস্থান ও কর্মভূমি কলিকাতা নগরীর কোনো প্রকাশ্য স্থলে আজ

পর্যন্ত সেই নবযুগস্রষ্টার একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতির এই করণীয় কর্তব্যটি আর কতকাল অবহেলিত ও অসমাপ্ত থাকবে ?* ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে টাউন হলে অনুষ্ঠিত রামমোহনের এক স্মৃতিসভায় সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতের স্রষ্টা এই মহাপুরুষ সম্পর্কে একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : "Rammohun Roy was the pioneer of all those public movements which have in them the promises—rich promises—of an abundant harvest of good...Amid the gathering difficulties of our situation, let us sit at the feet of Rammohun Roy and hold communion with his master spirit. Let it be remembered that he was not only the founder of the Brahmo Samaj and the pioneer of all social reforms in Bengal, but he is also the father of constitutional agitation in India." প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐ সভায় রাজার স্মৃতিরক্ষার জন্য যখন কলিকাতা শহরে একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন : "Is it right and proper that the earthly remains of the Raja should for ever rest in a foreign land and under a foreign sky ? Should we make no effort to transfer those sacred remains to the land of his birth, where he lived and worked ?" সেই সঙ্গে তিনি নেপোলিয়নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছিলেন, ফরাসীজাতি সেণ্ট হেলেনা থেকে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ উদ্ধার করে প্যারিসে নিয়ে এসে, প্যারিসের মৃত্তিকায় প্রোথিত করে সেই বীরের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। তাঁর আগে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহন সম্পর্কিত তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে ঐ একই প্রশ্ন তুলেছিলেন।†

ম্যাকেঞ্জি আইন্ পাশ হোল। পৌরসভা মূলত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোল। পৌরসভায় স্বায়ত্তশাসনের সমাধি (সুরেন্দ্রনাথের কথায়

---

* সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এই বিষয়ে অবহিত হয়েছেন এবং রামমোহনের একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের আয়োজন করেছেন।

† লেখকের 'রামমোহন' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

"extinction of local self-government") রচিত হোল। ইংরেজের ন্যায় বিচারে যিনি আজীবন গভীর আস্থা পোষণ করে এসেছেন, সেই সুরেন্দ্রনাথের মনে এই ঘটনাটি কী দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা আজ আমরা সহজে অনুমান করতে পারব না। তবে তিনি যে চব্বিশ বছর পরে এই কুখ্যাত আইনের আমূল সংশোধন করে পৌরসভাকে তার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এ তাঁর স্বদেশপ্রেমেরই আর একটি অভিব্যক্তি, সংকল্পসাধনে তাঁর দুর্দমনীয় ইচ্ছারই আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। জীবনের কোনো অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার যাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, ইহা সেই মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে বিশেষভাবে এবং সমকালীন ইতিহাসে সাধারণভাবে, এই ম্যাকেঞ্জি বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের তুল্য আন্দোলন আর দেখা যায়নি। ইংরেজদের মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' এই প্রসঙ্গে লিখেছিল : "The Mackenzie Act has evoked bitter controversy and gave rise to an agitation which, so far as municipal matters are concerned, is without a parallel in the history of Calcutta." সেদিন নাগরিক অধিকারের মূলে আঘাত করেছিল এই আইন। তাই দেখা গেল যে, এই স্বৈরাচারী আইনের প্রতিবাদস্বরূপ আটাশজন কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন। রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'সাবাস আটাশ' প্রহসনটি এই উপলক্ষেই রচিত ও অভিনীত হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতিতে প্রতিবাদকারী কমিশনারদের সম্বর্ধনা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়। একাধিক সংবাদপত্রে এই নিয়ে তুমুল আলোচনাও চলেছিল কিছুদিন। তাঁর কারাদণ্ডের পর কলিকাতা শহরে এমন প্রবল উত্তেজনা ও আন্দোলন সত্যিই আর দেখা যায়নি। বলা বাহুল্য, নূতন আইন অনুসারে সংগঠিত পৌরসভায় সুরেন্দ্রনাথ আর জীবনে প্রবেশ করেন নি। প্রবেশ করেননি সত্য, কিন্তু নিয়তির এমনই অদ্ভুত বিধান যে, সেই কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি আইনকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের আগুনে পুড়িয়ে, কলিকাতা পৌরসভাকে একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার ভার সুরেন্দ্রনাথেরই উপর ন্যস্ত হয়েছিল। এইজন্যই তাঁকে বলা হয় 'Father of the New Municipal Act' অথবা বর্তমান পৌরসভার জনক। দুঃখ এবং লজ্জার বিষয়, সেই জনকের মর্মরমূর্তি কলিকাতা

কর্পোরেশনের এলাকার বাইরে, কার্জন পার্কের (এই পার্কটির নামের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়) এক কোণে স্থাপিত হয়েছে।

আগেই বলেছি, প্রাক্‌-স্বদেশীযুগে সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবন প্রধানত দুইটি বিষয়ের আন্দোলনকে উপলক্ষ করে আবর্তিত হয়েছিল, একটি স্বায়ত্তশাসন অপরটি সিভিল সার্ভিস। ১৮৯৩ সালটি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশিষ্ট ঘটনার জন্য। এই বছরের জুন মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যাতে ভারতবর্ষে ও বিলাতে যুগপৎ গৃহীত হয় সেই মর্মে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। দাদাভাই নৌরজী তখন পার্লামেণ্টের সদস্য। তিনি ঐ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সংবাদ যখন এই দেশে এসে পৌছল তখন এখানকার সরকারী মহলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "The acceptance of the Resolution by the House of Commons fell like a bombshell upon the official world here." সুরেন্দ্রনাথের বহুদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হোতে চলেছে। কিন্তু পার্লামেণ্টে গৃহীত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা এলো ইণ্ডিয়া-অফিস থেকে। ভারত-সচিবের দপ্তরখানা থেকে এর বিরুদ্ধে উঠল তীব্র প্রতিবাদ। স্যর হেনরি ফাউলার তখন ভারত-সচিব। এই ফাউলারই সেদিন পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: "Every member of Parliament is a member for India." সুরেন্দ্রনাথ তখন তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় শ্লেষ সহকারে এই মন্তব্যটির সম্পর্কে লিখেছিলেন, "The declaration by the Secretary of State for India can only mean that what is everybody's business is nobody's business." লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছিল। ফাউলারের বলবার কথা এই ছিল যে, পার্লামেণ্টের কমন্স মহাসভার সদস্যগণ বিচার-বিবেচনা না করেই এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন। "Snatch vote"-এর সাহায্যে অর্থাৎ গোলে হরিবোলের জোরে এটা পাশ হয়েছে, অতএব গভর্ণমেণ্ট এটা মেনে নিতে বাধ্য নন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "But there is the vote; and the Secretary of State seeks to get over it by a reference to the authorities in India."

তিনি আশঙ্কা করেছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্ট ফাউলারের অনুকূলেই মত প্রকাশ করবেন। সেই সময়ে স্যর চার্লস ইলিয়ট ছুটীতে ছিলেন; বাংলার অস্থায়ী ছোট লাট তখন স্যর এ্যাণ্টনি ম্যাকডোনেল। তিনি একদিন সুরেন্দ্রনাথকে বেলভেডিয়ারে নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠালেন।

সেদিন ছোটলাট যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনি simultaneous পরীক্ষার জন্য এত উৎসুক?—তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "Because we have lost all faith in nominations, and because we think that simultaneous examinations alone can give us our fair share of appointments in the Indian Civil Service, and redeem the Queen's Proclamation." সেদিন বেলভেডিয়ার প্রাসাদে প্রদেশের শাসনকর্তার মুখের ওপরে সুরেন্দ্রনাথ বার বার ঐ একই কথা বলেছিলেন: "Nominations by Government cannot, and will not satisfy us." তিনি যে সত্যই জননেতা এবং জাতির মুখপাত্র-স্বরূপ, তা তাঁর এই নির্ভীক উক্তিতেই জানা গিয়েছিল। "গভর্ণমেণ্টের কাছে ভারতের জনমত তুচ্ছ। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে আমাদিগকে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়।"—সত্তর বছর আগে একদিন এই কথা প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে সুরেন্দ্রনাথ যখন বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বসে ছোটলাটকে বলছিলেন, আমরা কল্পনা করতে পারি, সেদিন বাংলার সেই মুকুটহীন সম্রাটের চিন্তায় একটি কথাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেটি হোল জনমত। সেদিন তিনিই ছিলেন এর স্রষ্টা এবং পালয়িতা। তাই পার্লামেণ্টে গৃহীত প্রস্তাবে ইংলণ্ডের জনমতই যে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং সে জনমত যে তুচ্ছ নয়,ম্যাকডোনেলকে তিনি সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ শৌখিন নেতা ছিলেন না, সাময়িক আবেগ বা উচ্ছ্বাসের দ্বারা তিনি পরিচালিত হোতেন না। একটি পরাধীন জাতির রাজনৈতিক চেতনার প্রত্যেকটি স্পন্দন, তার প্রত্যেকটি আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে তরঙ্গ তুলতো এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য তাঁকে প্রেরণা দিত। সেইজন্যই কি স্যর জি এন. চন্দ্রাবরকর (কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি) বলেছিলেন: "Surendra Nath is the father of our political consciousness"—সুরেন্দ্রনাথই আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার গুরু। দুঃখের বিষয়, গুরুর এই মহত্ব আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

॥ বারো ॥

১৮৯৫

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে তথা কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুণা নগরীতে জাতীয় মহাসভার একাদশ অধিবেশন বসল। সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কে বলা হয়েছে : "In the Valhalla of Indian politicians there lies in a prominent niche the spirit of Surendra Nath who had been for over four decades connected with the Congress and whose trumpet voice, resounding from the Congress platform in India, reached the farthest recesses of the civilized world. For command of language, for elegance of diction, for a rich imagery, for emotional heights, for a spirit of manly challenge, his orations are hard to beat; they remain unapproachable."* ইহাই সুরেন্দ্রনাথ। কালের অলিন্দে আজো যেন তাঁর সেই বজ্রকণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়ে চলেছে—আজো যেন আমরা শুনতে পাই তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বান : "The services of the mother-land is the highest form of religion—it is the truest service of God"—এই আদর্শের সাধনাই ছিল রাষ্ট্রগুরুর জীবনের একমাত্র সাধনা। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাতচল্লিশ বছর যখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি তখন উত্তরযৌবন; কিন্তু সেই বয়সে তাঁর কর্ম-ক্ষমতা তাঁর সতীর্থদের তো বটেই, এমন কি বয়োজ্যেষ্ঠদের মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার করতো। সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে এই একটি মানুষের উপর। তাই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, সংবাদপত্র মারফৎ

* *The History of the Congress* : B. Pattabhi Sitaramayya.

যখন এই সংবাদ জানা গেল তখন শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে বিপুল কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হোল।

কংগ্রেসের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে পুণা-অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে আছে সুরেন্দ্রনাথের ভাষণের জন্য। সভাপতি হিসাবে তিনি সেদিন যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তাহাই এ পর্যন্ত দীর্ঘতম ভাষণ হয়ে আছে। অনেকের মতে তাঁর এই বক্তৃতাটি "regular vade-mecum of the politics of India অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদা অনুসরণ যোগ্য একটি জিনিস। শ্বেতাঙ্গসমাজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা এই বক্তৃতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিল: "The Presidential address of the Poona Congress is an epitome of the political ideas of Mr. S. N. Banerjea" আর মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা লিখেছিল "The most characteristic of all his speeches. Students of Indian politics must get it by heart." বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য দুটির একটিও অতিরঞ্জিত নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, পুণা নগরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ কংগ্রেসের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এর সাত-বছর পরে, ১৯০২ সালে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে আমরা তাঁর পুণা-বক্তৃতা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব।

ছাপার অক্ষরে প্রায় একশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই বক্তৃতাটিকে সত্যই সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার একটি সংক্ষিপ্তসার বলা যেতে পারে। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে এর মধ্যে। কিন্তু শুধু এই কারণেই এই বক্তৃতার গুরুত্ব নয়। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত ও গভীর ছিল তা বুঝতে হোলে এই বক্তৃতাটি যত্নের সঙ্গে পাঠ করতে হয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত নিবিড় ছিল তা জানতে হোলে তাঁর এই বক্তৃতাটি বার বার পড়তে হয়, এবং পড়ে কণ্ঠস্থ করতে হয়। কিন্তু সেজন্যও এর মূল্য নয়। এর মূল্য ও গুরুত্ব এইজন্য যে সমকালীন ভারতবর্ষের একটি বাস্তব চিত্র সেই আমরা সর্বপ্রথম পেলাম। সেই আমরা প্রথম শাসনব্যবস্থার প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে একটি নগ্ন সমালোচনা

পেলাম—পেলাম শাসকের প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ইতিহাস আর ভারতবাসীর দারিদ্র্যের শোচনীয় চিত্রের পাশে শাসকের অপরিণামদর্শিতা যার ফলে শাসনযন্ত্রের অর্থনীতিক ভিত্তি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েছে। মোট কথা, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠকে আশ্রয় করে ইতিহাস-বিধাতা যেন ভারতের ভবিষ্যৎকে অভিব্যক্ত করলেন। এ দুরূহ কাজ সেদিন অন্যের পক্ষে অসাধ্য ছিল। তাঁর এই ভাষণটি তাই অদ্যাবধি কংগ্রেসের ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে আছে। পট্টভি সীতারামাইয়া মিথ্যা বলেননি যে, "his orations are hard to beat; they remain unapproachable." রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হোলে সর্বাগ্রে তাঁর এই পুণা-বক্তৃতাটি যত্নের সঙ্গে পাঠ করতে হয়।

বক্তৃতার প্রথমেই তিনি কংগ্রেস-সভাপতির কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। বলেন: "The highest reward which in these days a public man may receive, next to approbation of his own conscience, is the confidence of his fellow countrymen." সমগ্র জাতির বিশ্বাস যাঁর ওপর ন্যস্ত হবে, তাঁকে তাঁর দায়িত্বসম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে এবং জাতির প্রত্যেকটি অভাব অভিযোগ, সুখদুঃখ ও বেদনার সঙ্গে পরিচিত হোতে হবে, জাতির হৃদয়ের স্পন্দন তাঁকে যেমন অনুভব করতে হবে, বুঝতে হবে, তেমনি শাসকজাতির প্রত্যেকটি পদক্ষেপের উপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে দশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তথাপি 'কংগ্রেস' কি, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা তখনো পর্যন্ত খুব স্পষ্ট হোয়ে ওঠেনি। এ তো কেবল তিন দিনের তামাসা বা সামাজিক সম্মেলন নয়—এই মহাসভার প্রকৃত সংজ্ঞাটি নির্ণয় করে সুরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর বক্তৃতায় বললেন: "Congress is the non-official Parliament of the nation"—তখন সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। তারপর সেই মহাসভার নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি যখন বললেন: "Great as the honour is, far higher is the responsibility. President is not only speaker—he is something more. He voices forth the spirit which animates you in your delibera-

tions, the temper which guides you—" তখন সকলেই বুঝলেন, এই সম্মানজনক পদের দায়িত্ব কী অপরিসীম। জাতির অন্তরে যে প্রেরণা তার সমগ্র সত্তাকে উজ্জীবিত করে কংগ্রেসের কার্যাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রেরণাকে ভাষা দেবেন কংগ্রেস-সভাপতি—তিনি কেবলমাত্র একটি বক্তৃতা পাঠ করে তাঁর কর্তব্য সমাধা করবেন না। রাষ্ট্রগুরুর এই নির্দেশ স্বাধীন ভারতের পূর্ব গৌরব-ভ্রষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিদের একবার স্মরণ করতে বলি। কংগ্রেসের প্রকৃত দায়িত্ব নির্ণয় করে সুরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভার যে অসাধারণ পরিচয় দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে তার আগে বা পরে এমন জিনিস আর দেখা যায় নি। তিনি সেই সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কংগ্রেসের তিনদিনের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে, যেমন-তেমন করে এর কার্যাবলী পরিচালনা করলে চলবে না। একটি পরাধীন জাতির মহাসভা কংগ্রেস, এই বোধের তখনো পর্যন্ত যেমন অভাব ছিল, তেমনি খুব যে শৃঙ্খলার সঙ্গে কিম্বা আন্তরিকতার সঙ্গে এর কার্যাবলী পরিচালিত হোত, তা নয়। তাই সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে বলতে হোল: "The manner in which people conduct themselves at a public meeting is some evidence of their capacity for self-government." স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা যদি আমাদের অর্জন করতে হয় তা হলে শৃঙ্খলাবোধ অপরিহার্য—এই শিক্ষাই সেদিন সুরেন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছিলেন।

কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে এবং এর আদর্শ সম্পর্কে তখনো পর্যন্ত অনেকের মনে কৌতূহল জাগলেও এই বিশ্বাসটা জাগেনি যে, সত্যই একদিন এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ হয়ে উঠবে ও জাতিকে স্বায়ত্তশাসনের তোরণতলে পৌঁছে দেবে। সুরেন্দ্রনাথ তাই বললেন: "Congress movement is enshrined in the hearts of the educated community of India—it excites their deepest reverence, stirs their most earnest enthusiasm—it is the God of their idolatry—it is indissolubly bound up with and forms part and parcel of the life of New India." নবভারতের

জাগ্রত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কংগ্রেস—ইহা জাতির ইষ্টস্বরূপ—এই চিন্তা বাঙালীর স্বদেশপ্রেম থেকে উদ্ভূত। সেদিন ভারতবাসীকে এই চিন্তায় দীক্ষিত করলেন সুরেন্দ্রনাথ। কংগ্রেসের স্বরূপ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা তখনো পর্যন্ত সংকীর্ণ ছিল, ইহা যে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই হিসাবে সর্বজনীন—ইহা তখনো পর্যন্ত আমরা যেন হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারিনি। সেইজন্য সুরেন্দ্রনাথকে মহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে হোল :

"We can not afford to have a schism in our camp. Let it not be said that it is a Hindu Congress, that this is the Congress of one social party rather than that of another. It is the Congress of United India, of Hindus, of Mahommedans, of Christians, of Parsees and of Sikhs—of those who would reform their social customs and those who would not. Here we stand upon a common platform—here we have all agreed to bury our social and religious differences. Ours is a political and not a social movement." "আমাদের এই আন্দোলন সর্বতোভাবেই রাজনৈতিক, সামাজিক নয়," এই কথাটি সুরেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী আর কোনো সভাপতিই এমন পরিষ্কার ভাবে বলেন নি। সেইদিন থেকেই শাসকজাতির চক্ষে কংগ্রেস যেন একটি নূতন মর্যাদা পেল।

এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের একটি উক্তি মনে পড়ে। বরোদায় থাকতে ১৮৯৩-৯৪ সালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি কংগ্রেসকে "Indian un-national Congress' অর্থাৎ বিজাতীয় বলে মন্তব্য করেন। সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ অরবিন্দের এই লেখাটি পড়ে থাকবেন, সেইজন্যই তিনি কংগ্রেসকে ভারতবাসীর ইষ্ট বলে উল্লেখ করলেন।

এক মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ভারতের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলকে নিয়েই এই জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, এ কথাটা তিনি যেমন বোধ করেছিলেন, তেমনভাবে সেদিন খুব

কম জননায়কই চিন্তা করেছিলেন। তাইতো তাঁর কণ্ঠে যেন "শত বীণা-বেরবে" ঝঙ্কৃত হোলো উদার ঐক্যের বাণী। তিনি বললেন—এই কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ভারতের জাতীয় মহাসভা, এখানে সকলের সমান অধিকার। তাইতো তিনি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে অধিকতর compactness ও cohesion-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বললেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে আমরা সবাই যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারি, নতুবা আমাদের বিরোধীরা এই বলে বিদ্রূপ করবে যে, আমরা একদল হুজুগপ্রিয় লোক বছরে তিন দিন একত্রিত হই আর কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করে আমাদের কর্তব্য সমাধা করি। কিন্তু কংগ্রেস যে তদতিরিক্ত কিছু, সেটা বোঝাতে হোলে আমাদের সবাইকে এক অখণ্ড ঐক্যের ভিত্তিতে দাঁড়াতে হবে। তাই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন: "We should be false to ourselves if we do not stand shoulder to shoulder, forgetful of all differences, in the one common endeavour to uphold the national interests."

"To uphold the national interests"—জাতির স্বার্থকে তুলে ধরতে হবে—সুরেন্দ্রনাথের এই কথাটি সেদিনকার রাজনীতিতে যেমন, আজকের দিনের রাজনীতিতেও তেমনি সত্য। এ পর্যন্ত কংগ্রেসের কোনো লিখিত শাসনতন্ত্র বা constitution রচিত হয়নি ; এর রীতিনীতি সবই মুখে মুখে চলে আসছিল। পূর্ববর্তী দুইটি অধিবেশনে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়, এবং একটি কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি—সর্বজনগ্রাহ্য একটি শাসনতন্ত্র রচিত হয়নি। এই ত্রুটির দিকে কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুরেন্দ্রনাথ বললেন: "The time has come when we should have a written constitution. We are fighting a constitutional battle and we should therefore place our organisation upon a constitutional basis. A congress with a constitution would be far more portent for good than a congress without a constitution."*

* ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত) শাসনতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হয়।

এইভাবে প্রারম্ভে কংগ্রেসের কথা আলোচনা করে, অতঃপর তিনি একে একে ভারতশাসন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় অত্যন্ত নিপুণভাবে আলোচনা করেন। সে আলোচনার ধারা অনুসরণ করলে পরে সুরেন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হোতে হয়। কংগ্রেসের শৈশবকালে এর লালন-পালনে রাষ্ট্রগুরুর কৃতিত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী শুধু দুজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন—ফিরোজ শা মেহতা আর দাদাভাই নৌরজী। গান্ধী-যুগের সকল নেতাই কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাটি বিস্মৃত হোতে চেয়েছেন; সেইজন্যই আজকের বাঙালী সন্তানদের বলি—রাষ্ট্রগুরুর স্মৃতিকে অবহেলা আর উপেক্ষা থেকে উদ্ধার করে তাঁর গৌরবের পুনর্বাসনে তোমরা আজ মনোযোগী হও। আর কিছু না পার, কেবলমাত্র তাঁর এই পুণ্য-বক্তৃতাটি একবার পাঠ করতে চেষ্টা করো। তা হোলেই বুঝবে কোথায় তাঁর মহত্ব। থাক সে কথা। তাঁর সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ যেসব বিষয়গুলির আলোচনা করেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই; আমরা শুধু কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করব। দশ বছরের কংগ্রেসের খতিয়ানে দেখা গেল যে বিচারবিভাগ (Judicial) থেকে প্রশাসনিক (Executive) বিভাগের পৃথক করা নিয়ে আন্দোলন থেকে শুরু করে পাবলিক সার্ভিসকমিশন প্রভৃতি বহু বিষয়ে আন্দোলন করে কংগ্রেস অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মতে এই দশবছরে জাতীয় মহাসভার নৈতিক সাফল্যলাভ আরো বেশি। দেশের মধ্যে একটি নূতনভাব (New spirit) এনেছে কংগ্রেস—জাতিকে করেছে এক নূতন চেতনায় উদ্দীপিত। আর সকলের উপর "It has brought together the scattered elements of a vast and diversified population—it has welded them into a compact and homogenous mass—it has made them vibrate with the new-born sentiment of an awakened nationality—it has unified them for the common purpose of their political enfranchisement"—ভারতবাসীর রাজনৈতিক ভোটাধিকারলাভই ছিল সুরেন্দ্রনাথের আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনা।

১৮৯২ সালের নূতন বিধান অনুযায়ী পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক-সভা সম্পর্কে কংগ্রেস-সভাপতিরূপে অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'Are we satisfied with it and the manner in which it is worked? I am afraid we must answer the question in the negative." বাংলাপ্রদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অঙ্ক কষে তিনি সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এই বিরাট প্রদেশের সাত কোটি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছে মাত্র সাতজন নির্বাচিত সদস্য। এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তটি তিনি তুলনা করে বলেন যে, সেই দেশে চার কোটি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছে ছয়শত সত্তরজন নির্বাচিত সদস্য। সুতরাং সম্প্রসারিত কাউন্সিলে "living representation" বা যথার্থ প্রতিনিধিত্ব যে আজো সম্ভব হয় নি, সেই কথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন : "The Councils have been enlarged but in no sense so as to provide even a tolerably moderate representation of the people." শুধু তাই নয়। পুনর্গঠিত কাউন্সিলে right of interpellation বা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা করার অধিকার কিছুই স্বীকৃত হয়নি—এও তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। বস্তুত জাতির এই মৌল অধিকার, গণতন্ত্রের এই মূলনীতির জন্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাষণে যেসব কথা বলেছিলেন এবং যে ভঙ্গিতে বলেছিলেন আর সেইসঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য কোথায় বার্ক কি বলেছেন, জন ব্রাইট কি বলেছেন সেইসব উদ্ধৃতি যেভাবে দিয়েছিলেন, তা অনুধাবন করলে পরে তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হোতে হয়।

বক্তৃতার অন্যত্র তিনি ভারত সরকারের আয়-ব্যয় (Finance) নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন : "The financial test is the most crucial. Judged by it our position is truly deplorable. It is no exaggeration to say that the financial position of India is one of ever-recurring deficit and of ever-increasing debt... Debt and deficit represent the order of the day." এইখানে তিনি নিপুণ তথ্য সহকারে গত ষাট বছরের (১৮৩৪ থেকে ১৮৯৪) সরকারী

আয়-ব্যয়ের চিত্রটি তুলে ধরে বলেছিলেন : "During the period we have had 34 years of deficit amounting to, in round numbers, 83 crores of rupees and 26 years of surplus amounting to 42 crores of rupees in round numbers, with the net result that we have a net deficit of about 41 crores of rupees...our debt kept apace with deficit. They are twin sisters which march apace. It must be so in the nature of things." বলেছিলেন, "বছরে গড়ে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা করে ঘাটতি হচ্ছে। ক্রম-বর্ধমান ঘাটতি ক্রম-বর্ধমান দেনাকে বাড়াবেই। আমরা দেউলিয়া হইনি বটে, তবে দেউলিয়া হবার পথে দাঁড়িয়েছি।" বলেছিলেন, কাউন্সিলে সরকারী বাজেট-বিতর্ক একটা প্রহসন মাত্র। বলেছিলেন : "Increase of military expenditure is the root cause of the present deplorable financial position of India."

আয়-ব্যয়ের কথা বলতে গিয়ে 'Home charges' বিষয়টিও তাঁর আলোচনার বহির্ভূত ছিল না। বলেছিলেন : "Home charges have gone on steadily increasing. They constitute a serious drain, and add to the ever-increasing poverty of the country." দাবী করেছিলেন : "Apportionment of the Home-charges between England and India would not only be just, but is desirable." ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথাও তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের অভিমত উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন : "It is no wonder, then, that 40 millions of our people live upon one meal a day. Abject, deplorable poverty is the prolific parent of public disorders. A people groaning under an intolerable load of poverty, with whom existence is a burden, have no interests in the maintenance of the public tranquillity"—সুরেন্দ্রনাথের এই সাবধান বাণী সেদিনও যেমন, আজো এই স্বাধীন ভারতবর্ষে, তেমনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সামরিক বিভাগে তখনো পর্যন্ত ভারতবাসীর নিয়োগ অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। শিবাজী, হায়দার আলী ও রণজিৎ সিংহের দেশের লোকেরা সামরিক বিভাগে সুবাদার-মেজরের অতিরিক্ত পদ লাভে বঞ্চিত ছিল। তাই সামরিক বিভাগে অধিকতর উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগের দাবী করে সুরেন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন: "This ostracism of a whole people, the exclusion of the representatives of the military races in India from high command in the Army, cannot add to the strength and stability of the Empire." সেদিন এই দাবীর প্রয়োজন ছিল। কেন না, ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ সেদিন শুধু তার সাম্রাজ্যই রক্ষা করেনি, আবিসিনিয়ার রণাঙ্গনে অথবা আফগান যুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যেই তাদের জয়লাভ ঘটেছিল। তাইতো সুরেন্দ্রনাথ সামরিক বিভাগে অধিকতর ভারতীয়ের নিয়োগ ও সামরিক শিক্ষালয়ে তাদের প্রবেশলাভের জন্য কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এই দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভ্রান্ত পরিচয় মেলে এইখানে।

ভাষণের উপসংহারে সুরেন্দ্রনাথ বললেন: "Trust in the people, confidence in the ruled, is the secret of successful Imperial policy." এখানে তিনি আকবরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন আর সেই সঙ্গে ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন—শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতবাসীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে, কেবলমাত্র 'কালা আদমী' বলে এই দাবী অগ্রাহ্য করলে চলবে না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর উক্তি স্মর্তব্য। বলেছিলেন: "I am bound to say that the Government expenditure on education is small when compared with similar expenditure incurred in other countries and it is inadequate to the growing requirements of a progressive country like ours." এখানে একটি তুলনামূলক চার্ট দ্বারা তিনি তাঁর সমগ্র বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

জাতীয়জীবনে জাগরণ এসেছে, এই সত্যটি উপলব্ধি করে ভাষণের শেষে

সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "A wave of unrest is passing through this country. It is the unrest of discontent—it is the unrest which is the first visible sign of the awakening of a new national life...The noblest heritage we can leave to our children's children is the heritage of enlarged rights and the fervent enthusiasm of an emancipated people."

সেদিনের নবজাগ্রত ভারতবর্ষের প্রাণ-স্পন্দন হৃদয় দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কিভাবে অনুভব করেছিলেন, জাতির স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা যে কেবল আকাঙ্ক্ষা মাত্র নয়, ইহা যে প্রত্যক্ষ সত্য এবং সেই সত্যকে আমরা যে আমাদের ধমনীর শোণিতপ্রবাহের মধ্যে পোষণ করি—কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের ইহাই ছিল মর্মবাণী। মডারেট তিনি ছিলেন সত্য, তাঁর ভাষণে রাজানুগত্যের কথা যে ছিল না তা নয়, আমাদের রাজনৈতিক চেতনার গুরু যে ইংলণ্ড, এ কথাও তিনি বলেছিলেন এবং ইংরেজের ন্যায়বিচার ও উদারতার ওপর তিনি অবিচলিত বিশ্বাসও পোষণ করতেন, এসবই সত্য—তথাপি মহাকালের গতি ও প্রকৃতি অনুসরণ করে, শাসকজাতিকে সতর্ক করে সেই সুরেন্দ্রনাথই বলতে পেরেছিলেন : "It is the unrest which is the first visible sign of the awakening of a new national life." নবজাগ্রত ভারতের জাতীয়-জীবনের উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে সেদিন এমন ভাবে প্রত্যক্ষ করতে আর কোন্ জননেতা পেরেছিলেন ?

সুরেন্দ্রনাথের এই সুচিন্তিত ভাষণটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। পুণা থেকে নভেম্বরের গোড়ার দিকে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে তারযোগে সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনের সভাপতি হবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেইদিনই তিনি ধন্যবাদসহকারে তারযোগে ঐ নিমন্ত্রণগ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখনকার দিনে কংগ্রেসের সভাপতি-পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোত না ; অভ্যর্থনা-সমিতিই সভাপতি মনোনীত করতেন এবং তাঁদের মনোনয়নই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হোত। কেউ প্রতিবাদ করত না।

সভাপতির পদ গ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণ রচনায় প্রবৃত্ত হোলেন। নিঃসন্দেহে এ একটি বিরাট কাজ। বিরাট এবং মহৎ। কলেজে অধ্যাপনা, 'বেঙ্গলী' সম্পাদনা ও পরিচালনা, কর্পোরেশনে কমিশনারের কাজ—এইরকম দায়িত্বপূর্ণ বিবিধ কাজের মধ্যে থেকে তিনি কি ভাবে এই ভাষণটি রচনা করেন তা জানলে সত্যিই আশ্চর্য হোতে হয়। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন: "প্রত্যহ বেলা দু'টার সময়ে আমি কলিকাতা থেকে আমার ব্যারাকপুরের বাড়িতে ফিরে আসতাম এবং অভিভাষণ রচনায় মনোনিবেশ করতাম। ঐ সময়ে আমি কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতাম না। বাড়িতে তখন আমি একা, কারণ আমার এক পুত্রের অসুখের জন্য পরিবারস্থ সকলেই এলাহাবাদে অবস্থান করছিলেন। প্রতিদিন দুঘণ্টা করে আমি অভিভাষণ রচনায় প্রবৃত্ত থাকতাম। তারপর পৌনে একঘণ্টা গঙ্গার তীরে বেড়াতাম। ভ্রমণকালে লিখিত বিষয়টি মনে মনে পুনরালোচিত ও সংশোধিত হোত; পরে বাড়ি ফিরে এসে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুলিপিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন. পরিবর্জন ও সংস্কার-সাধন করতাম।"

এইভাবে একাদিক্রমে প্রায় দেড়মাসকাল—দিনের পর দিন তিনি অভিভাষণ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজ একাগ্র মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করা তাঁর শক্তিতে যতদূর সম্ভব কুলিয়েছিল তা তিনি করেছিলেন। এমন সুদীর্ঘ আর সুচিন্তিত অভিভাষণ কংগ্রেসে খুব অল্পই পঠিত হয়েছে। কথিত আছে, এই বক্তৃতাটি পাঠ করতে সুরেন্দ্রনাথের চার ঘণ্টার উপর সময় লেগেছিল এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি এই সুদীর্ঘ অভিভাষণ মুদ্রিত কপি না দেখেই পাঠ করেছিলেন, একবারও মুদ্রিত একটি পৃষ্ঠার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় নি। কংগ্রেসে সমবেত পাঁচহাজারের উপর শ্রোতা বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে তা শুনেছিলেন। বাগ্মিতার মতো তাঁর স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ ছিল। অনেক সময় এমন হয়েছে যে তিনি বক্তৃতা করতে এসে বেঙ্গলীতে ছাপাবার জন্য তা অবিকল লিখিয়ে দিতেন। কখনো কখনো বক্তৃতা করতে যাবার আগেই, যা বলবেন তা অবিকল বেঙ্গলীর জন্য লিখিয়ে দিয়ে যেতেন। পুণা কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতার খুব প্রশংসা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান ও সুলেখক স্যর হারবার্ট রিজলী তারযোগে

সুরেন্দ্রনাথকে এ জন্য প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র এই বক্তৃতার মধ্যে বন্ধুর জ্ঞানের পরিধি ও চিন্তার রীতি দেখে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এক পত্রে তিনি বলেছিলেন: "সুরেন, ভারতের রাজনীতিতে তোমার সমকক্ষ কেউ আছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না।" পুণার বক্তৃতা সুরেন্দ্রনাথকে প্রভূত খ্যাতি এনে দিয়েছিল। খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি। একজন অধ্যাপক ও পলিটিক্যাল agitator, বাংলার বাইরে এমন বিপুল সম্মান লাভ করেছেন, এতে সরকার কিছুটা বিচলিত বোধ না করে পারেন নি। পুণা-কংগ্রেসে আর একটি ব্যাপার ঘটেছিল। কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী সমাপ্তি-ভাষণ সভাপতিকেই দিতে হোত। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন: "সমাপ্তি-ভাষণের পর যখন আমি উপবেশন করলাম তখন আমার পায়ের ধুলো নেবার জন্য যুবকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। সেদিনের সেই স্মৃতি আমার জীবনে সবচেয়ে গৌববের স্মৃতি—আমার হৃদয়-পট থেকে তা কখনো মুছে যাবে না।"

কিন্তু রাষ্ট্রগুরুর স্মৃতি আমরা আজ কতটুকু মনে রেখেছি?

॥ তেরো ॥

কার্জনী শাসনের আমল।

ভারতে ইংরেজ-শাসনের কালে লর্ড কার্জনের আমলই ছিল বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে, ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে আর কলিকাতার পৌরসভার ইতিহাসে কার্জনের সময়টা নানা কারণে প্রসিদ্ধি ও কুখ্যাতি—ছুই-ই অর্জন করেছিল। একমাত্র কার্জন-সম্পর্কেই বিক্ষুব্ধ বাঙালী সেদিন একটি বিশেষণ রচনা করেছিল—'দুর্জন'। এর আগে রাজপ্রতিনিধি এদেশে আরো অনেকেই এসেছেন, কিন্তু একমাত্র কার্জনই তাঁর চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য 'দাম্ভিক' ও 'দুর্জন' বলে এই দেশের ইতিহাসে পরিচিত হোয়ে আছেন চিরকালের মতো। বাঙালীর পক্ষে কার্জনকে বিস্মৃত হওয়া তাই কঠিন, কার্জনী আমলকে বিস্মৃত হওয়া আরো কঠিন। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হোতে তখন আর মাত্র দুবছর বাকী যখন এদেশে শাসনব্যবস্থার রঙ্গমঞ্চে কার্জনের আবির্ভাব হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত এই কার্জন সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত 'ইকনমিক হিস্ট্রি' গ্রন্থে লিখেছিলেন: "An autocratic rule was his ideal." সত্যই কার্জনী শাসনকাল স্বৈরাচারী শাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। এই স্বৈরাচারী কার্জনের বিরুদ্ধে, তাঁর প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিভাবে দাঁড়িয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর আমরা তাঁর জীবনের সেই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

কিন্তু তার আগে সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করব। ১৮৯৭ সালে বিলাতের পার্লামেণ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের নাম 'ওয়েলবি কমিশন'। লর্ড ওয়েলবি ছিলেন এর সভাপতি আর স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, মিস্টার ডাব্লিউ. এস. কেইন ও দাদাভাই নৌরজী ছিলেন এর সদস্য। ভারত-সরকারের ব্যয় এবং ভারত ও বিলাতের মধ্যে

রাজস্ব সংক্রান্ত সম্বন্ধ মীমাংসার জন্য এই কমিশনটি গঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে এই কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্য চারজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়; যথা, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, স্যর দিনশা ওয়াচা ও সুব্রহ্মণ্য আয়ার। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার পর সাক্ষ্য দেবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত করেছিলেন তার বিবরণ তিনি আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিলাতে গিয়েও তিনি পনর দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর বক্তব্য তৈরি করেছিলেন। সাক্ষ্যগ্রহণের দিন সকাল এগারটা থেকে বেলা চারটা পর্যন্ত তিনি একভাবে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে সকলকে বিস্মিত করেন। এমন একটি জটিল বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বিশদ পরিচয় পেয়ে কমিশনের সভাপতি স্বয়ং ওয়েলবি সাহেব যারপর নাই বিস্ময় বোধ করেছিলেন। গোখ্‌লের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও ওয়েলবি কমিশনে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য প্রদানের রীতি দেখে তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেন। ইহাই সুরেন্দ্র-প্রতিভার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যখন যে বিষয়ে কিছু বলবেন বা করবেন মনস্থ করতেন, তখন সেই বিষয়টি সম্পর্কে যা যা জানবার ও বুঝবার আছে তা আয়ত্ত করবার জন্য পরিশ্রম করতে তিনি কাতর হোতেন না। এই সুদৃঢ় বনিয়াদের উপরই গঠিত হয়েছিল তাঁর পঞ্চাশ বছরের জননায়কত্ব—এই কথাটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

কার্জনের আবির্ভাবকালকে সুরেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "১৮৯৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক গগন ঘন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়েছিল। সরকারের দমননীতি ও তার ফলে গণবিক্ষোভে এর প্রকাশ দেখা যায়। তার উপর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া দেশের উপর পড়েছিল। প্লেগের প্রতিষেধক কতকগুলি বিধিব্যবস্থা পুণা শহরে এমন কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হয় যে জনসাধারণের উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। এর পরই দুইজন ইংরেজ কর্মচারী হত্যা, নাটু-ভ্রাতাদের নির্বাসন এবং বোম্বাই প্রদেশে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটনে সমগ্র দেশে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই বিক্ষুব্ধ সময়েই লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। পার্লামেণ্টের এই বিশিষ্ট সদস্যের নিকট আমরা অনেক কিছু আশা করেছিলাম যদিও সম্পূর্ণ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি নি।"

সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে নাটু-ভ্রাতাদের নির্বাসনের যে কথা উল্লিখিত হয়েছে সেই বিষয়ে প্রসঙ্গত কিছু বলব। ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ এই দুই বৎসরেই বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ভারতের রাজনীতিতে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই লোকমান্য টিলকের প্রতিষ্ঠা। এই নির্ভীক তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিকের প্রতিভা, তাঁর চরিত্রের যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তার সম্যক প্রকাশ এই সময়েই। প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর জন্য তাঁর একক প্রচেষ্টায় যে সংকটত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছিল তা এদেশের সংকটত্রাণ-কাজের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে দিয়েছিল সেদিন। সরকারীভাবে প্লেগদমনের যে ব্যবস্থা হয়, তা এর অনেক পরে; কিন্তু এই প্লেগ দমন করতে গিয়ে সরকার যা কাণ্ড করে বসলেন তার ফলে লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। হিন্দুর অন্তঃপুরের শুচিতা পর্যন্ত বাদ যায় নি। পুণার অধিবাসীগণ তখন সেই কারণে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে প্লেগ কমিটির সভাপতি ও প্লেগ অফিসার র‍্যাণ্ড সাহেব এবং লেফন্যণ্ট আয়ার্স্ট নিহত হন। এরই পরিণতি পুণার বিশিষ্ট নাগরিক নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনা বিচারে নির্বাসন এবং টিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড।

১৮৯৭ সালের অমরাবতী কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ নাটু-ভ্রাতৃগণের নির্বাসন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পুণা কংগ্রেসে তিনি এঁদেরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এদেশে অপ্রচলিত রেগুলেশন আইনের প্রয়োগ সেই প্রথম; এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বদেশীযুগে ১৮১৮ সালের রেগুলেশন আইনে বাংলার কয়েকজন নেতার নির্বাসন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসন ও তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য তীব্র সমালোচনা এবং নিন্দা করেন। সেদিন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে মডারেট সুরেন্দ্রনাথই বলতে পেরেছিলেন: "Was it the reward of their (The Natu Brothers) efforts for their countrymen, or was it a bureaucratic device to strike terror into the hearts of the people ?"

রেগুলেশন আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। লর্ড মিণ্টোর আমলে, ১৯০৮ সালে বাংলার উপর যখন এই বজ্রদণ্ড অতর্কিতে নিপাতিত হয় তখন তিনি বলেছিলেন: "A bad law in

the hands of rulers owing no responsibility to the people is apt to be worked in a manner that often creates great public dissatisfaction," এইভাবে শাসকজাতিকে প্রতিপদে তিনি সতর্ক করে দিতেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার এ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শাসন-নীতির কঠোরতা জনসাধারণের মনে কিভাবে অশান্তি ও অসন্তোষের সঞ্চার করে, কার্জনের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমরা তা কতকটা বুঝতে পারি।

এক মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে লর্ড কার্জন তাঁর কর্তব্যভার গ্রহণ করে এদেশে এলেন। আবার এই পরিবেশেই ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বৈঠক বসেছিল। সভাপতি—আনন্দমোহন বসু। আনন্দমোহন তখন গুরুতর অসুস্থ যখন মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির নিমন্ত্রণ এসে পৌছল তাঁর কাছে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং চিকিৎসকগণ সকলেই তাঁকে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁর যে কর্তব্য ছিল তারই প্রেরণায় তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন। শারীরিক এই অবস্থায় তিনি যে অভিভাষণ রচনা ও পাঠ করেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা দুর্লভ। মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে কার্জন এদেশে পদার্পণ করেন। রাজানুগত্য ও রাজভক্তি প্রদর্শন তখনকার কংগ্রেসের একটি বিশেষ রীতি ছিল। এই রীতি অনুসারে মাদ্রাজ কংগ্রেসে লর্ড কার্জনকে স্বাগত জানিয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করবার ভার ন্যস্ত হয় সুরেন্দ্রনাথের উপর। ভারতের বড় লাট পদে নিযুক্ত হবার অব্যবহিত পরেই লর্ড কার্জন লণ্ডনের এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছিলেন: "I love India, its people, its history, its government, the complexities of its civilisation." অর্থাৎ আমি ভারতকে ভালবাসি, এর অধিবাসী, এর ইতিহাস, এর শাসননীতি এবং এর বিচিত্র সভ্যতা ও জীবনযাপন পদ্ধতির উপর আমার অনুরাগ আছে।"* ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে কার্জনের এই অনুরাগই শেষে বিরাগে পরিণত হয়েছিল। ঐ একই সময়ে অপর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "ভারতের রাজ-প্রতিনিধির প্রধানত দুটি গুণ থাকা

* *Life of Lord Curzon* : Ronaldshay

চাই—সাহস এবং সহানুভূতি।" সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন: "সাহস তাঁর প্রচুর ছিল, তবে সে সাহস জনমতকে উপেক্ষা করবার এবং শাসিত সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে নিজের আদর্শকে বড়ো করে দেখবার সাহস। সহানুভূতি তাঁর অতি অল্পই ছিল।"

সত্যের খাতিরে এখানে একটি কথার উল্লেখ করব। লর্ড কার্জন অথবা তাঁর শাসননীতি সম্পর্কে আমাদের যতই বিরূপ মনোভাব থাকুক না কেন, তবু তিনিই একমাত্র রাজ-প্রতিনিধি যিনি বলেছিলেন—"আমি ভারতকে ভালবাসি, এর সভ্যতার প্রতি আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি।" তাঁর সেই অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় তিনি এই দেশের ইতিহাসে চিরকালের মতো রেখে গিয়েছেন তাঁর প্রবর্তিত "Preservation of the ancient Monuments of India Act"-এর মধ্যে। এই একটিমাত্র আইন প্রণয়ন দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে তার অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে ভারতবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

যাই হোক, প্রস্তাব-উত্থাপন প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কার্জনের কথারই পুনরুক্তি করেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নূতন রাজ-প্রতিনিধিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন বলে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। লর্ড কার্জনের সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সুরেন্দ্রনাথের মাত্র দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর আদেশে তিনি কখনো বড়লাটের নিকট যাননি। না যাবার কারণ এই যে, কার্জনী-নীতি সুরেন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। তাঁর প্রতিক্রিয়ামূলক নীতি আর ভারতের জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন—সুরেন্দ্রনাথের নিকটে ইহা অসহ্য ছিল। ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত-সভার পক্ষ থেকে কার্জনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং লাটভবনে গিয়ে প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেন ও মানপত্রটি পাঠ করেন। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় টাউন হলে ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসভায়, শেরিফের আহ্বানে এই সভার আয়োজন হয়েছিল। বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছিল। কার্জন সভাপতি, বক্তা সুরেন্দ্রনাথ। ঐন্দ্রিলার ন্যায় সুসজ্জিতা লেডি কার্জন বসেছিলেন মঞ্চের উপর। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ও

পুলকিতচিত্তে ঘন ঘন করতালি দিয়েছিলেন। বক্তৃতা শেষ হোলে কার্জন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের করমর্দন করে বলেছিলেন, "বেশ বক্তৃতা করেছেন।"

ইতিমধ্যে 'ম্যাকেঞ্জী' আইন পাশ হোয়ে গিয়েছে। দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চারিদিকে একটা বিক্ষোভের পরিবেশ। ১৮৯৯। লক্ষ্ণৌ নগরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সভাপতি—রমেশচন্দ্র দত্ত। একবছর আগে যিনি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে নবীন রাজপ্রতিনিধিকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন. একবছর পরে সেই সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যে প্রস্তাবটি তুলেছিলেন তার মধ্যে কার্জনের প্রতি ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবিশ্বাস ও সন্দেহ অভিব্যক্ত হোল। জনসাধারণের হাত থেকে নাগরিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিয়ে লর্ড কার্জন দেশে যে বিক্ষোভের এবং দেশবাসীর মনে যে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিলেন তাকে সেদিন ভাষা দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হোয়ে শুরু হোল বিংশ শতাব্দী।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠল।

কালের গতি অবিচ্ছিন্ন। নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। স্রোতে জোয়ার-ভাটা আছে কিন্তু বিচ্ছেদ নেই। তাই যে শতাব্দী আজ বিগত হোল, তার সঙ্গেও বর্তমান শতাব্দীর বিচ্ছেদ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশ বছরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিরাট তরঙ্গ উঠেছিল—সে তরঙ্গ গিয়ে আঘাত করেছিল অতলান্তিকের অপর পারে এবং টেমস ও টাইবর নদীর তীরে। বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পাশ্চাত্য অভিযান এই শেষ দশকের ঘটনা। এঁরা সকলেই বাঙালী এবং এঁরা দশবছর কালের মধ্যে একের পর এক য়ুরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে বলে এলেন ঃ যদিও আমরা পরাধীন এবং তোমরা স্বাধীন জাতি, তবু দেখ আমাদের দর্শন, আমাদের ধর্ম আর দেখ আমাদের সভ্যতা। তোমাদের এসব নেই। আমাদের কাছে এসব শিখতে পারো তোমরা। আর এই দশবছরে রাজনীতির ক্ষেত্রে একা সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর স্বায়ত্তশাসনাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াপন্থী

সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম চালিয়েছেন তা আমরা দেখেছি। আর দেখেছি ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি ঘোষণা করেছেন: "Congress is the non-official Parliament of the nation"—শুধু ঘোষণা করে ক্ষান্ত হননি, জাতীয় মহাসভা যাতে সমগ্র জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ হোয়ে উঠতে পারে, সেই আদর্শকে সামনে রেখে সুরেন্দ্রনাথ একে পরিচালিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর নূতন আবেষ্টনের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, ইতিহাসের কোন্ অংশ সৃষ্টি করবেন, সেই কথাই এইবার আমরা আলোচনা করব। তবে এই যুগে বাংলায় তিনি আর একা নন —এই শতাব্দীর ইতিহাস যাঁরা সৃষ্টি করবেন তাঁরাও একে একে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আসতে আরম্ভ করেছেন। এই নূতন যুগের নায়কদের আমরা দেখতে পাব স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। এঁরা সবাই দ্বাদশ সূর্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান। ইতিহাসে বিখ্যাতদের নামের অন্তরালে এঁদের অনেকের স্মৃতিই আজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যেদিন বাঙালীর বিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে, সেদিন হয়ত এঁদের কর্মকীর্তি, এঁদের ত্যাগ আর জলন্ত দেশপ্রেমের বিস্তারিত কাহিনী আমরা জানতে পারব।

নূতন শতাব্দী নূতন সম্ভাবনা নিয়ে এলো।

জাতীয় জাগরণ তখন জলদর্চিরেখার মতো ইতিহাসের বুকে ক্রমেই ভাস্বর হোয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। জনমত পূর্বাপেক্ষা আরো বেশী সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভারতের ইতিহাস-বিধাতা ভারতবর্ষকে যেন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। দূরদর্শী সুরেন্দ্রনাথ এ জিনিসটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন। জনমতকে অধিকতর প্রবল করে তুলবার জন্য তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকাকে এই বছর থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত করলেন। সেদিন থেকে জাতির জনমত, তার রাজনৈতিক আশা-অভীপ্সা দিনের পর দিন যেভাবে এবং যে ভাষায় বেঙ্গলী-র পৃষ্ঠায়, বিশেষ করে এর সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হোতে থাকে যে, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করতে হয়। সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ দেখা যায় দৈনিক বেঙ্গলীর প্রতিটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে। তাঁর অপূর্ব লিখনভঙ্গী, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক,

এমন কি শিক্ষাসংক্রান্ত ঘটনার নির্ভীক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের গুণে এই-সময় এই পত্রিকাখানি সমগ্র ভারতবর্ষের মুখপাত্রস্বরূপ হোয়ে উঠতে পেরেছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অল্পদিনেই শীর্ষস্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। এই সময়টা যেমন বেঙ্গলী-র গৌরবের মধ্যাহ্নকাল, সুরেন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনের প্রভাব এবং প্রতিপত্তির মধ্যাহ্নকালও এই সময়েই। তখন ভারতবর্ষে নেতা একজনই—তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সংবাদপত্র একখানিই —তাহা সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বেঙ্গলী। এই একটি মানুষ আর একখানি সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই বিংশ শতকের ভারতবর্ষ তার রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

বেঙ্গলী পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হওয়ার কথা রাষ্ট্রগুরু তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল। তিনি লিখেছেন: "পত্রিকাখানিকে দৈনিকরূপে প্রকাশ করবার প্রস্তাব অনেকবার আমার কাছে হয়েছিল। পাছে আমার কর্মজীবন সঙ্কুচিত হয়, এই ভেবে আমি প্রথমে রাজী হইনি; কিন্তু শীঘ্রই আমি বুঝলাম যে ভারতীয় স্বার্থের পোষক ইংরেজি সাপ্তাহিকে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ তৃপ্ত হচ্ছিল না। জাতীয়তার প্রসারের সঙ্গে সংবাদপত্রের চাহিদাও বেড়েছিল এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি ক্রমেই প্রভাব ও জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। অতএব আমাকে অবস্থা ও প্রয়োজন মতো সামঞ্জস্য বিধান করতে হোল। আমার সহৃদয় বন্ধু, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব আমার কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার অন্যতম মালিক উপেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দশবছরের জন্য যৌথ কার-বারের চুক্তি সম্পাদন করে বেঙ্গলী পত্রিকাখানিকে দৈনিকরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হই। ভারতীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে আমাদের বেঙ্গলী পত্রিকাই প্রথম 'রয়টার'-এর* গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হয় এবং সেজন্য কোনোদিন আমাদের ক্ষোভ করতে হয়নি।"

তাঁর সম্পাদকতায় দৈনিক বেঙ্গলী পত্রিকার সাফল্য কি রকম হয় সে বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু বলেন নি। পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব এই সময়ে যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল তাঁর কথা তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন,

* Reuter—ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

"এই সূত্রে পত্রিকার ভূতপূর্ব কর্মাধ্যক্ষ তারাপ্রসন্ন মিত্রের (T. P Mittra—এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন) দুর্লভ অনুরাগ ও ব্যবসাবুদ্ধির উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তিনিই এই পত্রিকাখানির জীবনস্বরূপ ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তিনি এই পত্রিকার উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন।...আমি চল্লিশ বছরের অধিককাল সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে বুঝতে পেরেছি যে, সম্পাদক অপেক্ষা কর্মাধ্যক্ষের উপর সংবাদপত্রের সাফল্য নির্ভর করে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব অগ্রাহ্য করবার নয়; কারণ তিনিই জনমত গঠন করেন কিন্তু পরিচালকদের কর্মকুশলতা আরো অধিক প্রয়োজন।" এখানে সুরেন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন—"সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব" এই কথাটির মধ্যে। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে ভারতবর্ষের জনমত গঠনে যে কয়খানি সংবাদপত্রের নাম উল্লেখযোগ্য, তার প্রত্যেকটির সম্পাদক-পদে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের প্রতিভা ছিল, আর ছিল সেইসঙ্গে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে আমাদের দেশে সংবাদপত্রের চেহারা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, এর চরিত্রও তেমনি বদলে গিয়েছে। তার কারণ যথার্থ ব্যক্তিত্বশালী সম্পাদকের এখন বড়ই অভাব। জনসাধারণের উপর বর্তমানের সংবাদপত্রগুলি তাই পুর্বের ন্যায় আর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, জনমত গঠন তো দূরের কথা।

দশ বছর পরে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকার একক মালিক হন। ১৯১৯ সালে তিনি কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এর ফলে মহারাজা বেঙ্গলী পত্রিকার অন্যতম মালিক হন এবং একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেঙ্গলীকে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার শর্ত গৃহীত হয়। কিন্তু মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তিত পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। বেঙ্গলীর সম্পাদনায় সুরেন্দ্রনাথের সহকারী হিসাবে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (J. L. Banerjee) আর অপরজন বাংলার স্বদেশীযুগের জাতীয়তা-বাদী বা ন্যাশনালিস্ট দলের অন্যতম নায়ক, বাগ্মী এবং লব্ধকীর্তি

সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। জিতেন্দ্রলাল চলে যাবার পর সুরেন্দ্রনাথ শ্যামসুন্দরকে বেঙ্গলীর সহযোগী সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করেন। বেঙ্গলীর সঙ্গে শ্যামসুন্দরের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তিনি নির্বাসন থেকে মুক্ত হবার পর। ব্রহ্মদেশ থেকে সদ্য নির্বাসন-মুক্ত শ্যামসুন্দর তখন নানা সমস্যাপীড়িত। একদিন সেইসময়ে সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সস্নেহ আহ্বান এলো: "পুত্রতুল্য শ্যামসুন্দর, তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি বেঙ্গলী পত্রিকার জন্য লেখ। তোমার রচনার উত্তাল তরঙ্গে আমাদের সকল নৈরাশ্য দূরে যাবে। তোমার ইংরাজী ভাষাজ্ঞান তুলনাহীন, তোমার রচনাবলী বেঙ্গলীকে উজ্জ্বল করবে, ভাস্বর করবে, জয়যুক্ত করবে।" জাতীয়তাবাদী দলের ইংরেজী মুখপত্র 'বন্দেমাতরম্'-এর অন্যতম সম্পাদক হিসাবে শ্যামসুন্দরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন।

বেঙ্গলীর সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ নরমপন্থী বা মডারেট হোয়েও চরমপন্থী বা extremist দলের অন্যতম নেতা শ্যামসুন্দরকে যে তাঁর সহযোগী করেছিলেন তার কারণ মতের পার্থক্যটা এখানে বড়ো ছিল না—বড়ো ছিল শ্যামসুন্দরের সুনিপুণ লেখনী আর তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম। নরমপন্থী হোলেও সুরেন্দ্রনাথ তো মনেপ্রাণে স্বদেশপ্রেমিকই ছিলেন। তাই দেখা যায় যে ১৯১১ সালে শ্যামসুন্দর যখন বেঙ্গলীতে যোগদান করেন, তখন তাঁর লিখবার স্বাধীনতায় তিনি কোনোদিনই হস্তক্ষেপ করেন নি। এই উদারতা ছিল সুরেন্দ্র-চরিত্রের তুলনাবিহীন বিশেষত্ব। ১৯১১ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত শ্যামসুন্দর বেঙ্গলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও শ্যামসুন্দর—এই দুই প্রতিভার মিলনে এই সময়েই বেঙ্গলী পত্রিকা ভারতবর্ষের সংবাদপত্র-জগতে সত্যই এক অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। বেঙ্গলীর স্বর্ণযুগ বলতে এই সময়টাকেই বুঝায়।*

বেঙ্গলী যে বছর দৈনিকে রূপান্তরিত হয় সেই বছরের গোড়ার দিকের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন কংগ্রেস সম্পর্কে ভারত-সচিবকে এই সময়ে এক গোপনীয় ডেসপ্যাচে লিখেছিলেন: "The

* শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীমনোরমা লাহিড়ী প্রদত্ত 'নোট' অবলম্বনে এই প্রসঙ্গটি লিখিত।

Congress is tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise." রমেশচন্দ্র দত্ত তখন বিলাতে। পার্লামেন্টের বহু সদস্যের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। কোনো একটি সূত্রে তিনি কার্জনের এই গোপন ডেসপ্যাচের কথা জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথের গোচরে আনেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনে সুরেন্দ্রনাথের লেখনী খুব সংযত ছিল। কুৎসাবাদ, উত্তেজক রাজদ্রোহ অথবা ব্যক্তিগত গালাগালি—এসব তিনি পরিহার করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন তিনি নিজেই বলেছেন: "সময়ে সময়ে আমি তীব্র ভাষায় লিখতাম বটে—কিন্তু সেইসব সময়ে তীব্র ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হোত বলেই ঐরূপ করতাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জনমত এত বিক্ষুব্ধ ছিল যে সে সময় সংযত ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব হোত না।" কার্জনের ডেসপ্যাচটির কথা জানবার পর সুরেন্দ্রনাথ কলম ধরলেন। লিখলেন একটি সম্পাদকীয়—"*Whose peaceful demise ?*"; পরদিন প্রাতে চায়ের টেবিলে বেঙ্গলীতে এই সম্পাদকীয়টি পাঠ করে কার্জন যারপর নাই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত। বিস্ময়ের হেতু ভারত-সচিবকে লেখা কনফিডেনসিয়াল ডেসপ্যাচের খবর কলিকাতায় বেঙ্গলী অফিসে এলো কি করে; আর স্তম্ভিত হয়েছিলেন সম্পাদকীয়টির রচনা-চাতুর্য দেখে, তার ভাষার তীব্রতা এবং সেইসঙ্গে প্রকাশভঙ্গিতে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা দেখে। সেই থেকে কার্জন যতদিন এদেশে ছিলেন ততদিন প্রত্যহ প্রভাতে বেঙ্গলী না পড়ে অন্য কাগজ পড়তেন। দৈনিক বেঙ্গলীর বহু প্রসিদ্ধ সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে '*whose peaceful demise ?*'—শীর্ষক সম্পাদকীয়টি ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হোয়ে আছে। যে ডাফরিনের অনুপ্রেরণায় মুখ্যত কংগ্রেসের জন্ম, সেই তিনি তিনবছর পরে ঘৃণার সঙ্গে কংগ্রেসকে "microscopic minority" বলে উল্লেখ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই কথার উল্লেখ করে তাঁর সম্পাদকীয়টি আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন কার্জনের উক্তি দিয়ে। "কংগ্রেসের নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই শান্তিপূর্ণ মৃত্যু এই শতাব্দীর অর্ধেককাল অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই হয়ত দেখা যাবে এবং সেদিন আমি হয়ত বেঁচে থাকব না এবং বর্তমানের অনেকেই থাকবেন না।"—সুরেন্দ্রনাথের এই লাইনটির মধ্যে আভাসিত হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। কিন্তু কার্জনের

সদম্ভ উক্তিটি তাঁকে এমনই মর্মাহত করেছিল যে সুরেন্দ্রনাথ একটিমাত্র সম্পাদকীয় রচনা করে ক্ষান্ত হন নি, ১৯০২ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি আরো সুস্পষ্ট উক্তি করেন এই সম্পর্কে। সুরেন্দ্রনাথ ও কার্জনের দ্বৈরথযুদ্ধ—বিংশ শতকের প্রথম দশকের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই দ্বৈরথযুদ্ধে বন্ধুর পাশে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন রমেশচন্দ্র।

এদেশে সকল অনিষ্টের মূল সুরেন্দ্রনাথ, এইরকম একটা ধারণা কার্জনের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই সুরেন্দ্রনাথকে রাজনীতিতে কোণঠাসা করবার জন্য তিনি কিরকম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য। সুরেন্দ্রনাথের কথাতেই বলি। তিনি লিখেছেন: "১৯০১ সালে আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যপদ থেকে বিরত হই। ঐ বছরেই আমি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যপদ প্রার্থী হই এবং এতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। এক বিশেষ অবস্থায় আমার পরাজয় ঘটে। নির্বাচনকালে দেখা গেল আমরা দুজনেই সমান ভোট পেয়েছি। বিষয়টি তখন ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয় এবং আইনানুসারে দুমাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য ছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জন এই রীতির লঙ্ঘন করে তিনমাস পরে যখন আমি বাংলার ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য আর রইলাম না তখন পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিলেন। এইরূপে আমাকে পরাজিত করা হয়। এই কপট ও অসাধু কৌশলের দ্বারা আমায় ভাইসরয়ের সভা থেকে সরিয়ে রাখা হয়।" সুরেন্দ্রনাথ এখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামটা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হয়েছেন। সে বছর কেন্দ্রীয় আইনসভায় সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকে পরাজিত করে আশুতোষই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর আগেও সুরেন্দ্রনাথ কয়েকবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যপদ প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই এক অলক্ষ্য ও রহস্যজনক উপায়ে তিনি পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর নিজের ধারণা এই যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর উপস্থিতি নিরাপদ নয় মনে করেই সরকারী অপকৌশলেই এই অঘটন ঘটেছিল। কার্জনের এক জীবনচরিতকার তাই লিখেছেন: "Mr. Banerjea was a headache to His Excellency ever since he

assumed the Viceroyalty of India."* বৈধ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে দেশকে তিনি ক্রমশঃ বিপজ্জনক পথেই নিয়ে যাচ্ছেন—রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কে এমন উক্তিও কার্জন একবার করেছিলেন।

১৯০২। স্থান—আমেদাবাদ।

কংগ্রেসের এই অষ্টাদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে যখন এই আমন্ত্রণ আসে তখন প্রথমে তিনি সম্মত হন নি। স্যর দিনশা ওয়াচাকে লিখেছিলেন: "আমাকে ক্ষমা করুন। এবার সভাপতি হবার দাবী রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।" তখন দিনশা ওয়াচা তাঁকে আবার লিখলেন: "১৯০২ সালে দিল্লীতে দরবার হবে। সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, এমন অবস্থায় আমাদের মতে আপনারই সভাপতি হওয়া কর্তব্য।" অগত্যা তিনি রাজী হোলেন। আমেদাবাদের কংগ্রেস খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এখানকার অধিবাসীগণ কংগ্রেস-সভাপতিকে যেরকম সম্বর্ধনা করেছিলেন তা বিজয়ী রাজপুত্রের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয় ছিল। এই সম্বর্ধনার উত্তরে সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "আপ াদের এই সম্বর্ধনা আমার ব্যক্তিগত সম্বর্ধনা নয়, যে মহৎ দেশসেবাকার্যের আমি প্রতীক, এ তারই সম্বর্ধনা।"

সুরেন্দ্রনাথের আমেদাবাদ-বক্তৃতা তাঁর পুণা-বক্তৃতার মতোই দীর্ঘ ছিল। তাঁর এইবারকার ভাষণেও পূর্বের ন্যায় ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগের বিস্তৃত ফিরিস্তি থাকলেও প্রধানত তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, যথা, শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা, দিল্লীর আসন্ন দরবার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট। ভাষণের সর্বপ্রথমে তিনি পুণার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন: "The foremost man of his generation, next to Rammohun Roy, the mightiest product of English education, the life, character and achievements of Mahadev Govinda Ranade, constitute a national heritage." কংগ্রেস তখনো পর্যন্ত মুখ্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

* India under Curzon : Lovat Fraser.

ছিল। সেইজন্য দেখা যায় যে, ১৯০০ সাল পর্যন্ত এর কোনো অধিবেশনেই কোনো স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়নি। ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে সর্বপ্রথম একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়। নেতাদের ধারণা ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় প্রদর্শনীর কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না। সুরেন্দ্রনাথেরও সেই ধারণা ছিল। কিন্তু ১৯০১ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের প্রাক্কালে ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (J. Chowdhury ; ইনি সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম জামাতা এবং বিচারপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরীর অনুজ।) প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবক যখন তাঁকে বোঝালেন যে, "যতদিন আমরা আমাদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে না পারিব, ততদিন আমরা স্বদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইতে পারিব না।"—তখন তিনি এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র লিখেছেন: "আমি রাষ্ট্রগুরুকে আরো বুঝাই যে, কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু শিল্প ও শ্রমজীবিরা যতদিন এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক না হবে, ততদিন আমরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হোতে পারব না। কংগ্রেসের সহিত আমি এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী সংযুক্ত করিব বলি। রাষ্ট্রগুরুর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি অন্য নেতাদের আপত্তি লঙ্ঘন করে আমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।"

১৯০১ সালের স্বদেশী প্রদর্শনীর একটা প্রত্যক্ষ ফল এই হয়েছিল যে, তখন থেকে স্বদেশীভাব দেশের লোকের মনে প্রবল হোয়ে উঠতে থাকে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলার রাজনৈতিক প্রভাব আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী-কালে স্বদেশী আন্দোলনের বীজ ছিল এই প্রদর্শনীটির মধ্যে—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। যাই হোক, কলিকাতা প্রদর্শনীর দৃষ্টান্তের অনুসরণে শিল্পনগরী আমেদাবাদ কংগ্রেসেও একটি শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এর উদ্বোধন করেন বরোদার মহারাজা। অতঃপর এই প্রদর্শনী প্রতি বৎসর কংগ্রেসের বাৎসরিক একটি অধিবেশনের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক (adjunct) হিসাবে চলে আসছে। তাঁর সভাপতির ভাষণে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "We the men of the Congress,

regard the industrial and the political movements as indissolubly linked together—we hold that they are interdependent and that they act and react upon each other, and by their mutual interaction swell the volumes of both" এখানে তিনি ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছিলেন যে ওদেশে শিল্পবিপ্লবের পর এসেছে রাজনৈতিক আন্দোলন আর ভারতবর্ষে দেখা গেল ঠিক এর বিপরীত—আগে রাজনৈতিক আন্দোলন, পরে শিল্প। তবে সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত কোনো জাতির পক্ষে শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সরকারী সংরক্ষণ (protection) ব্যতীত শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের শিল্পগুলি তখনো পর্যন্ত তাদের শৈশব অবস্থা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি; অথচ, সুরেন্দ্রনাথ বললেন—"The Government, wedded to the tradition of free trade, will not grant any protection." এমন অবস্থায় জাতির কর্তব্য কি? রাষ্ট্রগুরু নির্দেশ দিলেন: "We can afford our infant industries such protection as may lie in our power—if we realise in our heart of hearts to avail ourselves, wherever practicable, of indigenous articles in preference to foreign goods." দেখা যাচ্ছে, বাংলায় ইতিহাস-বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দের বহু আগে মডারেট সুরেন্দ্রনাথ বিলাতি দ্রব্য বর্জনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন।

এইবার দিল্লী দরবারের কথা। এই বছর (১৯০৩) সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে কার্জন দিল্লীতে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে একটি দরবারের আয়োজন করেন। লণ্ডনে অভিষেক উৎসবে কেবলমাত্র দেশীয় রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কার্জন তাই ভারতের জনসাধারণের মনে একটা impression সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে ব্যয়বহুল এই দরবারের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে ভারতবাসীর চিত্তে রাজভক্তির মাত্রাটাও বাড়িয়ে তোলা তাঁর গূঢ়তম অভিপ্রায় ছিল। এই দিল্লী দরবার সেদিন কি এদেশে, কি ওদেশে তুমুল বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রস্তাবিত

এই অনুষ্ঠানকে "an act of uncalled for extravagance specially at a time when the country is just emerging from the throes of the great famines."—এই বলে অভিহিত করেছিলেন। এই মন্তব্য কার্জনের মনঃপূত হয় নি তিনি বলেছিলেন, যতদূর সম্ভব কম খরচের মধ্যে দরবারের অনুষ্ঠান হবে। যাই হোক ; দরবার হবে, এইটাই সাব্যস্ত করলেন বড়লাট। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন : "The rulers of India may learn a lesson and may take a warning from the statesmanship of the past. History has condemned with unequivocal emphasis the Delhi Durbar of 1877, (সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই দরবারে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।) as an expensive pageant of doubtful utility. The time has passed by when a mere pageant, calculated to dazzle and to astonish can leave an unending impression upon the public mind of India...The pomp and glitter of the show, the fine dresses and equipages set off to the best advantage by the choicest rhetoric will not avail to rescue the Durbar from the corroding influence of time and oblivion. These things will be swept out of view amid the onward rush of events. They will be forgotten. The historic recollection will retain no trace of them."

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তথা সুরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে দরবার সম্পর্কে এমন কঠিন কথা শুনবেন, কার্জন এতটা আশা করেননি। কিন্তু এ সতর্কবাণী উপেক্ষিত হয়, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের পটভূমিকায় দরবারের অনুষ্ঠান কার্জনী রীতিতে সম্পন্ন হয়। রমেশচন্দ্র এই দিল্লী দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিচক্ষণ ঐতিহাসিক এবং অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান। সেই সময়ে 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় এই দরবার সম্পর্কে তিনি যা মন্তব্য করেন তার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী সবই সুরেন্দ্রনাথের মতো তীক্ষ্ণ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। তাঁর সেই মন্তব্য থেকে কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত হোল। তিনি লিখেছিলেন :

"People in India ask today if the Durbar of 1903 is the high-water mark of this tide of Imperialism...Is there no statesman in England in this geneıation who can make a clean sweep of this wasteful and exhausting Imperalism, and stand up for real reforms and redress to the people of India ?"
দেখা যাচ্ছে, সেযুগের দুজন মডারেট নেতা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের অবিমৃষ্য-কারিতা ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কথা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আমেদাবাদ-বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট। ভারতবর্ষে এসে কার্জন অনুভব করলেন যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্বের পক্ষে তার পরিণাম আদৌ আশাপ্রদ নয়। তিনি তাই এই জাতীয়তাবোধের মূলে বিশেষ করে বাঙালীর স্বদেশপ্রেমের মূলে, আঘাত করবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা-সংস্কারের নামে শিক্ষার সংকোচ সাধনে কৃতসংকল্প হোলেন। ১৯০১ সালে এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য তিনি সিমলা শৈলশিখরে একটি গোপন বৈঠকের আয়োজন করেন। কেবলমাত্র ইংরেজ শিক্ষাব্রতীগণ এই বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "এই গোপন বৈঠকে বড়লাট বাহাদুর ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষে তিনি যে নীতি অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন তার মধ্যে গোপনীয়তার স্থান নেই—শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে কোনোরকম গোপনীয়তার প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক, তা বলাই বাহুল্য। কথায় ও কাজে এমন বৈষম্য বিরল। কারণ যে সময়ে ও যে ব্যাপারে গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল সেই ব্যাপারে ও সেই সময়েই ঐ নির্লজ্জ উক্তি করতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কোনো সংকোচ বোধ করেন নি। কিন্তু ইহাই তাঁর নীতি ছিল এবং এজন্য আমরা অনুকম্পা বোধ করতাম, কারণ এই লর্ড কার্জনই পাশ্চাত্য ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।"

যাই হোক, সিমলা বৈঠকের পরই একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। প্রথমে এই কমিশনে একজনও হিন্দু সদস্য ছিলেন না, যদিও এই দেশে উচ্চ

শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রসর আর শিক্ষা সমস্যায় তাঁদেরই ছিল সমধিক আগ্রহ। বেঙ্গলী পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ভারতের জনমত তাঁকে সমর্থন করে। এরই ফলে বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর মিঃ র‍্যালে। সবশুদ্ধ সাতজনকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল—পাঁচজন সরকারী ও দুজন বে-সরকারী সদস্য। ২৭শে জানুয়ারি, ১৯০২ কমিশন গঠিত হয়, ১২ই ফেব্রুয়ারি স্যর গুরুদাস যোগদান করেন আর ৯ই জুন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। *অর্থাৎ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তদন্ত কার্য পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। সেদিন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তেমন বিক্ষোভ, সুরেন্দ্র নাথের মতে, স্মরণীয় কালের মধ্যে আর দেখা যায়নি। ইলবার্ট বিল প্রভৃতি পূর্ববর্তী সমস্ত আন্দোলন এর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া মাত্র টাউন হলে একটি বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সারা ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন। এই রিপোর্টের সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা সেদিন করেছিলেন আরেকজন। তিনি 'ডন্' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ কার্জনের এই শিক্ষা-সংহার নীতির প্রতিবাদ করে বলেছিলেন: "The noblest gift which the British rule has conferred upon India is the boon of high education. It lies at the root of all our progress. The three great boons which we have received from the British Government are High Education, Free Press and Local Self Government, supplemented by the reform and expansion of the Councils. But high education is the most-prized, the most dearly cherished of them all." এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন তিনি যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর। ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষা কমিশনের (১৮৮২) কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন তাঁর এই বক্তৃতায় আর

বাকল্যাণ্ডের বই থেকে* উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সেই কমিশনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে একজন করে প্রতিনিধি গৃহীত হয়েছিল, আর বিশ বছর বাদে, যখন শিক্ষিতের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি তখন কিনা দুজন মাত্র প্রতিনিধিকে কমিশনে স্থান দেওয়া হোল। তাইতো স্বরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "No such principle has been followed in determining the constitution of the Universities Commission" বলেছিলেন, লর্ড কার্জন যদি এর বিপরীত মত পোষণ করেন, তাহলে বুঝতে হবে সরকারী প্রয়াস সত্বেও এই বিশ বছরে এদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোনোই উন্নতি হয়নি। বলেছিলেন, দেশে যখন শিক্ষার বিস্তার সাধন (diffusion of education) একান্ত প্রয়োজনীয় তখন সরকারী ব্যবস্থায় এর সঙ্কোচ সাধন করা হচ্ছে।'

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে কেবলমাত্র স্যর গুরুদাস প্রতিকূল মত পোষণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর মন্তব্যে স্বীয় মত নির্ভীকভাবেই ব্যক্ত করেন। যাই হোক, ইউনিভার্সিটি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমেই প্রবল হোয়ে উঠতে থাকে এবং ভারত সরকারকে আংশিক ভাবে জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল সেদিন। এই বিষয়ে আমি 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' গ্রন্থে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯০৪ সালে ইউনিভার্সিটি বিল আইনে পরিণত হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ হবার পর স্বরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজের উপর তাঁর মালিকানী স্বত্ব ত্যাগ করেন এবং একটি ট্রাষ্টির হাতে ইহা অর্পণ করেন। এর ছয় বছর পরে কলেজের বর্তমান নিজস্ব ভবনটি নির্মিত হয়।

সভাপতির ভাষণের অন্যত্র স্বরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন। "সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উন্নতির পথে প্রবল বাধা। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্য সকলের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে সেবা করা। দাসত্ব করা আর দূরে দাঁড়িয়ে জোড়-হস্তে স্তব-স্তুতি করা এবং বন্দনা-গীত গাওয়া। সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য পাঠিয়েছি—যার ফলে নেটাল রক্ষা পেয়েছে। আমরা চীনে সৈন্য পাঠিয়েছি। আমাদের সৈন্যরা পিকিঙ-এর প্রাচীরে বিজয় পতাকা তুলে এসেছে। আমাদের রাজভক্তির

* *Bengal Under Lieutenant Governors :* Buckland

তুলনা নেই, তা অতুলনীয়। ভারত-সচিবের তা ধারণা করবার শক্তি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি? আমরা নিজের দেশে বিদেশী। অন্যান্য স্বাধীন উপনিবেশগুলির তুলনায় আমরা তাদের মধ্যে ক্রীতদাসের চেয়েও অধম।" মডারেট বক্তৃতায় এরকম ঝাঁজ অন্য প্রদেশের আর কোনো সভাপতি দেখাতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ইহাই। নরমপন্থী বলে চিহ্নিত হোলেও, একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই এমনভাবে ঢেলে সাজাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যার চেয়ে বেশি অধিকার লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী পর্যন্ত দাবী করতে পারেন নি—বাঙালী যেন এই তথ্যটি বিশেষভাবে স্মরণে রাখে।

ভাষণের উপসংহারে সুরেন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই তিনি এই সত্যটা অনুভব করলেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের অবসান হয়েছে। এখন নূতন যুগ নূতন চিন্তা নিয়ে আসছে। তাই তিনি বললেন: "All signs point to the conclusion that the period of reconstruction has now arrived. The forces are there; the materials are there. They lie in shapeless masses. Where is the man of genius who will communicate to them the vital spark and transform them into a new and a higher and grander organisation, suited to our present requirements and fraught with the hopes of a higher life for us and a nobler era for the British rule in India." সেদিন তাঁর এ উক্তির মধ্যে কি অনাগত যুগের নেতার আগমনী ঝঙ্কৃত হয়েছিল? ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তদানীন্তন দেশের অবস্থা যেরকম অসাধারণ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন, আমেদাবাদে তিনি তার চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। আজ মনে হয়, সুরেন্দ্রনাথকে আমরা বুঝবার চেষ্টা করিনি অথবা করলেও তাঁকে ভুল বুঝেছি। ইংরেজের রাজনীতির উৎস থেকে রাজনীতির রস আকণ্ঠ পান করলেও, তিনি স্বাধীনতারই পূজারী ছিলেন। নিখাদ সোনার মতোই ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে তিনি যে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন, তাঁর এই আমেদাবাদ বক্তৃতাতেই তিনি তাঁর অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

॥ চৌদ্দ ॥

আমেদাবাদ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ যখন বলছিলেন : "All signs point to the conclusion that the period of reconstruction has now arrived.' —তখন বিপিনচন্দ্র পাল লিখছিলেন : "কংগ্রেস একটি ভিক্ষুকের দল। কাজ মাত্র বক্তৃতা, যাকে বলা হয় আন্দোলন"।* এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দেশের মধ্যে এক শ্রেণীর নেতার মনে তখন এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কংগ্রেসের আবেদন-নীতি আমাদের শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না, স্বাধীনতা লাভ তো দূরের কথা। এঁরাই ছিলেন তখনকার রাজনীতিতে ন্যাশনালিস্ট বা Extremist নামে পরিচিত। এঁদের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক আর বাংলায় এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, অশ্বিনীকুমার, অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। বাংলার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন বছরে অনেকগুলি বিচিত্র ধারা পাশাপাশি থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, এই ধারাগুলি যোগাযোগ রহিত ছিল না ; এদের পরস্পরের মধ্যে মিল যেমন ছিল, বিরোধও তেমনি ছিল। তবে লক্ষ্য বা আদর্শ প্রায় এক। ইতিহাসের গতি, তার নিয়তি অলক্ষ্যে কাজ করে চলে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। অনন্তর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যেদিন সভাপতিরূপে রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণ-নীতিকে সকলের সামনে তুলে ধরলেন, পরোক্ষে তাই বাংলার রাজনীতিতে চরমপন্থী জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল। তারপর দিল্লী দরবার। ১৯০৩ সালের আরম্ভে এই দরবারকে রমেশচন্দ্র একটি 'mockery ও delusion' বললেন আর ঐ বছরের শেষ ভাগে কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তারপর ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে জনমতের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে কার্জনের

---

* *New India*, 1902 : Bepin Ch. Paul

বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হোল। এর পরের বছরে আবার তেমনি জনমত অগ্রাহ্য করে কার্জনী বিধান—বঙ্গভঙ্গ—সরকারী ভাবে ঘোষিত হয়। এই বিস্ফোরক পরিবেশেই দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন। অতঃপর আমরা এই পরিবর্তিত পট-ভূমিকায় রাষ্ট্রগুরুর জীবনের নূতন পর্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

১৯০০ থেকে ১৯০৬—এই কয় বৎসর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে উল্লিখিত হোয়ে থাকে। এর মধ্যে ১৯০৫ সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার ইতিহাসে। এই বছরে যে নবযুগের সূচনা হয় তার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তথা আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১৯০৫-এ কার্জনী বিধানে বাংলাকে ভেঙে দুভাগ করা হয়। এরই পরিণতি বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন। যে কয়বছর লর্ড কার্জন এদেশের শাসনব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন ঐ কয়বছর তিনি যেন একটা অশান্ত কর্মশক্তির তাড়নায় নূতন নূতন উদ্ভাবনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নূতন একটা কিছু করা চাই—এই ছিল সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও জাঁকজমকপ্রিয় এবং দাম্ভিক ও উদ্ধত-প্রকৃতির রাজপ্রতিনিধির মনের ইচ্ছা। তিনি ভারতবর্ষের মানচিত্রটাই নূতন করে ঠিক করতে মনস্থ করলেন। প্রস্তাব করলেন: বাংলা থেকে সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ বিচ্ছিন্ন করে উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটি এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ এই দুটি জিলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব হয়। সেদিনকার আন্দোলনটা ছিল এই প্রস্তাবেরই অনিবার্য পরিণতি। ১৯০৩ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি লালমোহন ঘোষ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। লর্ড কার্জন প্রতিবাদ শুনবার মতো লোক ছিলেন না। প্রতিবাদ না শুনে তিনি যা করলেন, তারই প্রত্যক্ষ ফল ছিল এই স্বদেশী আন্দোলন। কারো কারো মতে কার্জন বিপরীতে হিত করলেন। "বাঙালীর নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করিতে গিয়া তিনি ইহাকে আরো উস্কাইয়া দিলেন। সেই উস্কানীতে জাতীয়তার দীপ আরো বেশী জ্বলিয়া উঠিল।" চরমপন্থী রাজনীতি এইবার আত্মপ্রকাশ করলো। বিলাতী আদর্শে রাজনীতি চর্চার দিন শেষ হোয়ে এলো। কার্জনী প্রস্তাবের পথ দিয়ে এক নূতন ভাবের প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চললো। তার বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। আমরা শুধু এই পরিবর্তিত অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাটি লক্ষ্য করব।

১৯০৩, ৩রা ডিসেম্বর। লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এলো বঙ্গচ্ছেদের উদ্ধত খড়্গাঘাত। এই সময়ে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট প্রথম উত্থাপন করলেন। আর ১৯১১, ১২ই ডিসেম্বর ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ইংলণ্ড থেকে দিল্লীতে এসে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে দিয়ে যান। হিসাব মতো পুরো আট বছর বাঙালী এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিল। সেদিন এর চেয়ে বড়ো আন্দোলন এদেশে আর দেখা যায়নি। পরেও না। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে সংক্রামিত হয়েছিল। সে ইতিহাস কোনাদিনই ভুলবার নয়, কিন্তু আমরা তা বিস্মৃত হয়েছি। তিনটি স্তরে বিভক্ত আট-বৎসর ব্যাপী বাঙালীর এই ইতিহাস-বিখ্যাত আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস বোধ হয় আজো রচিত হয়নি। কিন্তু হওয়া উচিত। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর আত্মচরিতে এই বিষয়ে অনেকখানি লিখে গিয়েছেন। তাঁর এই বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯০৫-এর সুরেন্দ্রনাথ নূতন কালের নূতন চিন্তায় অনুপ্রাণিত এক নূতন মানুষ। মডারেট তিনি এখনো, কিন্তু জাতীয়তাবোধের এক উগ্র তপস্বী। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের পর কার্জন পুরো দেড় বছর নীরব ছিলেন। তাঁর এই নীরবতা দেখে মডারেট নেতারা আশা করেছিলেন যে, হয়তো দেশব্যাপী প্রতিবাদের মুখে কার্জন বঙ্গভঙ্গের কল্পনা পরিত্যাগ করেছেন। আচম্‌কা তাঁদের মোহভঙ্গ হোল যখন ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই জানা গেল যে ভারত-সচিব বঙ্গ-বিভাগ মঞ্জুর করেছেন। আবেদন-নিবেদন নীতির অসারতা তাঁরা উপলব্ধি করলেন—তাঁরা সমর্থন করলেন স্বদেশী ও বয়কট। দেশ জ্বলে উঠ্‌লো। কার্জনী আঘাত নিয়ে এলো এক অভূতপূর্ব জাগরণ।

১৯০৫।

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। দুর্জন কার্জনের কঠিন আঘাতের ফলে জেগে উঠলো বাংলা, জেগে উঠ্‌লো ভারতবর্ষ। কার্জনী শাসন-নীতি দেবতার আশীর্বাদের মতো কাজ করেছিল সেদিন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে বাঙালী দুর্জয় পণ করলো—বঙ্গভঙ্গ

তারা রদ করবেই। টাউন হলের এক বিরাট জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ কার্জনকে চ্যালেঞ্জ দিলেন: "I will un-settle the settled fact." তিনি আহ্বান করলেন দেশের যুবকদের। "এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করতে আমি যুবকবৃন্দকে আবেদন জানাই।" যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এই সম্পর্কে লিখেছেন: "স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ দেশব্যাপী করবার জন্য আমরা ছাত্র-সম্প্রদায়ের সাহায্য গ্রহণ করা স্থির করলাম। এ বিষয়ে কতকটা ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। আমি ছাত্রাবাস ও হোষ্টেলে গিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সার্থকতা ও বঙ্গভঙ্গে যে দেশের কি অনিষ্ট হবে তা বুঝাতাম। বাইরে যে যুক্তি ও কারণ দেখান হোক না কেন, ভিতরের কথা ছিল, বঙ্গ-ভঙ্গের যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল, শুধু বাঙালীজাতির ভারতবাসীর উপর প্রভাব নষ্ট করান। রাষ্ট্রগুরু যে ভারত সন্তানকে জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে এক মহাজাতিতে পরিণত করবার জন্য গত ত্রিশ বছরের অধিককাল প্রয়াস করছিলেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ করা।...আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মনে স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসলতা বদ্ধমূল করা ও তাদের চরিত্র গঠন করে যাতে তারা মানুষ হয়ে দেশের প্রতি কর্তব্য সাধন করতে পারে।" এই বিরাট ছাত্রসংঘকেই সুরেন্দ্রনাথ সেদিন নিয়মানুগ আন্দোলনের পথে স্বদেশসেবায় আহ্বান করেছিলেন।

সকল দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই দেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালটি সত্যই নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছিল। কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে যে একটা বড়ো রকমের প্রেরণা দিয়েছিল, পরবর্তী কালের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে: "The Swadeshi movement, started immediately in Bengal under the leadership of Sir Surendranath Banerjea, soon became all-Indian in character...In the new era, following the year 1905, nationalism became a religion to the youth of India."* কার্জন চালে ভুল করেছিলেন; তিনি ভেবেছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলা এবং বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁর এই ভুল ভেঙে যায়,

* *An Advanced History of India:* Majumdar, RayChaudhuri & Datta.

যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, বিষয়টি একটি সর্ব-ভারতীয় issue হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের ফলেই।

দেখতে দেখতে ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চললো। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করে প্রজ্বলিত অবস্থায় এসে পৌঁছল। সেই শিখা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নব-জাগরণের প্রাণ-সঙ্গীতে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ, কাব্যবিশারদ, কামিনী-কুমার ভট্টাচার্য আর রজনীকান্ত সেনের গানে এবং বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, শ্যামসুন্দর প্রভৃতির বক্তৃতায় দেশের তরুণ চিত্তে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হোল। ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর লাঠি চলেছে। কার্লাইল সার্কুলারের বলে 'বন্দেমাতরম্' নিষিদ্ধ হয়েছে। জীবনের এ-পারে দাঁড়িয়ে বাংলার বর্ষীয়ান জননায়ক আনন্দমোহন 'মিলন-মন্দিরে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয়-ভাণ্ডারের উদ্বোধন হয়েছে। 'সন্ধ্যা'র ভেরী নিনাদ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। পান্তীর মাঠে একটি সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গৃহীত হয়েছে। অপ্রত্যাশিত গতিতে এইসব এবং আরো অন্যান্য ঘটনা একটির পর একটি ঘটে গিয়েছে এবং সাত বছর প্রভুত্ব চালিয়ে লর্ড কার্জন বিদায় নিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, কাশী কংগ্রেসে লাজপৎ রায় বাংলার এই আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেন আর সভাপতির মঞ্চ থেকে মডারেট গোখলে বাংলার বয়কটের দাবীকে ন্যায্য দাবী বলে ঘোষণা করেন।

১৯০৬। ঘটনার স্রোত যৌবন জল-তরঙ্গের মতো ক্ষিপ্রবেগে আবর্তিত হয়ে চললো। ইতিমধ্যে বরোদার রাজকার্যে ইস্তফা দিয়ে অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় এসে গিয়েছেন। তাঁরই কণ্ঠে ভারতবাসী প্রথম শুনলো: "We want absolute autonomy free from British control." দেশের রাজনীতিতে এ ছিল একেবারেই নূতন সুর। অরবিন্দই ছিলেন এই নূতন রাজনৈতিক ভাবধারার প্রবক্তা। নীরব স্বল্পভাষী এই মানুষটির ললাট-নেত্রের প্রদীপ্ত আগুনে ইতিহাসের দিগন্ত যেন উদ্ভাসিত হোয়ে উঠলো। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। নাগশিশুদের কর্ণে মাভৈঃ মন্ত্র সেদিন শুনিয়েছিলেন এই নাগমাতা। সে কাহিনী স্বতন্ত্র। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে

তীব্রতর ও ব্যাপকতর করে তুলবার জন্য এইসময়ে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দে-মাতরম' প্রভৃতি চরমপন্থীদলের কাগজগুলি কম সহায়ক ছিল না। একা 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সেদিন নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের মুখপত্র হোয়ে দাঁড়িয়ে সরকারের মনে কী চমকের সৃষ্টি করেছিল—সে ইতিহাস কোনোদিনই মুছে যাবার নয়। অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র ও উপাধ্যায়ের লেখনীমুখে সেদিন যে অগ্নিস্রাব দেখা গিয়েছিল, ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা আজ পর্যন্ত অতুলনীয় হয়ে আছে। এঁদেরই চিত্তস্পন্দী রচনার গুণে বাঙালীর স্বদেশপ্রেম একটা জীবন্ত সত্যে পরিণত হয়েছিল—দেশজননী যেন চিন্ময়ীরূপে বাঙালীর কল্পনায় ফুটে উঠলেন।

এই স্বদেশী আন্দোলনে চারণ কবির ভূমিকা নিয়েছিলেন একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনিই গানে গানে এঁকেছিলেন আন্দোলনের একটি মহিমান্বিত রূপ। বাঙালীর হৃদয়বীণাটিকে তিনি এমন একটি সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন যে এতখানি ঐক্যবোধ ও একাগ্রচিত্ততা বাংলাদেশে আর কোনো কালে দেখা যায়নি। সুরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে কবি সেদিন প্রেরণা দ্বারা তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার মহৎ দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দেশের অন্তর্বেদনাকে অমন মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করা তিনি ভিন্ন আর কারো পক্ষে সাধ্য ছিল না। সেদিন বাঙালী জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথের যৌবনদীপ্ত প্রখর মূর্তি সন্দর্শন করে ধন্য হয়েছিল। কবির জীবনে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সংশ্রব সেই প্রথম ও শেষ। এই স্বদেশী আন্দোলনে কবি সক্রিয়ভাবেই যোগদান করেন এবং সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন: "সুরেন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে আমাদের নেতা বলে স্বীকার করে নেবার জন্যে আমি আমার দেশবাসীকে সমবেত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। তিনিই আমাদের নেতা।" এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি উক্তিও স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন: "Fortunately for Bengal, her destiny was then in the keeping of able leaders, under the guidence of Surendra Nath Banerjea." বস্তুত সেদিন বাংলার নবীন ও প্রবীণ সকল নেতাই রাষ্ট্রগুরুর নেতৃত্ব দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। সেই নেতৃত্বকে অস্বীকার করার অর্থ সুরেন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার

যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "To leave out Surendra Nath Banerjea in the history of our national evolution is to leave out the Prince of Denmark in the play of *Hamlet*." এর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাংলার এই আন্দোলন সম্পর্কে কবির একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত হোল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "স্বাধীনতার আন্দোলন পৃথিবীর নানা দেশেই হয়েছে, কিন্তু এমন সুসংযত, সুসঙ্গত, সুপরিকল্পিত আন্দোলন আর কোথাও হয়েছে বলে জানি না। রাজনৈতিক আন্দোলনও যে কতখানি সুষমামণ্ডিত হোতে পারে বাংলাদেশ ইতিহাসে তার একটি দৃষ্টান্ত রেখেছে। রাজনীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাষায় এবং ব্যবহারে রুক্ষ। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তারি একটা স্নিগ্ধ রূপ ছিল, কিন্তু সেটি তার দুর্বলতা নয়, কারণ বৃটিশ সরকারকেও এর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।"

স্বদেশীযুগকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন নি, তাঁদের পক্ষে আজ ধারণা করা অসম্ভব যে একা সুরেন্দ্রনাথ সেদিন কতখানি শক্তি জাতির দেহে মনে সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর অগ্নিস্রাবী রচনা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়ে। কার্জনী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনিই ছিলেন সদা জাগ্রত প্রহরী—তাই তো তিনি পথের নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। এই আটবছরকাল ব্যাপী আন্দোলনের পটভূমিতে রাষ্ট্রগুরুর দেশানুরাগ কী বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় অভিব্যক্ত হয়েছিল তা তাঁরাই প্রত্যক্ষ করেছেন যাঁরা সেদিন তাঁর নেতৃত্বের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের আর একটি উজ্জ্বল অধ্যায় বরিশাল কনফারেন্স। ইহাও একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস হিসাবে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশাল শহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। সভাপতি—আব্দুল রসুল। বাংলার স্বদেশসেবক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সকলেই সেদিন এই সম্মেলনে যোগদান করতে এসেছিলেন এবং রাজপথে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করবার কাল্পনিক অপরাধে রুষ্ট সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। সে স্মৃতি বাঙালীর মনে চিরদিনের মতো মুদ্রিত হয়ে আছে। এই

সম্মেলনেই বোঝা গিয়েছিল যে নবজীবনের ধারা প্রাচীন পন্থা পরিহার করে এইবার নূতন পথে প্রবাহিত হতে চাইছে। বরিশাল কনফারেন্সের প্রাণ ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত—তিনিই ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসামের নূতন লাট ফুলারের আদেশে প্রকাশ্য রাজপথে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি নিষিদ্ধ হয়েছিল। বাখরগঞ্জ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে, লাট সাহেবের এই আদেশ যেন লঙ্ঘন করা না হয়। পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। বরিশালে সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার ও বিচার প্রহসন হয়ত অনেকেরই মনে আছে। সেদিন বিচারাভিনয় শেষ করে ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন যখন সুরেন্দ্রনাথকে বললেন "This is disgraceful," তখন সেই সিংহপ্রতিম পুরুষ কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের উপর বলেছিলেন: "I protest against such a remark—a remark of this kind ought not to come from the court." এমার্সন অমনি ভীম গর্জনে বলেন: "Keep quiet, this is contempt of Court. I draw up contempt proceedings against you." উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ তেমনি অবিচলিত ভাবে বলেছিলেন: "I have done nothing. Do just as you please." তখন এমার্সন একটু নরম হয়ে বললেন: "I give you an opportunity to apologise." সুরেন্দ্রনাথ ধীর সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "I respectfully decline to apologise. I have done nothing wrong."

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বললে কি হবে, তিনি সত্যই অন্যায় করেছিলেন—ইংরেজ শাসকের চক্ষে গুরুতর অন্যায়! তিনি কার্জনী বিধানকে রদ করবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন, যার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে সারা বাংলা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রত্যক্ষ করেন নি, কিংবা মানসচক্ষে এর রূপ কল্পনা করতে পারেননি, তথাপি তিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সমতুল্যই মনে করেছিলেন এবং পূর্বগামী উন্মাদনা ও জনমতের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের অর্থ এরই মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণটি বিচার্য। তিনি লিখেছেন: "কেন প্রত্যেকে এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল? প্রত্যক্ষ

ও বাইরের কারণ দিয়ে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে ইতিহাসের দূরদর্শী ছাত্রের নিকট রহস্য বলে কিছুই নেই। বঙ্গবিচ্ছেদ রদ করবার প্রয়াসে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি নয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে যে জাতীয় জাগরণ প্রকাশ পায় যুগপৎ তারই সঙ্গে স্বদেশীভাবের উদ্ভব হয়েছিল। মানুষের মন পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত নয়। ইহা একটি জীবন্ত রচনা এবং সেজন্য যখনই কোনো নূতন ভাব অনুভূত হয় তখন তা সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের কাজের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।...জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নব চেতনার সঞ্চার হয়েছিল এবং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বেই স্বদেশী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।"

এই বিশ্লেষণ স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই। সেদিন ইংলণ্ডের কোনো কোনো সংবাদপত্র এবং এখানকার শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্রগুলি স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পারম্পর্যকে বুঝতে না পেরে সমস্ত ব্যাপারটিকে একটি বিরাট ভুল ও ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগ বলে মন্তব্য করেছিল। কিন্তু আট-বছর (সুরেন্দ্রনাথের হিসাবে ছয় বছর) ধরে যে আন্দোলনটা চলেছিল তার কার্যকারিতা সকল বিদেশী সংবাদদাতার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন আমাদের জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশের পথ দিয়েই এসেছিল। কার্জন উপলক্ষ মাত্র হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যেদিন ষাট হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ-পত্র গিয়ে পৌছেছিল সেদিন ইংলণ্ডের বিচক্ষণ রাজ-নীতিকরা পর্যন্ত এর প্রচণ্ডতা কিছুটা অনুভব করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই যে বাঙালী একটা আন্দোলন করেছিল একি শুধু আবেগ না তদতিরিক্ত কিছু? জাতীয়তাবোধ সেদিন বাঙালীর হৃদয়ে জীবন্ত ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছিল তাই না স্বদেশী আন্দোলন অমন জয়যুক্ত হোতে পেরেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "প্রথম থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনে তিনটি আদর্শ ছিল, যথা—(১) স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতিগণকে একত্রিত করা; (২) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপন এবং (৩) জন-সাধারণের উন্নতি বিধান করে প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সংযোগ

স্থাপন।···আমার একটি আদর্শ কাজে পরিণত করবার অপূর্ব সুযোগ এই স্বদেশী আন্দোলন এনেছিল বলে মনে-প্রাণে আমি ইহা গ্রহণ করি। প্রদেশের সর্বত্র, এমন কি বাইরেও স্বদেশী সভায় সাধ্যমত যেতাম। অসাধারণ উত্তেজনা ও কঠোর পরিশ্রমের ঐ সময়ে কেহ যথাসাধ্য কাজ করতে কুণ্ঠিত হোত না। সময়ে সময়ে আমরা অজানা দুর্গম স্থানে গিয়ে পড়তাম বলে বিচিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে হোত। কিন্তু আমরা কোনো অসুবিধাই গ্রাহ্য করতাম না, এমন কি ম্যালেরিয়া, কলেরার ভয় আমাদের টলাতে পারত না। আমাদের উৎসাহই রক্ষাকবচের কাজ করত।”

দেশব্যাপী এই জলন্ত উৎসাহের মুখেই সেদিন সরকারী দমননীতি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এই জাগরণ ছিল সর্বাত্মক। এই জাগরণে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায় আর নেপথ্য থেকে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন বাংলার পুরনারীগণ। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলায় স্বেচ্ছাসেবকের দল সৃষ্টি হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা, গান্ধী-যুগের বহু আগে এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive resistance) একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। আজ, এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে, আমরা যখন ১৯০৫-এর বাংলার কথা স্মরণ করি—আর বাংলার সেই স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস মনের মধ্যে আলোচনা করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, একটা বিরাট ও বিপুল সমুদ্রবন্যার মতো স্বদেশী আন্দোলন দেশে এলো। তা কূল ভাঙলো, বাঁধ ভাঙলো, সকল সীমা অতিক্রম করলো। বাঙালী এর জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, কষ্ট সহ্য করেছিল, তাতে লাভ কম হয়নি। এই বন্যার পলি পড়ে সারা দেশে এবং সমগ্র লোকচিত্তে যে উর্বরতা ও ফলোন্মুখতা এনে দিয়েছিল, পরবর্তীকালের সাধনাকে তাই সম্ভব করেছিল এবং এর থেকেই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সাধকগণ প্রচুর ফসল উঠিয়ে-ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন তো একটি আন্দোলন মাত্র ছিল না, এ যেন ছিল নব-জীবনের প্রতি স্তরে নব-জীবনের দুর্বার তরঙ্গাঘাত। সেদিনের সেই অগ্নিগর্ভ চিন্তা ও ভাবধারা, স্বপ্ন ও ধ্যান দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এই আন্দোলন আন্দোলন ছিল না—এ ছিল

অভ্যুত্থান। এ ছিল অভ্যুদয়। একা সুরেন্দ্রনাথ নন, সেদিন আরো অনেকেই একসঙ্গে মিলেমিশে এই আন্দোলনের আভ্যুদয়িক রচনা করেছিলেন।

বাংলায় স্বদেশীযুগে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়, যে দেশাত্মবোধের প্রেরণার উন্মেষ হয়, এক মহারাষ্ট্র ভিন্ন, ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে সেরূপ দেখা যায়নি। বর্তমানে কোনো কোনো অ-বাঙালী ঐতিহাসিক বাংলার এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্বকে লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অবগতির জন্য, এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা (এই আন্দোলনে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল) যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন: "এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজচিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন সহস্রদল কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের জীবনের সর্বপ্রান্তরে নব স্রোতোধারা সৃষ্টি করিয়াছে। এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছে। বাংলা দেশের অগ্নি-সাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যে আদর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছেন, যেভাবে তাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আপনাদের অস্থিপঞ্জর জ্বালাইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন—তাহা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার একক সাধনা।"

সকল দেশেই জাতির অগ্রগামী চিন্তা বিপদের ঝড়কে সঙ্গে করেই প্রবাহিত হয়। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেসব অগ্রগামী চিন্তা ছিল তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ছিল অন্যতম। স্বদেশী আন্দোলনই বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। বৈধ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সাধক সুরেন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে কী অভিমত পোষণ করতেন তা জানতে অনেকেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। যদিও তিনি সন্ত্রাসবাদকে জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে করতেন, তথাপি তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, স্বৈরাচারী শাসনই বাংলা দেশে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন: "বাংলা দেশের কয়েকজন তরুণের মনে অলক্ষ্যে বৈপ্লবিক ভাবের আবির্ভাব হয়েছিল।

অরাজকতা কেউই পছন্দ করে না। হত্যা যে উদ্দেশ্যেই সাধিত হোক না কেন কিংবা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন—সব সময়েই ইহা এক গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সময়ে সরকারী দমননীতির ফলে দেশের তরুণ মনে যে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের তা ভুললে চলবে না।" সন্ত্রাসবাদ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেদিন যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, মেদিনীপুর জিলা সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু তা প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন। এখানে একটি কথা বলবার আছে। "বাংলাদেশে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের সহিত আন্দোলনের স্রোতে ভাসিয়া যতটা নূতন দলের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, ভারতের অন্য প্রদেশের কোনো প্রসিদ্ধ মডারেট নেতা তাহা করেন নাই। মডারেটদের মধ্যেও তাঁহার একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বাঙালী। বাঙালীর স্বদেশীয় স্রোত হইতে তিনি দূরে থাকিতে পারেন নাই।"*

এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সুরাট অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে এর সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করে দেখতে পারেন। এখানে আমরা সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই উল্লেখ করব। একমাত্র বিপিনচন্দ্র পাল ভিন্ন বাংলার চরমপন্থী ও নরমপন্থী (moderate ও extremist) দলের সকল নেতাই সুরাট অধিবেশনে যোগদান করেন। বিপিনচন্দ্র তখন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মামলার দায়ে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হোয়ে বক্সার জেলে বন্দী ছিলেন। মডারেট দলের নির্বাচিত সভাপতি, স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ, অন্যদিকে জাতীয় দল টিলক অথবা লাজপৎ রায়কে সভাপতি করবার জন্য বদ্ধপরিকর। দুই দলে প্রবল সংঘর্ষ আসন্ন হোয়ে উঠলো। এই সংঘর্ষের পরিণতি সুরাটে দক্ষযজ্ঞ। সে দক্ষযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন নেভিনসন সাহেব। কৌতূহলী পাঠক তাঁর বইখানি পাঠ করে দেখতে

* শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশীযুগ : গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

পারেন।* সুরাটে চরমপন্থী দলের বক্তব্য ছিল যে "The political agitation on the lines of the National Congress is a delusion—" আর এই মতবাদকে আশ্রয় করে সুরাটে ন্যাশনালিস্ট দল টিলককে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। মডারেট দলের নামজাদা রথীরা এখানে নাজেহাল হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতামঞ্চে উঠে কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হোল বটে, কিন্তু এর থেকেই সেদিন নূতন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। সে ইতিহাসে মডারেটপন্থীদের কোনো ভূমিকা ছিল না। তার পর ১৯১৬ সালের পর থেকে দেশের লোকের কাছে এই দলের আর কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব রইল না। সে কাহিনী স্বতন্ত্র। সে ইতিহাস বাংলায় সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস।

অতঃপর ঘটনার স্রোত দ্রুতগতিতে বয়ে চললো। ইতিহাসের স্পন্দিত বুকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠলো—মজঃফরপুরের বিস্ফোরণ ইতিহাসেরই বিস্ফোরণ ছিল কিনা বলা শক্ত—তবে ইতিহাসের অনিবার্য গতিপথেই যে এর উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ত্রাসবাদের এই আবির্ভাবে বিচলিত আমলাতন্ত্র দমননীতির সাহায্যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হোল, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হোল। তারপর অতর্কিতে একদিন রেগুলেশন আইনের বজ্র নেমে এলো বাংলার উপর। ১৯০৮ সালের একদিন সকালে সমস্ত বাংলাদেশকে ক্ষুব্ধ করে প্রচারিত হোল যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ আটজন জাতীয়তাবাদী জননায়ক নেতা নির্বাসিত হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমাকেও অনুরূপ দণ্ড দিবার আদেশ হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্যর এডওয়ার্ড বেকারের মধ্যস্থতায় তা বাতিল হয়।"

স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বই তাঁর জীবনের গৌরবময় উচ্চশিখর। এই আন্দোলনই রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও তেজস্বিতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। এইসময়ে

* *The New Spirit in India :* Nevinson

জনগণমন-অধিনায়ক জীবন্ত ভাস্কররূপে তিনি খ্যাতির মধ্য-গগনে অধিরূঢ়। তাঁর এই সময়কার অটুট প্রতিজ্ঞার কথা, তাঁর অনিবার্য সঙ্কল্প পালনের কথা নন্দকুল-ধূমকেতু চাণক্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে গিয়ে সেদিন বার বার সরকারের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি ভয় পান নি বা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান নি। তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স ষাট বছর। সেই বয়সে এই বিরাট জাগরণের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করা, অজস্র সভা-সমিতিতে (এব মধ্যে বহুস্থানে বহু নিষিদ্ধ সভায় তিনি যোগদান করেছিলেন) যোগদান করা, বক্তৃতা দেওয়া—এই সব বিভিন্ন রকমের কাজ করতে তিনি কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করতেন না। সেই যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—কার্জনের settled fact তিনি unsettle করবেন, সেই প্রতিজ্ঞাকে সর্বদা সামনে রেখে সেদিন দেশব্যাপী এই জাগরণ-যজ্ঞে তিনি যেভাবে সমিধ ও আহুতি জুগিয়েছিলেন, চরমপন্থীদের সঙ্গে একযোগে যেভাবে কাজ করেছিলেন, তারই মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল বাংলার সেদিনের মুকুটহীন সম্রাটের নেতৃত্ব আর সেই সঙ্গে তাঁব রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রতিভা। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সেদিন যে সঙ্কট এসেছিল, তাকে তিনি পরিহার করেন নি; যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল তাও তিনি এড়িয়ে যান নি এবং একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই সেদিন সরকারকে এই বলে অভিযুক্ত করতে পেরেছিলেন (একথা তিনি ঢাকায় গিয়ে লর্ড রোনাল্ডসেকে বলে এসেছিলেন) যে, "তোমাদের সহ্যাতীত অত্যাচার ও উৎপীডন ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না।"

১৯০৯। বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী তথা বাঙালীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এক দফা শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন এই বছরে। ইহাই মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার। লর্ড মিণ্টো তখন বড়লাট আর লর্ড মর্লি ভারত-সচিব। ভারতের জাগ্রত জনমত এবং দলনির্বিশেষে সকল নেতাই একযোগে এই সংস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। লর্ড মর্লি দমন-নীতির বিপক্ষে ছিলেন। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের যথার্থ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের শাসনব্যবস্থার ত্রুটীর জন্যই বিপ্লবের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছিল এবং সেইজন্যই শাসনবিধি যাতে দেশীয় নেতাদের নিকট গ্রহণযোগ্য

বিবেচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হন। এরই পরিণতি মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম। লর্ড মিণ্টো অবশ্য দেশের সেই উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় কোনোরকম সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। বড়লাটের ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক সভায় (Executive Council) ভারতীয় সদস্যের মনোনয়ন ও বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যের নিয়োগ—নূতন সংস্কারের মূল বিষয় ছিল এই। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ন্যাশনালিস্ট দলের অন্যতম নেতা, অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় দেশবাসীকে এই রিফর্ম সম্পর্কে সাবধান করে লিখলেন: "This offer of conciliation in one hand and the pressure of repression on the other is a dangerously double-edged policy." তিনি আরো বললেন: "The Reforms are a mockery and a trap and the co-operation expected from the people is not true cc-operation but merely a parody of the same." এবং সেই সময়ে দেশের সামনে ছয় দফা কার্যসূচী-সম্বলিত যে নির্দেশ সেদিন অরবিন্দ দিয়েছিলেন তার মূল কথাটা ছিল—স্বাবলম্বন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আর অসহযোগ। "No control, no cc-operation"—এই ইঙ্গিত দিয়ে সেদিন অরবিন্দ একদিকে যেমন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতিতে একটা নূতন প্রেরণাও এনে দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রত্যাখ্যাত হোল। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "মর্লি-মিণ্টো প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্যমাত্র অগ্রগতি এনেছিল। কেউই এর মধ্যে অসামান্য কিছু দেখেনি কারণ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে প্রস্তাবিত এই সংস্কার বেসরকারী সদস্যদের জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করবার ক্ষমতা দিয়েছিল।" দেখা গেল, এই ভুয়া শাসন সংস্কার মডারেটদেরও কিছুমাত্র প্রলুব্ধ করতে পারল না। ১৯০৯ সালের প্রবর্তিত শাসনবিধি অনুযায়ী সুরেন্দ্রনাথ আইন সভায় প্রবেশ করতে পারতেন এবং তৎকালীন ছোটলাট এডওয়ার্ড বেকারও তাঁকে আইন সভায় প্রবেশ করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই যে

মর্লি বলেছিলেন— Rally the moderates. —সুরেন্দ্রনাথ তা ভুলতে পারেন নি। মডারেটদের প্রতি এমনিতেই তখন দেশের লোকের মনে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন। তাছাড়া, আন্দোলনের প্রাক্কালে তিনিই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন: "বঙ্গবিচ্ছেদ রদ না হোলে আমি আইন সভায় প্রবেশ করব না" এবং এই নূতন সংস্কার যখন প্রবর্তিত হয় তখনো তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রইলেন এবং বাংলার নেতৃস্থানীয় সকলকেই বললেন: "যতক্ষণ বঙ্গভঙ্গ রহিত না হচ্ছে ততক্ষণ নূতন আইনসভা সম্পর্কে আমরা কিছুই করব না।" সুরেন্দ্রনাথ আইন সভায় সদস্য পদপ্রার্থী হোলেন না। প্রকৃতপক্ষে ১৯০১ থেকে ১৯১২—এই বারো বছর সুরেন্দ্রনাথ আইন সভার সঙ্গে অসহযোগ করে বাইরে থেকেই আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

ঐ বছরই ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করতে গিয়ে বিলাতের একাধিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গবিচ্ছেদ ও বিনাবিচারে নির্বাসনের বিরুদ্ধে যেসব বক্তৃতা করেছিলেন, যেভাবে তিনি প্লাইমাউথ থেকে এবারডিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের সর্বত্র ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবী সমর্থন করতে অনুরোধ করে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন, সেগুলি যাঁরাই পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন যে ঐ বক্তৃতাগুলির মধ্যে এই বর্ষীয়ান জননায়কের অন্তর্দৃষ্টি ও বাস্তবজ্ঞান কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই ইংলণ্ডেই একদিনের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "মর্লি-মিণ্টোর উদ্ভাবিত শাসনতন্ত্র 'too iron, too wooden, too inelastic'—সুতরাং এই সংস্কার ব্যবস্থাতে এমন কিছু নেই যা আমার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য। আমরা অর্থনৈতিক অধিকার ও যথার্থ স্বায়ত্তশাসন চাই। তা আমরা পাইনি।" আর একদিনের বক্তৃতায় বলেছিলেন: "যতক্ষণ বাংলা এবং বাঙালী জাতি অস্বাভাবিকভাবে লর্ড কার্জনের তরবারি দ্বারা বিভক্ত থাকবে ততক্ষণ দেশে অশান্তি ও বিক্ষোভ চলতে থাকবে।"

এই ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই ইংলণ্ডের জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন *Review of Reviews* পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক উইলিয়াম ষ্টেড। তিনি লিখেছেন: "Mr. Surendra Nath Banerjea was the only representative of the

Indian Press at the Conference and none of the editors of the Empire excelled him in eloquence, energy, geneality and personal charm." ষ্টেডের মতো একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ সাংবাদিকের এই মন্তব্যটি আজ যখন আমরা একবার স্মরণ করি তখন বুঝতে পারি কেন সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রগুরু।

॥ পনর ॥

লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড হার্ডিঞ্জ এলেন বড়লাট হোয়ে ১৯১০ সালে। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক মন্ত্রিসভা সেই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার জন্য হার্ডিঞ্জকেই যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নূতন বড়লাটের গতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করলেন এবং তাঁর শাসন-ভার গ্রহণের কিছুকাল পরেই বঙ্গ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব তাঁকে জানাবার জন্য তিনি টাউন-হলে একটি জনসভার আয়োজন করলেন। জনমতকে জনসভায় প্রতিফলিত করবার কৌশল তিনি জানতেন এবং কিভাবে অভিব্যক্ত হোলে জনমত কার্যকরী হয় ও শাসকজাতির মত পরিবর্তনে সহায়ক হয় সে বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ও বিশ্লেষণে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতা সেদিন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। সেই সঙ্গে তাঁর হাতে ছিল আর একটি শাণিত অস্ত্র, 'বেঙ্গলী'। যে জনমত জনসভায় অভিব্যক্ত হোত, 'বেঙ্গলী'-র সম্পাদকীয়তে সেই জিনিসই জীবন্ত ও দুর্বার হোয়ে উঠত। এই দ্বিবিধ উপায়ে বৈধ আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা দেশে রাজনৈতিক চিন্তাকে সেদিন তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট পরিণতির পথে একাগ্রতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে আসবার পূর্বে তাঁর পূর্ববর্তী বড়লাটদের কাছে এবং পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সদস্যদের কাছে সুরেন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন। কাজেই সুরেন্দ্রনাথ যখন জনসভার উদ্যোগ করেন তখন একদিন তিনি বাংলার এই মুকুটহীন রাজাকে লাটপ্রাসাদে ডেকে পাঠালেন।

এই জনসভা করছেন কেন?

বঙ্গ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বাংলার অবস্থা আপনাকে জানাবার জন্য।

সে তো আপনারা লিখেও জানাতে পারেন।

পারি, যদি নিজে আপনি সে আবেদন দেখেন।

সে প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে স্বচ্ছন্দে দিচ্ছি।

শুধু পড়লে হবে না, তারপর দেশের নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলামনে আলোচনা করতে হবে।

আমি সম্মত আছি।

জনসভার আর প্রয়োজন হোল না। হার্ডিঞ্জ সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। তখন তিনি ফরিদপুরের জ্ঞানবৃদ্ধ অম্বিকাচরণ মজুমদারের (ইনি একবার কংগ্রেসের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, পট্টভি সীতারামিয়া-রচিত কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে অম্বিকাচরণ সম্পর্কে সামান্যই উল্লেখ আছে—মাত্র সাড়ে ছয় লাইন।) সাহচর্যে একটি মেমোরিয়াল মুশাবিদা করলেন এবং সেটি প্রত্যেক জেলায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাঁদের স্বাক্ষর গৃহীত হয়। সমগ্র বিষয়টি তখন আমলাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। ২৫শে জুন মেমোরিয়াল দাখিল করা হয়। ঠিক তার দু'মাস পরে, ২৫শে আগস্ট, ১৯১১, লর্ড হার্ডিঞ্জের গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা বাতিল করবার সুপারিশ করে বিলাতে ভারত-সচিবের নিকট এক ডেসপ্যাচ পাঠালেন। ঐ ডেসপ্যাচ-মেমোরিয়ালে উল্লিখিত যুক্তিগুলির অধিকাংশই উদ্ধৃত হয়েছিল। ভারত-সচিব লর্ড হার্ডিঞ্জের এই সুপারিশ গ্রহণ করলেন। তারপর ঐ বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। সেইদিন বিকাল বেলায় দিল্লী থেকে যখন এই সংবাদ তারযোগে কলিকাতায় এসে পৌছল তখন কলেজ স্কোয়ারে যে বিরাট সভা হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' অফিস থেকে গিয়ে সেই সভায় একটি বক্তৃতা করেন। সেদিনের বিরাট জনসমাগম তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি লিখেছেন: "সেই রাত্রে সভাস্থল থেকে প্রসন্নচিত্তে আমি এই চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরলাম যে বাংলার একতা বজায় রাখবার যে চেষ্টা আমরা এতদিন করছিলাম তা অবশেষে সফল হোল।" বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ একটি অধ্যায়ের শেষ হোলো। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এই সময়েই। অতঃপর দেশের শাসন ব্যবস্থা এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হোতে থাকে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। বঙ্গ-বিচ্ছেদ তুলে দেওয়া হোল বটে, কিন্তু বাঙালীর-প্রাধান্যকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যেই যে কলিকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নেওয়া হোল—এটা উপলব্ধি করেছিলেন একজন। তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। একমাত্র তিনিই এর প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিন।

সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের শেষপর্বে এইবার আমরা প্রবেশ করব। এই পর্বের প্রথম ভাগে তাঁকে আমরা কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য হিসাবে দেখতে পাই আর এর শেষ ভাগে তাঁকে আমরা দেখতে পাই মন্ত্রীরূপে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জয়গৌরব তখন তাঁর ললাটে। জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে তখন তিনি। তাই দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথ প্রদেশে ও কেন্দ্রে সমানভাবেই নেতৃত্ব করছেন। যে প্রতিভা একদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় বিকশিত হয়ে সরকার পক্ষের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, এইবার তারই পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই কেন্দ্রীয় আইন-সভায়। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন : "১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হই এবং পরবর্তী মাসেই আমি দেশের ফৌজদারী শাসনব্যবস্থায় বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগ (Judicial ও Executive) স্বতন্ত্রী করণের প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম। বিষয়টি পুরাতন এবং সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী মনোমোহন ঘোষ এই ব্যবস্থার কুফল জনসাধারণের নিকট জানিয়েছিলেন। তিনি তখনকার ভারত-সচিবের কাছে এই ব্যবস্থা সংশোধনের জন্য একটি আবেদনও পাঠিয়েছিলেন এবং সেই আবেদনপত্রে বহু বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকের স্বাক্ষর ছিল।" পরে রমেশচন্দ্র দত্ত এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবটি সময়োচিত ছিল এবং প্রত্যেক বেসরকারী ভারতীয় সদস্য ইহা সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু সরকারী ভোটাধিক্যে ইহা বাতিল হয়ে যায়। এ ছাড়া প্রেস আইন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্প্রসারণ, রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে পরামর্শ কমিটি গঠন—এইসব বিভিন্ন প্রস্তাব তিনি

উত্থাপন করেছিলেন। ভারতরক্ষা আইনে অন্তরীণাবদ্ধ রাজবন্দীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তাঁর এই সময়কার একটি প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে আছে; তাঁরই প্রচেষ্টায় স্যর নারায়ণ চন্দ্রাবরকর ও বিচারপতি বীচক্রফটকে নিয়ে এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার সংবাদপত্রগুলিতে, রাজনৈতিক সুর যে রকম উচ্চগ্রামে উঠেছিল তা দেখে শাসকগণ রীতিমত শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সংবাদপত্রের ক্ষমতার সংকোচ বিধানে তৎপর হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে বিলাতে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করতে গিয়ে এই বিষয়ে সাম্রাজ্যের সাংবাদিক প্রতিনিধিদের এক সভায় সুরেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে এরূপ সমালোচনা করা হয়ে থাকে যে, দায়িত্বশূন্য মন্তব্য দ্বারা ভারতের সাম্প্রতিক বিপ্লব পুষ্ট হয়েছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ না করে পারি না। লর্ড ক্রোনার জানতে চেয়েছেন যে, বাংলা দেশে সম্প্রতি যে বিদ্রোহ পরিপুষ্টি লাভ করেছে সেজন্য একদল সংবাদ-পত্রের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উক্তি দায়ী কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি দৃঢ়ভাবে 'না' বলব। সত্য বটে ভারতীয় সংবাদপত্রে যা বলা হয় তার সবই আমি সমর্থন করছি না। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে যেসব সাংবাদিক এসেছেন তাঁরা তাঁদের পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমস্ত গুরুতর বিষয়গুলি সমর্থন করেন কি না আমি জানি না। প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, যে দায়িত্বশূন্য মন্তব্য ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তা আমি সমর্থন করি না, তবে এরূপ সংবাদপত্রের সংখ্যা অতি অল্প—তাদের প্রচার সামান্য এবং জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব নগণ্য। অরাজকতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব নয়। অরাজকতা প্রাচ্যের নয়—পাশ্চাত্যের। পাশ্চাত্য থেকে এই বিষবৃক্ষ প্রাচ্যে রোপিত হয়েছে। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রকে (Free Press) আমরা ইংরেজ শাসনের একটি প্রধান দান বলে মনে করি। রাজনৈতিক কারণেই কেবল ইহা আমাদের দেওয়া হয় নি, পরন্তু জ্ঞান ও তথ্য প্রচারের জন্য ইহা প্রদান করা হয়েছিল। লর্ড মেটকাফ যে মহৎ উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন—আমার দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি ইহাই

বলতে চাই যে আমরা সে উদ্দেশ্যের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য দমননীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে যদি কোনো সংবাদপত্রে প্রতিবাদের সুর পরিলক্ষিত হয়, তবে এর জন্য শাসকগণই প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী। যদি বিনাবিচারে নির্বাসিত রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি সম্পর্কে কোনো কোনো সংবাদপত্র তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে, তবে সেজন্য কি আপনারা তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বলবেন ?"

সেদিন তাঁর এই বক্তৃতা শুনে পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্য সুইফট ম্যাকনীস এই অভিমতটি প্রকাশ করেছিলেন : "ভারতীয়গণ সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় নেতা লাভে সত্যই সুখী। আমি বহু বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, কিন্তু আজ সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যে প্রতিভার পরিচয় পেলাম, যে সংযম ও বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় পেলাম তা আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে, তেমন আর আগে করেনি।" লর্ড রোজবেরি তখনকার দিনে ইংলণ্ডের এক জন প্রসিদ্ধ বক্তা ; তিনি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন যে, ইহা এক আদর্শ বক্তৃতা। ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রগুরুর এই নির্ভীক আলোচনা সেদিন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি একেবারে প্রেস আইনের বাতিল চাননি—চেয়েছিলেন এর যথাযথ সংস্কার। এর প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও বেসরকারী সদস্যগণ সকলেই একমত ছিলেন, তাই সরকারী ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি শেষপর্যন্ত নাকচ হয়ে যায়।

নূতন আইন অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা তখন অনেক-খানি সঙ্কুচিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব তুললেন—বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্পূর্ণ autonomous বা স্বায়ত্তশাসনাধিকারবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হবে এবং বড়লাটের পরিবর্তে প্রদেশের গভর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হবেন। তাঁর এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল, স্বায়ত্তশাসনের সম্প্রসারণ। তাঁর জীবনব্যাপী আন্দোলনের মূল কথাটা ইহাই। ইহাকেই তিনি রাজনৈতিক উন্নতির সোপান বলে মনে করতেন। ১৯১৪, মার্চ মাস। সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব তুললেন—জেলা

বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডের সভাপতিগণ নির্বাচিত হবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে স্থানীয় সরকারী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য, শাসকের পক্ষে এতখানি অগ্রসর হওয়া তখন সম্ভব ছিল না; তাই সরকারী বিরুদ্ধতায় প্রস্তাবটি তখনকার মতো নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু এর ঠিক চার বছর পরে, ভারত সরকার সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং কার্যকরী করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন।

সুরেন্দ্রনাথ যখন কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য তখন সিন্ধুবালার ঘটনায় বাংলা দেশে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল; সকল সংবাদপত্রেই এই নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বিষয়টি ছিল এই। বাঁকুড়া শহরে সিন্ধুবালা নামে দুইজন অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা ছিলেন। কোনো একটি মামলায় একজন সিন্ধুবালার প্রয়োজন হয়। পুলিশ ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে—এক্ষেত্রেও তাই হোল। তারা দুজন মহিলাকেই গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় এবং তেরো দিন হাজতবাসের পর দেখা গেল তাদের কারো বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হোল না। অগত্যা তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই ভদ্রমহিলাদের প্রতি এই রকম অশিষ্ট আচরণের সংবাদে বাংলা দেশে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বাংলার জনমত প্রতিফলিত হোল সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে। সিংহ গর্জন করে উঠলেন—শাসকবর্গ চমকে ওঠেন মডারেট সুরেন্দ্রনাথের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে। শাণিত ভাষায় রচিত একটি প্রস্তাব তুলে সেদিন তিনি যে বক্তৃতাটি করেছিলেন তা বক্তৃতা মাত্র ছিল না – ছিল গলিত অগ্নিস্রাব। নারীর সম্মানের লাঞ্ছনার পরিণতি কি হতে পারে, ইতিহাস থেকে, এমন কি রামায়ণ মহাভারত থেকে তার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন --"নারীর লাঞ্ছনার পরিণাম কি তার দৃষ্টান্ত সুসভ্য ইংরেজ জাতির ইতিহাসেই আছে। সিন্ধুবালাদের লাঞ্ছনা সমগ্র বাংলার, সমগ্র ভারতবর্ষীয় নারীজাতির লাঞ্ছনা বলেই আমি মনে করি। আধুনিক কালে কোনো সুসভ্য শাসক যে ইহা বরদাস্ত করতে পারেন, তা আমার কল্পনার বাইরে। পুলিশের এই আচরণে বাঙালী আজ বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তার কারণ সে অপমানিত বোধ করেছে। কেবলমাত্র তদন্ত দ্বারা এই বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না, দুষ্কৃতের দণ্ডদান ভিন্ন এর প্রতিকার নেই।" সমগ্র পরিষদ

কক্ষ গম্ গম্ করে উঠেছিল তাঁর এই বক্তৃতায়। দুষ্কৃতকারী পুলিশ দণ্ডিত হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু এইখানেই নিরস্ত হলেন না। তিনি সিন্ধুবালার এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং ইহাই ছিল রাষ্ট্রগুরুর অব্যর্থ শর-সন্ধান। প্রস্তাবটি এখানে আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম: "এই আইন-সভা সপারিষদ বড়লাট বাহাদুরকে প্রত্যেক প্রদেশে এমন একটি করিয়া কমিটি গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে যে, কমিটি প্রথমত, ভারত রক্ষা আইনে আটক বন্দীদের সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত, ১৮১৮ সালের তিন আইনে আটক বংলার* নেতৃবৃন্দের ও অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ আইনে আটক বন্দীদের সম্বন্ধে ও এই সমস্ত বন্দীদের স্বাস্থ্য, ভাতা, আটকস্থান ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদনুযায়ী মন্তব্য করিবে।" সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও তদনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশের ফলেই বাংলাদেশে একশতজন রাজবন্দীর মধ্যে নেতৃস্থানীয় আটজনকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৯১৮, জুলাই ৮।

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। ঐদিন যুদ্ধোত্তর শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনার আভাস ভারত-সচিব মণ্টেগু ও বড়লাট চেমসফোর্ডের যুগ্মনামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর তিনমাস পূর্বের ঘটনাটি আরো উল্লেখযোগ্য। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হবার তিনমাস পূর্বে রৌলট কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এদেশের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ তদন্তের জন্য ১৯১৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ. টি. রৌলট, বেসিল স্কট, এইচ. ডি. লোভাট, সি. ডি. কুমারস্বামী ও প্রভাসচন্দ্র মিত্র—এই পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত এই কমিটি 'সিডিশন কমিটি' নামে পরিচিত। কমিটির চেয়ারম্যানের নামানুসারে ইতিহাসে ইহা 'রৌলট কমিটি' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ১৯১৮, ১৫ই

এপ্রিল কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন ; ৮ই জুলাই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় আর ১৯১৯, ২৩শে মার্চ 'রৌলট বিল' আইনে পরিণত হয়। বিলের বিরুদ্ধে দেশময় যে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল তা অগ্রাহ্য করেই বিলটি আইনে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক-সভায় যখন 'রৌলট বিল' উপস্থাপিত হয়, ভারতীয় সদস্যগণ সকলেই তখন একযোগে আপত্তি জানালেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়ে জেনারেল ডায়ারের অধিনায়কতায় পাঞ্জাবের অমৃতসরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, কেন্দ্রীয় আইন-সভায় ভারতীয় সদস্যগণ যখন একযোগে তার প্রতিবাদ জানালেন, তখন একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ-জ্ঞাপনে বিরত ছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তখন কেন্দ্রীয় আইন-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি লিখেছেন : "এই হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে যখন একটি প্রস্তাব আনা হয়, সুরেন্দ্রনাথ তখন ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না।" যে হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হোয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন, সেই ব্যাপারে রাষ্ট্রগুরুর এই আচরণ পরবর্তী-কালে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। বরং এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর প্রশংসা করতে হয়। ইনিও একজন মডারেট ছিলেন ; কিন্তু জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করে মণ্টেগু যখন বলেছিলেন : "General Dyre committed an error of judgment," তখন তার প্রতিবাদে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বলেছিলেন : "ভারত-সচিবের এই উক্তিকে আমি prostitution of vocabulary ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।"

প্রথম মহাযুদ্ধে অর্থ দিয়ে ও সৈন্য দিয়ে ভারতবর্ষ ইংরেজকে সাহায্য করেছিল। এ আজ নূতন নয়। এর বহু আগে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পুণা ও আমেদাবাদ বক্তৃতায় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডের শাসনাধীনে আসবার পর থেকে যখনই প্রয়োজন হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের হয়ে ভারতবর্ষকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। "We have fought the wars of England in the past with blood and treasure." (পুণা কংগ্রেসে প্রদত্ত সভাপতির বক্তৃতা।) ভারতবাসী আশা করেছিল যে, কৃতজ্ঞ ইংলণ্ড এর প্রতিদানে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধে যে পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার বিনিময়ে, শাসন-সংস্কারে উদারতার পরিচয় দেবে। মিণ্টো-মর্লি সংস্কার

ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তাই ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্স-এ ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগু যখন তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করলেন, তখন আশা করা গিয়েছিল যে এইবারকার শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হবে। এই নূতন শাসন-সংস্কারে মণ্টেগুর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মাউণ্ট-ব্যাটেনের তুলনায় তা কোনো অংশে কম ছিল না। মণ্টেগুর সেই ঘোষণাটি এইরকম ছিল: "The policy of His Majesty's Government, with which the Government of India are in complete accord is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of Self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire."

"ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রচলন"—এই ছিল সেদিনকার প্রতিশ্রুতি এবং ইহাই ছিল মণ্টেগুর ঘোষণার মর্ম। এই ঘোষণার মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এই দেশে: ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতিতে একমাত্র মডারেটগণ ভিন্ন আর কেউ সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইল না। এর পরেই এলো মণ্টেগুর সেই নাটকীয় ঘোষণা: "আমি স্বয়ং ভারতবর্ষ পরিদর্শন ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করব।" তাহলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবার সত্যি কিছু দেবে—এই রকম একটা ধারণা তখন সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের মনের মধ্যে দেখা দিল। ঐ বছর নভেম্বর মাসে মণ্টেগু এলেন ভারতে এবং পুরো ছয় মাস তিনি কিভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, সকল দলের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করেছিলেন তার নিখুঁত বিবরণ মণ্টেগু স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন। শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র তাঁর এই বইখানি পড়ে দেখতে পারেন। তখনকার রাজনৈতিক ভারতবর্ষের এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একটি প্রামাণ্য চিত্র মিলবে এই আশ্চর্য বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। মণ্টেগু সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The welfare of India was the one mastering passion of his

life." কথাটি সত্য। ভারতবর্ষের হিতসাধন করবেন এই মহৎ আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লয়েড জর্জের মন্ত্রিসভায় এই শর্তে যোগদান করেছিলেন যে, ইণ্ডিয়া অফিসের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হবে।

২৬শে নভেম্বর মণ্টেগু দিল্লী এসে পৌছলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মণ্টেগু-ডেলিগেশনে মণ্টেগু একা ছিলেন না—তিনি ভিন্ন আরও দশজন তাঁর এই ভারত-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। এই দশজনের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অন্যতম। কংগ্রেস, হোমরুল লীগ ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তাঁকে রাজধানীতে ঐ তারিখে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। মানপত্রও দেওয়া হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল সেটি জগন্নাথের রথের আকার সদৃশ সুদৃশ্য গজদন্ত-নির্মিত একটি বিরাট কাসকেটের মধ্যে রক্ষিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই উপলক্ষে দিল্লীতে। মানপত্রটি তিনিই পাঠ করেছিলেন। মণ্টেগু তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন: "We were now face to face with the real giants of the Indian political world. All of them were first rate politicians. Old Surendranath Banerjea, the veteran from Bengal, read the address, which was beautifully written and beautifully read...The rest of the day was spent in interviews. First came Surendranath Banerjea. He was loquacity itself, garrulous, sedulous, but there was no sign of moderation or compromise in him. The Congress scheme was the least he would accept."* কংগ্রেসের দাবীকে ক্ষুণ্ণ করে ক্ষমতা বা মন্ত্রিত্ব লাভের মোহে সুরেন্দ্রনাথ যে আপোষের হস্ত প্রসারিত করেন নি, তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য স্বয়ং মণ্টেগু দিয়েছেন।

ঠিক এইসময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। মডারেট ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সমধিক স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেসের নেতৃত্ব এইবার মডারেটদের হস্তচ্যুত হবার সময় এলো। এই পরিবেশে ১৯১৮, ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমস-

* *An Indian Diary*: Edwin S. Montagu

ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। চরমপন্থী দল এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন; তাঁদের নেতা টিলকের মতে—ইহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। হোমরুল লীগের সভানেত্রী য়্যানি বেসান্তও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হয় এবং আমরা স্থির করলাম যে ঐ অধিবেশনে আমরা যোগদান করব না। আমরা ১৯১৮ সালের ১লা নভেম্বর মডারেট দলের এক স্বতন্ত্র সম্মেলন বোম্বাই নগরীতে আহ্বান করলাম। আমি এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ইহাই প্রথম মডারেট সম্মেলন।" পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত।

দেশব্যাপী এক অসন্তোষের পটভূমিকায় নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হোল। এই নূতন ব্যবস্থানুযায়ী প্রথম নির্বাচন সম্পন্ন হোল। গান্ধীর নির্দেশ ও নেতৃত্বে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে শুধু বর্জন করা হয়নি, নির্বাচকমণ্ডলীকে পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে এবং ভোটপ্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অসহযোগের সমর্থকগণ নূতন শাসনসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হোলেন। নিয়তির এমনই বিচিত্র পরিহাস যে, আটাশ বছর পরে অসহযোগের এই গোঁড়া ভক্তগণই ক্ষমতা-লাভের মোহে কেবলমাত্র সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন নি পরন্তু তাঁরা ভারত-বিভাগ মেনে নিয়ে negotiated independence-এর পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। যে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন সুরেন্দ্রনাথ একদিন দেখেছিলেন, ১৯৪৭ সালে তাঁর সেই স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হোল। ব্যারাকপুর সাবডিভিসনের পৌর-সভাগুলির পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সুরেন্দ্রনাথ নির্বাচন-প্রার্থী হলেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন। লর্ড রোনাল্ডসে তখন বাংলার ছোটলাট। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। উভয়ের মধ্যে যখন এই বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার হয় তখন রোনাল্ডসে, তিনি

কোন্ বিভাগে কাজ করতে ইচ্ছুক তা জানতে চাইলেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করতে, পেলেন স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের পোর্টফোলিও। তিনি তাই গ্রহণ করলেন। যে আমলাতন্ত্র একদিন তাঁকে অপমান করে বিদূরিত করেছিল, তারাই আজ সাধ্য-সাধনা করে বরণ করে নিয়ে তাঁকে মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করল। একেই বলে নিয়তির প্রতিশোধ। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি আমরা তিনজন (সুরেন্দ্রনাথ, প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও বগুড়ার নবাব আলি চৌধুরী) হস্তান্তরিত বিভাগগুলির (Transferred Subject) মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হয়েছিলাম। বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে আমাদের শপথগ্রহণ সম্পন্ন হয়।" তখন সুরেন্দ্রনাথ রাজসম্মান 'নাইট' উপাধি লাভ করে স্যর সুরেন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছেন। যে শাসন-সংস্কারকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টিলক ও গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ "Inadequate, unsatisfactory and disappointing" বলে একবাক্যে উল্লেখ করেছিলেন, সেই শাসন-সংস্কারের কাঠামোয় সুরেন্দ্রনাথ কেন এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন ?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই নূতন শাসন-সংস্কার গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী ও টিলক দুজনেই এটাকে একটা 'fair trial' দেবার জন্য দেশবাসীকে তখন অনুরোধ করেছিলেন। ১৯১৯-এর অমৃতসর কংগ্রেসে 'রিফর্ম' সম্পর্কিত চিত্তরঞ্জনের একটি প্রস্তাব থেকে গান্ধী 'নৈরাশ্যজনক' কথাটি তুলে দেবার কথা বলেছিলেন এবং রাজকীয় ঘোষণায় আন্তরিকভাবে সাড়া দেবার জন্য তিনি সেদিন ভারতবাসীকে অনুরোধ করেন। গান্ধী তখনো পর্যন্ত সহযোগী ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক মতের পরিবর্তন হয়—ডায়ারী নৃশংসতার পরে।

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯১৯-এর Reforms একটি বড়ো-রকমের দিকৃচিহ্ন। ১৮৬২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সদস্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দ জন আর তাঁরা সকলেই ছিলেন গভর্ণমেণ্টের মনোনীত। ত্রিশ বছর পরে, ১৮৯২ সালে, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় বিশজন এবং এর মধ্যে সাতজন ছিলেন জিলাবোর্ড প্রভৃতির মনোনীত। ১৯০৯ সালে মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-

সংখ্যা নির্ধারিত হয় পঞ্চাশ এবং এর মধ্যে তেইশজন ছিলেন নির্বাচিত। এর ঠিক দশ বছর পরে দেখা গেল যে, নূতন শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ালো একশত উনচল্লিশজন এবং এর মধ্যে একশত তেইশজনই নির্বাচিত সদস্য। এই দেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা বা direct election এই সময় থেকেই প্রবর্তিত হয়। এই সময়েই শাসনব্যবস্থায় Diarchy বা দ্বৈতনীতির প্রচলন হয়। মন্ত্রীদের উপর হস্তান্তরিত বিভাগগুলির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকের অভিমত উল্লেখ্য। ইহারা বলেন : "There is no doubt that the Government of India Act, 1919, gave real responsibility to the representations of the people in only a very limited sphere of administration...It should be regarded as an important instalment of constitutional reform. The introduction of direct election, for the first time, on a comparatively wide franchise was a significant concession."* সুরেন্দ্রনাথ নির্বোধ ছিলেন না, কিম্বা মন্ত্রিত্বলাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি যদি এই সংস্কারের মধ্যে সত্যিকারের কিছু না দেখতে পেতেন তাহলে মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের মতো এই সংস্কারকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু বৈধ আন্দোলনের নায়ক সত্যই বুঝেছিলেন যে মণ্টেগু-সংস্কার যথার্থ 'an important instalment of constitutional reform" এবং বুঝেছিলেন বলেই না কার্যতঃ এ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের তাৎপর্য ইহাই। এই পথেই একদিন স্বাধীনতা আসবে, তাঁর দূরদৃষ্টিতে এটা সেদিন ধরা পড়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হোলেন, নাইট-উপাধিতে ভূষিত হোলেন। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (S. P. Sinha) 'লর্ড' হোলেন এবং তাঁকে সরকারী ভারত-সচিব নিযুক্ত করা হোল। বাংলার মডারেট দলের সম্পাদক চারু ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হোলেন ; বি. এন. শর্মা ও তেজবাহাদুর সাপ্রু ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থান পেলেন, আর ভূপেন বসু ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ; এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকার

* *An Advanced History of India :* Majumdar & others.

সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি, পাঞ্জাবের লালা হরকিষণলাল মন্ত্রী হোলেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির এজেন্ট নিযুক্ত করা হোল। এত করেও শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল যে, মণ্টেগু ভেবেছিলেন এক, কিন্তু ইতিহাস-বিধাতাপুরুষের বিধানে দাঁড়াল আর এক। সে ইতিহাস সুপরিচিত।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন "Surendranath was hooked in body and soul by Lord Chelmsford who called him to the Viceregal Lodge and pressed him with all the warmth of a personal appeal to save the Reforms." কথাটি কিছু সত্য—সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন এই রিফর্ম যে প্রবর্তিত হোত না, তা ঠিক। কারণ, এর অন্তর্নিহিত ত্রুটি সত্ত্বেও, তিনিই এর স্বপক্ষে সেদিন প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নাইট-উপাধির টোপ গিলেছিলেন, অথবা মন্ত্রিত্বের টোপ গিলেছিলেন, রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কে এইরকম অশ্রদ্ধেয় উক্তি আদৌ সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করব।

ঝড়ের মতো দেশের উপর তখন প্রবাহিত হচ্ছিল অসহযোগ আন্দোলন। তখন কোনো কোনো নেতা নিজের প্রভাব ও মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য, কেহ-কেহ সত্য সত্য রাজনৈতিক মতপরিবর্তন হওয়ায় ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তা করেন নি। অধিকন্তু তিনি সরকারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর জীবনের শেষ সাত-আট বছরে জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব বিলক্ষণ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাব হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারাই কোনো মানুষের বিচার করা উচিত নয়। এ কথা সত্য যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সুরেন্দ্রনাথ যেন আর জনসম্রাট সুরেন্দ্রনাথ রইলেন না—উদ্ভাসিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে তিনি হোলেন নির্বাসিত, অগৌরবে আচ্ছন্ন হোল তাঁর জীবন। যে বিরাট উত্তেজনা একদিন দেশময় দেখা গিয়েছিল এই একটি মানুষকে কেন্দ্র করে, অতঃপর সে উত্তেজনা নূতন যুগের নূতন একটি মানুষকে কেন্দ্র করে ভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিল ইতিহাসের পটে। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। রাজনীতির ইহাই ধারা। কিন্তু সেজন্য কি আমরা সুরেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করতে পারি, না, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার গুরুত্বকে লঘু করে দেখতে পারি?

মত ও আচরণের পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখার (consistency) খাতিরে কোনো একটি মতকে আঁকড়ে ধরে থাকা সব সময়ে প্রশংসনীয় নাও হোতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর লোকপ্রিয়তা বা জনসাধারণের উপর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিজের রাজনৈতিক মত কখনো পরিবর্তন করেন নি—যা তাঁর সময়ে অনেক নেতা বহুবার করেছেন। তিনি নিজের মতে অবিচল ছিলেন—হিমালয়ের মতই অটল। এখানে consistency বড়ো কথা ছিল—গভীরতর কারণেই তিনি স্বীয় মতে স্থির ছিলেন। জনপ্রিয়তার লোভ বড়ো লোভ—বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতার জীবনে। আমরা জানি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির দরুণ মানুষের মতের ও আচরণের পরিবর্তন হয়। কিন্তু এরকম পরিবর্তনের একটা সীমা আছে। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত যৌবনকালে যা ছিল, বার্ধক্যে তা ছিল না। অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু আমূল পরিবর্তন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়. তাঁরো পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার সময় দেশশুদ্ধ লোকের তিনি নিন্দার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই অবস্থায় তিনি অবিচল ছিলেন, চিত্তের প্রশান্তি তিনি কিছুমাত্র হারান নি। সেই সময়ে একদিন মহাধিকরণে স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সাপ্রু বলেছেন: "I did not find a trace of bitterness in his face." সেদিন সুরেন্দ্রনাথ সাপ্রুকে বলেছিলেন: "My dear boy, things would right themselves. Don't worry." ইহাই সুরেন্দ্রনাথ।

কেন তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন? অর্থের লোভে নিশ্চয়ই নয়। তাঁর জীবনে তিনি সরকারের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। এমন অনেক সময় ও সুযোগ এসেছিল, যখন তিনি আন্দোলনে ঢিল দিলে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা করলে, অর্থলাভ ও সরকারী সম্মানলাভ দুই-ই হোতে পারত। কিন্তু তিনি তা করেন নি। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার কার্যতঃ পরীক্ষা করে দেখতে সম্মতিদান এবং তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রকৃত কারণ বুঝতে হোলে, এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা যৌবনকাল থেকেই নানা ছোট ছোট অধিকার ও সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। তাঁদের

সাবেকী দাবী ও আশার তুলনায় এই Reforms তুচ্ছ বিবেচিত হয়নি। অবশ্য তাঁরাও ঐ সংস্কারকে যথেষ্ট মনে করেন নি। কিন্তু তাঁরা যার জন্য জীবন-ব্যাপী আন্দোলন করেছিলেন, তার অনেকটা ঐ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে, আমার মনে হয়, তাঁরা যা চেয়ে আসছিলেন তার অনেকটা গভর্ণমেণ্ট দেওয়ায় শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে কাজ করে দেশের কতটা হিত হতে পারে তা স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখা তিনি উচিত মনে করেছিলেন।

আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিচার্য। সুরেন্দ্রনাথের পরে যাঁরা এসেছেন সেইসব বয়ঃকনিষ্ঠ নেতাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, দাবী ও আশা যে তাঁর চেয়ে বেশি হোতে পেরেছিল, তারো প্রধান কারণ তো তিনি। এই মানুষটি যদি জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ না করতেন, এক-জাতীয়তার আদর্শ সমগ্র দেশে, সকলের মনে মুদ্রিত করবার চেষ্টা না করতেন, ছোট ছোট নানা সংস্কার ও অধিকারলাভের জন্য আন্দোলন না করতেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, দাবী, আশা ও আদর্শ সেদিন—ইতিহাসের সেই রোমাঞ্চিত পট-পরিবর্তনের ক্ষণে—কি অত বড়ো হয়ে উঠতো? অতঃপর দেখা যাক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথ কি কি কাজ করেছিলেন। তার সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কেবলমাত্র সূত্রাকারে কিছু বলবার চেষ্টা করব।

তাঁর বিশ্বাস ছিল দ্বৈতশাসনকালে বাঙালী নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে নিজের দেশে স্বরাজ স্থাপন করতে পারবে। এই আশা এবং বিশ্বাস নিয়েই তিনি মন্ত্রি-পদ গ্রহণ করেন। ম্যাকেঞ্জি-আইন উচ্ছেদ করবার সুযোগ পেলেন তিনি এইবার। তাঁর পরিণত বয়সের সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করে তিনি রচনা করলেন কলিকাতা পৌরসভা সম্পর্কে একটি নূতন বিল। তিনি এক অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন এই বিলটিতে। তিনিই কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠনটি গণতন্ত্রবাদমূলক করে গিয়েছেন। এইজন্যই তাঁকে বলা হয় 'নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের জনক'। কথাটি অতিরঞ্জিত নয়। তিনি এমন এক আইন রচনা করেন, যার ফলে কলিকাতায় প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আগে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে ইংরেজ সিভিলিয়ান ভিন্ন আর কেউ নিযুক্ত হোতে পারত না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সরকারের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি প্রথমে জে. এন. গুপ্ত আই. সি. এস. কে এবং

পরে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেন। তারপর ডাক্তার হরিধন দত্তকে সেইপদে নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁর অধীনস্থ শ্বেতাঙ্গ I. C. S. সেক্রেটারিরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতো।

জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেহারাও পাল্টিয়ে যায় এই সময়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন উঠিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। পূর্বে বাংলায় জেলাবোর্ডের দুই-চারিটি সভাপতির পদে বেসরকারী ব্যক্তিরা নিযুক্ত হতেন। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হয়ে সমস্ত জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে বেসরকারী লোক নির্বাচনের নিয়ম করে দেন। পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে চেয়ারম্যানের পদে অনেক বেসরকারী ব্যক্তি নিযুক্ত হতেন। তিনি নিয়ম করে দিলেন বেসরকারী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেউই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পারবেন না। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বরাজ স্থাপনের অভিপ্রায়ে তিনি এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তা আইনে পরিণত হবার পুর্বেই, ১৯২৩ সালের নির্বাচনের ফলে তিনি ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যপদ থেকে অপসৃত হন।

বাংলাদেশে তখন চল্লিশজন I. M. S. ডাক্তার ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তার ষোলটি পদে আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তারদের নিযুক্ত করেন। তখন এইরকম নিয়ম প্রচলিত ছিল যে I. M. S. ব্যতীত আর কেউ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হতে পারবেন না। সুরেন্দ্রনাথ এই নিয়ম ভাঙলেন। তিনি I. M. S-দের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে I. M. S. নয় এমন দুইজন খ্যাতিমান বাঙালী চিকিৎসককে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। সেই দুইজনের নাম ডাঃ চুনীলাল বসু ও ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন বাঙালী ছেলেদের ডাক্তারী পড়া বড়ো কঠিন ছিল। সুরেন্দ্রনাথই মেডিকেল কলেজে তাদের ভর্তির পথ সুগম করবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশে Medical education-এর কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এইদেশে চিকিৎসাবিদ্যা যাতে আরো ব্যাপক হয় সেজন্য তিনি বাংলাদেশের স্থানে স্থানে মেডিকেল স্কুল স্থাপনের আয়োজন করেন। মৈমনসিংহে মেডিকেল স্কুলটি তাঁরই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। বাংলার প্রত্যেক

জেলার ইউনিয়ন সমূহে ডাক্তারখানা বা ডিসপেন্সারি স্থাপন করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ের মধ্যে কয়েকটি ইউনিয়নে তিনি সরকারী ব্যয়ে ডাক্তারখানা স্থাপন করেছিলেন।

তাঁর মন্ত্রীজীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। ১৯২২ সাল। অক্টোবর মাস। এই সময়ে উত্তরবঙ্গের এক বিশাল ভূখণ্ডের উপর বন্যার যে তাণ্ডবলীলা হয়েছিল—তার স্মৃতি আজো অনেকের মনে আছে। সেদিনের তরুণতম কর্মী সুভাষচন্দ্রকে এই বন্যার্তদের সেবার কাজে সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল। এই ভয়াবহ বন্যার ফলে বহু জীবন ও অর্থসম্পদ নষ্ট হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে ছিলেন। তিনি বিভাগীয় মন্ত্রী নন। সুতরাং তাঁর দায়িত্বও কিছু থাকবার কথা নয়। তাঁর বিভাগ থেকে যথাযথ রিলিফ ও চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রেরিত হয়েছিল। তবু বন্যাপীড়িত স্থানটি একবার স্বচক্ষে দেখবার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হোয়ে উঠলেন। পরবর্তীকাহিনী সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "এই স্থির করে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরদিন যাত্রা করলাম। প্রখর রৌদ্রে আমরা বিশ মাইল ট্রলি গাড়ি করে যেতে লাগলাম—রেলের দুইপাশে গবাদির মৃতদেহ বন্যার জলের উপর ভাসছিল। সে করুণ দৃশ্য দেখে আমরা মর্মাহত হলাম।" বৃদ্ধবয়সে এই পরিশ্রম সুরেন্দ্র-নাথের শরীরে সহ্য হয়নি। প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই তিনি গুরুতর-ভাবে অসুস্থ হন এবং ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। একেই বলে জনসেবা। বর্তমানকালের কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ রাষ্ট্র-গুরুর জীবনের এই ঘটনাটি মনে রাখলে উপকৃত হবেন। এইজন্যই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম। আসামের চা-বাগানে কুলীদের ধর্মঘট তাঁর মন্ত্রিত্ব-কালের আর একটি ঘটনা। চাঁদপুরে আসাম থেকে পলাতক বিপন্ন ও পীড়িত কুলীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্য দানের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন।

জনস্বাস্থ্য বিভাগটি তাঁর অধীনে ছিল, যেমন ছিল স্বায়ত্তশাসনের দপ্তরটি। জনস্বাস্থ্য সমস্যাটি সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেন। এই করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে নদীগুলি মজে যাওয়ার জন্য বাংলায় রোগ ও দারিদ্র্যের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথ নদী সংস্কারের জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে তিনি ব্যবস্থাপক-সভার

সভ্যপদে নির্বাচিত না হওয়াতে সেটি আর আইনে পরিণত হতে পারেনি। এইভাবে দেখা যায় যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে দেশের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট সাধন তিনি করেন নি, কিম্বা আলস্যে বিলাসে কালক্ষেপ করেন নি। একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না করে, একমনে কাজ করে গিয়েছেন। এইসব কাজ করতে গিয়ে সরকার পক্ষ থেকে (তখনকার সরকার পক্ষ মানেই হচ্ছে ইস্পাত কাঠামোর প্রবল প্রতাপ সিভিলিয়ানগণ) কম বাধা আসেনি। অধীনস্থ দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সঙ্গে কখনো যে তাঁর মতভেদ ঘটেনি, তা নয়। কিন্তু তাঁর ছিল পরিণত বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি আর গঠনমূলক প্রতিভা। এই দিয়েই তিনি তাঁর চারদিকে একটি বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিশ্বাসের মর্যাদা সকলেই রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। মন্ত্রী হিসাবে এ তাঁর কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নির্বাচন নিয়ে যখন কথা উঠলো, মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ তখন গভর্ণরকে বলেছিলেন : "I am your Excellency's Minister of the Local Self-Government and my decision must stand, otherwise I will resign" মণ্টেগু মিথ্যা বলেন নি যে, মডারেট সুরেন্দ্রনাথ আসলে মডারেট ছিলেন না—ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা, অসীম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নির্ভীক পুরুষ। অনুরূপ অভিমত স্যার ভ্যালেনটিন চিরোলও তাঁর *India Unrest* গ্রন্থে রাষ্ট্রগুরুর সম্পর্কে করেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাই মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করতে কিম্বা তাঁর মত বা মন্তব্য অগ্রাহ্য করতে সাহস পেতেন না।

তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় মণ্টেগু বলেছিলেন : "This will finish the old man." কথাটি এই অর্থে সত্য যে, দেশের লোকের কাছে মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের তখন কোনো সমাদর ছিল না। সেদিন সত্যই তিনি উদ্ভাসিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তথাপি দেখা যায়, সেই যে তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি বলেছিলেন : "I owe allegiance to God and to my people"—তাঁর স্বল্পকালের মন্ত্রী-জীবনে তাঁর আচার ও আচরণে, চিন্তায় ও কর্মে সুরেন্দ্রনাথ সেই একই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরের কোহিনুর-শোভিত রাজমুকুট নয়, ঈশ্বর ও স্বদেশের মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর একমাত্র আনুগত্য ও অনুরাগ।

॥ ষোলো ॥

সুরেন্দ্রনাথের জীবনের কাহিনী আর বেশি বলার নেই।

তিন বৎসর মন্ত্রিত্ব করার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপর বিস্মৃতির যবনিকা নেমে আসে। কিন্তু যে দুই বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন সেইসময়ে তিনি নিরলস বা কর্মশূন্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন নি। সেই বয়সে তিনখানা দৈনিক কাগজের ('বেঙ্গলী', 'নিউ এম্পায়ার' ও 'স্বরাজ) প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আর বাকী সময়টা 'আত্মচরিত' রচনার কাজে ব্যয় করেছেন। অবশ্য দেশবাসীর সঙ্গে তখন তাঁর আর প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল না। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু শাসন-সংস্কার সুরেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তাঁর দিক থেকে দেখলে তাঁর মত পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যাবে না। তিনি আজীবন যা সাধনা করে এসেছিলেন নূতন সংস্কারের মধ্যে তা পেয়েছিলেন বলে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, মণ্টেগু-সংস্কার এদেশে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনেব ভিত্তি স্থাপন করেছে। এর যতই ত্রুটি থাকুক (কোন্ সংস্কারে ত্রুটি নেই ?—মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা কি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল ?), একে ভিত্তি কবে সংসারের সঙ্গে সহযোগ করলে ভবিষ্যতে আবার পূর্ণ শাসনাধিকার পাওয়া যাবে। এইখানেই তাঁর সঙ্গে দেশবাসীর মত-বিরোধ ঘটেছিল। সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গের পর থেকে নব্যদলের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ প্রথম দেখা দেয়, লক্ষ্ণৌতে তা দূর হোয়েও হয়নি। যতদিন দেশের লোক সুরেন্দ্রনাথ ও প্রাচীনপন্থীদলের বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়েছিল, ততদিন তিনি দেশের অবিসংবাদী নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশের লোকের সেই বিশ্বাস শিথিল হবার পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ—বাঙালীর মুকুটহীন সম্রাট সুরেন্দ্রনাথ—দেশের লোক থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন : "The Calcutta Special Congress was the signal for a complete rout of Surendra Nath and his

school. They seceded from the Congress and took to spoon-feeding the Reforms."* সেই থেকে মডারেটপন্থীরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। এ তাঁর জীবনের বড়ো কম ট্র্যাজেডি নয়। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়নি। তাই তিনি দেশের লোকের মত-পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ততা বুঝতে পারেন নি। মণ্টেগু-সংস্কার প্রবর্তনের পরে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান আরো অধিক প্রশস্ত হয়ে যায়। গান্ধীর রাজনীতি তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি গঠন বুঝতেন, কিন্তু ভাঙনের মধ্য দিয়ে গঠনকার্য কিরূপে সফল হোতে পারে, এ তাঁর জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা বুঝতে দেয়নি।

আজ হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, মণ্টেগু-সংস্কার স্বীকার করে নিলেও, এর দোষত্রুটি প্রদর্শন করতে সুরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎপদ হননি। ঐ সময়কার 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয়গুলিই এর অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে। একটি সম্পাদকীয়তে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "The weakest part of the scheme is that relating to the Government of India"—এ ত্রুটি একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন। তথাপি তাঁর ধারণা ছিল, এই নূতন শাসনব্যবস্থা থেকেই অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের সৌধ গড়ে উঠবে। কিন্তু তাঁর এই ধারণার এবং তাঁর আজীবনের অনুসৃত সহযোগিতার আদর্শ দেশের লোক যে মানছে না, এ কথা তিনি ১৯২৩ সালের পূর্বে বুঝতে পারেন নি।

সম্রাট সুরেন্দ্রনাথ আর মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের দুটি চিত্র এখানে দেব।

তাঁর 'সম্রাট' (Uncrowned King of Bengal) খ্যাতিটার সূচনা-কাল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। জনশ্রুতি এই যে, সেই সময়ে একদিন শ্যামবাজারে কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ভবনে এক প্রকাশ্য সভায় তাঁর মাথায় ফুলের একটি মুকুট পরানো হয়েছিল এবং এই ঘটনা উপলক্ষে ইংরেজদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি, এমন কি, বিলাতে *Times* পত্রিকা পর্যন্ত, তাঁকে রাজদ্রোহী বলে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়েছিল।† ১৯০৮। স্বদেশী আন্দোলনের

* *Surendra Nath Banerjea :* Joges. C. Bose.

† খ্যাতনামা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট শ্রুত।

ভরা জোয়ার বাংলার বুকে। সুরেন্দ্রনাথ পুরুলিয়া আসবেন। এ ডাব্লিউ ওয়াটসন তখন পুরুলিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট। সুরেন্দ্রনাথ পুরুলিয়া আসছেন এবং এখানে সভা করবেন। এই সংবাদে ওয়াটসন যারপর-নাই বিচলিত হন। তিনি বাংলাদেশময় আগুন জ্বালিয়েছেন, এইবার ছোটনাগপুরের অসভ্য কোল, সাঁওতাল প্রভৃতিদের স্বদেশী হুজুগে যদি ক্ষেপিয়ে তোলেন, তাহলে তো সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ—এই আশঙ্কায় ওয়াটসনের মতো দুর্ধর্ষ সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের নামে রীতিমতো বিচলিত হয়েছিলেন। তখন পুরুলিয়ার অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সিংহ। এই ঘটনার তিনি সাক্ষী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর একটি সাময়িক পত্রিকায় এই সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। তিনি লিখেছেন :

"নির্দিষ্ট দিনে সুরেন্দ্রনাথ রাঁচি হইতে বেলা দশটার সময়ে পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌছিলেন। শহরের সমস্ত লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় স্বদেশী নেতৃবৃন্দ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথোচিত আয়োজন করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে শরৎচন্দ্র সেন উকিলের বাসায় তাঁহাব থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই দেড়মাইল পথ একটা টম টম গাড়িতে তাঁহাকে চড়াইয়া একদল স্বেচ্ছাসেবক টানিয়া নিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট শোভাযাত্রা ও স্বদেশী সঙ্গীত। শরৎবাবুর বাসায় যখন তিনি গাড়ি হইতে নামিলেন, তখন কতলোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। সেইদিন বৈকালে তিনটার সময়ে ষ্টেশনের মাঠে সামিয়ানার নীচে এক বিরাট সভা হইল। পুরুলিয়া শহরের অধিকাংশ লোক সেই সভায় উপস্থিত হইল। মফঃস্বল হইতেও অনেক লোক আসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে বাংলায়, পরে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সেই সমুদ্রনির্ঘোষবৎ ধ্বনি এখনো আমার কানে বাজিতেছে।"*

এই ঘটনার তেরো বছর পরে। তখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বাংলার মুকুটহীন সম্রাট তখন সরকারের মন্ত্রী—স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কে. টি.। বর্তমান গ্রন্থের লেখক তখন নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

* মাসিক বসুমতী, ১৩৩১।

স্বদেশীযুগের অবিসম্বাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, তাঁর অলৌকিক বাগ্মিতা সম্বন্ধে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে অনেক কথা শুনতাম এবং শুনে অবধি তাঁকে দেখবার একটা অদম্য আগ্রহ ছিল আমার মনে। নদীয়া জেলার জলকষ্ট নিবারণ ও অন্যান্য হিতকর কার্যের সম্বন্ধে জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে একটি কনফারেন্স আহ্বান করেন। নদীয়ার মহারাজা তখন জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান। আমরা নবদ্বীপ থেকে কয়েকজন ছাত্র আমাদের এক শিক্ষকের সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে দেখব ঠিক করি। শুনেছিলাম, তিনি তখন স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী। সেই কনফারেন্সে তিনিই সভাপতিত্ব করবেন। কলিকাতা থেকে তিনি যখন কৃষ্ণনগর এসে পৌঁছলেন আমরা তখন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। গৌরকান্তি, পক্ককেশ, আজানুলম্বিত আচকান-পরিহিত সুরেন্দ্রনাথ একটি প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলেন। মনে আছে, মহারাজা এবং কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এবং জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যবৃন্দ ছাড়া তাঁকে সম্বর্ধনা করবার জন্য ষ্টেশনে নাম করার মতো আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ মহারাজার অতিথি হোয়ে তাঁর প্রাসাদে অবস্থান করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ হলে এই কনফারেন্স হয়েছিল। সভায়, যতদূর মনে পড়ে, দুশোর বেশি লোক সমাগম হয়নি—আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই মহারাজার নিমন্ত্রিত অনেকগুলি মফঃস্বলের পঞ্চায়েৎ, শহরের উকিল, মোক্তার, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার আর জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর। সভায় সুরেন্দ্রনাথ একটি ছোট বক্তৃতা করেন এবং অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সঙ্গের শিক্ষক মহাশয় আমাদের বলেছিলেন যে, বারো-তেরো বছর আগে এই কৃষ্ণনগরেরই এক জনসভায় তিনি রাষ্ট্রগুরুকে দেখে-ছিলেন ও তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। সেদিনের সভায় লোকসমাগম হয়েছিল পাঁচহাজার আর সেদিন তাঁর কণ্ঠে ছিল অগ্নিস্রাবী ভাষা।

এই চিত্র আর সেই চিত্র। কবির কথায় বলতে ইচ্ছা হয়—"Look at this picture and that." কিন্তু এ তুলনা শুধু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সত্য নয়। কুক্ষণে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ভারত-সচিব মণ্টেগু আর বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের যুক্ত বিবৃতি বেরুলো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে। সেদিন

থেকেই দেশের মধ্যে বিসর্জনের বাজনা বাজতে থাকে। এর পরবর্তীকাল থেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলির আরম্ভ। কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের বিঘোষিত "No means is too mean"-এর নীতির আমদানী হয় ও সেই সঙ্গে টাকার আমদানী হয়—নেতৃত্ব অপেক্ষা অর্থের প্রভাব প্রকট হোয়ে উঠতে থাকে। সেই থেকে কাঞ্চন-কৌলিন্য আর ভোটশাঠ্য কংগ্রেসের রাজনীতিকে যেভাবে কলুষিত করতে থাকে—সে লজ্জাকর ইতিহাস বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তথাপি আমরা বলব—এই চিত্র আর সেই চিত্র। সুরেন্দ্রনাথের আমলের কংগ্রেস আর গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের যুগের কংগ্রেস—"Look at this picture and that"—এর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

১৯২৩। নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ পরাস্ত হোলেন।

এই পরাজয়ের কারণ? মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য তিনি ধিক্কৃত হয়েছিলেন; চরমপন্থীদের সংবাদপত্রগুলি মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধটা করতেই বাকী রেখেছিল। স্বরাজ্য-দলপতি চিত্তরঞ্জন দাস এরই সুযোগ নিয়ে, রাজনীতিতে যিনি তাঁর মহাগুরুস্থানীয় ছিলেন (এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক গুরু ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল আর বিপিনচন্দ্রের গুরুস্থানীয় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ), সেই চির অপরাজেয় সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রগুরু স্বয়ং বলেছেন: 'The cry was raised, by a section of the Extremist Press, that I should not have accepted ministerial office; and it was employed by Mr. C. R. Das in his electioneering campaign against me." আজ এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, নেতৃত্বের মোহে চিত্তরঞ্জন সেদিন এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন যে, কেন সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি বুঝতে চাননি। সুরেন্দ্রনাথ জানতেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের এই অগৌরব তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে একদিন আচ্ছন্ন করে দেবে। তাইতো দেখতে পাই যে তাঁর উত্তরপুরুষদের উদ্দেশ্য করে তিনি নিজেই এর একটি কৈফিয়ৎ রচনা করে গেছেন। আত্ম-চরিতে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "আমার অপরাধ আমি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলাম। এই প্রতিকূল সমালোচনার উত্তরে আমি ইহাই

বলতে চাই যে আমি আজীবন স্বায়ত্তশাসনের জন্য চেষ্টা করিয়াছি। ভারতবর্ষে যখন কেউ ইহা স্বপ্নেও ভাবেননি তখন থেকে আমি এই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী যে জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম তারই সাফল্যের জন্য যখন সরকারপক্ষ আমাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন তখন সেই যথার্থ ও ঐকান্তিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবিনি। আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে এমন মনে করা ভুল। সত্যই আমাদের পরিবর্তন হয়নি। সরকারই সময়ের চাপে স্বীয় পুরাতন মনোভাব পরিবর্তিত করেছিলেন। আমাদের ও সরকারের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে যেরূপ দ্রুততার সঙ্গে নবীন ভারত তার চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধন করছিল, সরকারপক্ষ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারছিলেন না।"

এই অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্রগুরুর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নিগূঢ় তাৎপর্য। সুরেন্দ্রনাথকে আমরা কোথায় ভুল বুঝেছি আজ সেটা একবার খতিয়ে দেখা দরকার। তাঁর জীবনেতিহাস গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, যে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাতে ইংরেজকে তিনি আপনার রাজনীতিক গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইংরেজের রাজনীতির উৎস থেকে রাজনীতির রস পান করেছিলেন। তিনি ইংরেজের অনুকরণে নিয়মানুগ আন্দোলন দ্বারা স্বদেশের রাজনীতিক অধিকারপ্রাপ্তির আশায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ইংরেজ স্বাধীনতাপ্রিয়, সুতরাং তাকে বোঝাতে পারলে সে অপরের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেবে, এ বিশ্বাসে তিনি আজীবন স্থির ছিলেন। এখানে তিনি তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনের সগোত্র। তাঁর মন গঠিত হয়েছিল এইভাবে। সরকারের সঙ্গে সহযোগ ব্যতীত কখনো আমাদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ হোতে পারে, এ ধারণা তিনি করতে পারেননি এবং এই কারণেই নিয়মানুগ পথ থেকে বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না— শাসকের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সত্ত্বেও সম্ভবপর ছিল না। মেঘের অন্তরালে তিনি বোধ হয় সূর্যালোক দেখতে পেতেন, তাই সহযোগ থেকে কখনো ভ্রষ্ট হননি। তবে একথাও সত্য যে এই সহযোগের মোহে তিনি কোনোদিন আত্মশক্তি

বিস্মৃত হননি বা অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর জীবনেতিহাসেই তো এর সমর্থন মেলে। বরিশালে আমলাতন্ত্র—শাসনের প্রতিভূর রুদ্রমূর্তিস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সনের মুখের ওপর তিনিই বলতে পেরেছিলেন: "I am within my own rights." তবে বৈধ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ইংরেজের সাহচর্যে তিনি প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কেন সহযোগকে তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন তা তাঁরই রচনা থেকে উদ্ধৃত করে বলি। তিনি লিখেছেন: "আমাদের নিজের সামর্থ্য ও কার্যক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আপনার পায়ের উপর আপনারা দাঁড়াইতে পারি এবং অসহযোগ সে পক্ষে আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারে, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমরা এক বিষয়ে বঞ্চিত হইব। জগতেব সভ্যতা এবং শিক্ষা-দীক্ষার যে পীযূষধারা পান করিয়া জাতি-নিচয় জীবন্ত রহিয়াছে এবং নিজেব সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে বিশ্বের সঞ্চিত বিদ্যা ও ভূয়োদর্শনের যে ফল উপভোগ করিতেছে, তাহা হইতে আমরা দূরে থাকিব। সহযোগের দ্বাবা আমরা বহির্জগতের শিক্ষা ও সভ্যতাব অংশভাগী হইতে পারিব, অন্যদিকে আমরাও বহির্জগতেব লোককেও আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অংশ প্রদান করিতে পারিব। জগতের লোককে আমাদের দিবার অনেক জিনিস আছে। জগতের লোকের নিকটে আমাদেরও অনেক শিখিবার জিনিস আছে। প্রাচীন ভিত্তির উপর আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার উপর আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের সৌধ গড়িয়া তুলিতে পাবিব, ততই আমরা সেই জ্ঞানকে বিস্তৃতায়তন ও উদার করিতে সমর্থ হইব। জাতীয় জীবনের প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। অতীত বর্তমানে মিলিত হয় এবং বর্তমান অদৃশ্য ও সর্বদা বিস্তারশীল ভবিষ্যতে মিশিয়া যায়। বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই প্রতি পদবিক্ষেপে প্রশস্ত হয় এবং চারিদিকের ভূমি উর্বর করিয়া তুলে। আমাদিগের ভিত্তি অতীতের উপর ন্যস্ত হওয়া চাই। আমাদের অতীত ভাবধারা ও সংস্কার আমাদের জাতির ইতিহাস গঠন করিয়াছে। সেই অতীতকে ভিত্তি করিলে বর্তমান ভবিষ্যতকেও আকৃতি-প্রকৃতি দিতে পারিবে। কিন্তু আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিলে চলিবে না। আমরা যেখানে আছি সেখানে

থাকিলেও চলিবে না। ভগবানের রাজ্যে কর্মশূন্য হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা চলে না। অতীতের প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টি রাখিয়া, বর্তমানের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আগ্রহ রাখিয়া এবং ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবেই। অগ্রসর হইবার কালে আমাদের নিজস্ব সভ্যতা, ভাবধারা ও শিক্ষা-দীক্ষার সহিত বাহির হইতেও অপরের মঙ্গলময় প্রভাব গ্রহণ করিতে হইবে—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ঘাতসহ জিনিস সব জয় করিতে হইবে। উহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন নব-শক্তিতে শক্তিমান্ হইবে। এইরূপে সহযোগ ও সাহচর্য আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্রম-বিকাশের পথ দিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইবে, অসহযোগ ও পরকে বর্জন তাহা করিতে পারিবে না। ইহা ভিন্ন অন্য নীতি অবলম্বন করিতে গেলেই আমরা জাতি হিসাবে মরিয়া যাইব; আমাদের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। দেশবাসীর প্রতি ইহাই আমার বাণী। এই বাণী আমি চঞ্চলতা বা অধীরতাবশতঃ দিয়া যাইতেছি না, আমার দীর্ঘজীবনের ভূয়োদর্শন ও চিন্তার ফলে দিয়া যাইতেছি। আমার জন্মভূমির সেবায় আমি আমার সুদীর্ঘ-জীবনে যে শ্রম নিয়োজিত করিয়াছি, তাহারই ফলে বুঝিয়াছি, ইহা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।"

কিন্তু দেশের চিন্তাধারা সেদিন সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। বাঙালী তাই তাঁর এই কথায় কর্ণপাত করেনি। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯২৫, মে মাস। ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স হোল। সভাপতি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই কনফারেন্সে তিনি বলেছিলেন: "সরকারের সহিত সম্মানজনক সহযোগ করিতে আমি প্রস্তুত। যদি আমি বুঝিতাম, বর্তমান সংস্কার আইন দেশের জনসাধারণকে কোনোরূপ শাসনদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, যদি বুঝিতাম ইহাতে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ আছে, তাহা হইলে আমি কোনো দ্বিধা না করিয়া সরকারের সহিত সহযোগ করিতাম এবং ব্যবস্থাপক-সভার মধ্যে গঠন কার্য আরম্ভ করিয়া দিতাম। কিন্তু আমি প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন না পাইয়া কেবল উহার ছায়ার জন্য সহযোগ করিতে পারি না।" কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে রোগশয্যায় দেশবন্ধুর মত-পরিবর্তনের আভাস পাওয়া

গিয়েছিল—তিনি তখন বার্কনহেডের সঙ্গে একটা সম্মানজনক আপোষ-রফায় আসার কথা চিন্তা করেছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, দেশবন্ধু ইংরেজ-শাসনের বিরোধী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বৈরাচার-শাসনের বিরোধী। তিনি অহিংসার পথে ভারতের মুক্তিকামনা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকে সমান অংশীদার রূপে (Equal partner) গৃহীত হয়ে ভারতবাসী নিজেদের ভাবধারার ভিতর দিয়ে নিজেদের স্বরাজ গড়ে তুলবে—ইহাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। জিজ্ঞাসা করি, এর সঙ্গে রাষ্ট্রগুরুর লক্ষ্যের অমিল কোথায়? মোট কথা, যাঁরা তাঁর মন্ত্রিত্বগ্রহণে সুরেন্দ্রনাথকে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার দিয়েছিলেন তাঁরাই তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, দেশের বহুজনের ভ্রূকুটীভঙ্গী ও বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও, তিনি দেশের পক্ষে যা হিতকর ভেবেছিলেন তা করতে পশ্চাদপদ হননি। এখানেও তাঁর সেই অদম্য সাহস, সেই নির্ভীক তেজস্বিতা, সেই অনমনীয় দৃঢ়তা দেখা যায়। ধীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, সুরেন্দ্রনাথের অবলম্বিত এই পথ, টিলকের অনুমোদিত Responsive co-operation এবং চিত্তরঞ্জনের শেষজীবনে বিঘোষিত Honourable co-operation-এ বিশেষ তফাৎ ছিল না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'চিত্তরঞ্জন দাশের শেষ উইল' এই নাম দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ যে সুচিন্তিত প্রবন্ধটি* লিখেছিলেন সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। এটি তিনি বাংলায় রচনা করেছিলেন। ইহাই তাঁর সর্বশেষ রচনা। তিনি লিখেছিলেন:

"দেশবন্ধুর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ চিঠি হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল সত্যই বলিয়াছেন, দেশবাসীর কাছে উহাই দেশবন্ধু দাশের শেষ উইল। যেগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, যদি কেবল সেইগুলি বাদ দিয়া পণ্ডিত মতিলাল চিঠির অন্যসব অংশটা উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলেই আমরা অধিক সুখী হইতাম। এমন কি ব্যক্তিগত বিষয় যেগুলি, তাহাতেও হয়তো দেশবন্ধু

* ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর দেশবাসীর উদ্দেশে প্রদত্ত। ইহা সুরেন্দ্রনাথের মূল বাংলা রচনা।

দাশের দেশসেবাসম্পর্কিত কর্মতৎপরতার উপর অনেকটা আলোকসম্পাত হইত। জননায়ক যিনি, ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিতে গেলে তাঁহার সামান্যই থাকে। জনসাধারণের অবারিত দৃষ্টির কাছে তাঁহার সবই উন্মুক্ত, লুকোছাপা কিছু নেই। জনমতের জ্যোতিরালোকিত পথেই তাঁহার গতি; সেই জনমতের উজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াই তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেন, চালিত করেন নিজের নীতি গড়িয়া তুলেন।

"দেশবন্ধু ঐ চিঠিতে যাহা বলিয়াছেন এবং বাস্তবিক পক্ষে স্বীকারও করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, স্বরাজ্যদল খুব সামান্য কাজই করিয়াছেন—এত সামান্য যে, তাঁহারা কিছু কাজই করেন নাই, এ কথা বলিলেও ভুল হয় না। চিত্তরঞ্জন লিখিতেছেন: 'আমাদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটকাল ঘনাইয়া আসিতেছে। এই বৎসরের শেষভাগে এবং আগামী বৎসরের প্রথম দিকটাতে অফুরন্ত কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে। আমাদের সমস্ত শক্তি উহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। অবস্থা তো ইহাই, অথচ আমরা উভয়েই এই সময়ে পীড়িত। ভগবান জানেন কি ঘটিবে।'

"ব্যক্তি এবং দলের বিচার হয় কার্যের দ্বারা। সকল যোগ্যতার একমাত্র কষ্টিপাথর হইল ঐ কাজ। আমরা যাহা বলি, দিনরাত যাহা আওড়াই, তাহাতে আমাদের বিচার হইবে না। আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা পরখ হইবে, আমরা কে, বাস্তবিক আমরা কি কাজ করিয়াছি, তাহারই বিচার করিয়া। এই কাজের দিক হইতে স্বরাজ্যদল বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, সত্যই অনেক কাজই তাঁহাদের বাকী রহিয়াছে। দেশের অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দাশ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই পরিবর্তিত অবস্থায় কোন্ পথে কোন্ নীতি ধরিয়া চলিতে হইবে, দাশ তাঁহার উইলে তাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে কর্মতালিকা লইয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছে; এমন পরিবর্তন দোষের নহে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিরও পরিবর্তন ঘটিবে, ইহাই সমীচীন। দেশবন্ধু দাশ দেশবাসীকে যে বাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই (Dominion status) আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য, সেই অভীষ্টের

সাধনাতেই আমাদের সমস্ত কর্মশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বর্জন করিতে হইবে; কাযেই অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে বিধিসঙ্গত উপায়ই হইবে আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। যে লক্ষ্য দেশবন্ধু দাশের আদর্শ ছিল, দাশের যাহা অভীষ্ট ছিল, সেই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্মানজনক সহযোগিতার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইল দাশের উইল। তাঁহার ফরিদপুর অভিভাষণের সার কথাও হইল ইহাই।"*

এরপরও কি আমরা বলব যে, সুরেন্দ্রনাথ সেদিন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে অন্যায় করেছিলেন? অথবা চেস্টারফিল্ডের ভাষায়, তাঁর মন্ত্রিত্বগ্রহণকে "A fall upstairs" বলে অভিহিত করব? যাঁরা সেদিন মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাউনিং-এর "Lost Leader" দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে, নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হবার পর সুরেন্দ্রনাথ যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করে কেন্দ্রীয় আইন-সভার বিরোধিদলের নেতৃত্ব করতেন, তাহলে সেইটাই তাঁর পক্ষে শোভন হোত। কিন্তু আমার মনে হয়, শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যই তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন—এবং তাঁর এই কাজটাকে 'rank sophistry' বলবার কোনো হেতু নেই।

১৯২৩। রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে নূতন দিগন্ত। সুরেন্দ্রনাথ আর নির্বাচিত হোতে পারলেন না। এই অপমান, পরাজয়ের এই বেদনা বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়েছিল। তারপর আর তিনি প্রকাশ্য সভায় আসেন নি। তখন থেকেই তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের কাহিনী একমনে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। শেষ জীবনে বাড়ি থেকে তিনি 'বেঙ্গলী'র জন্য রচনা লিখে পাঠাতেন। ভারতবর্ষের একাধিক জননায়ক তাঁদের স্মৃতিকথা লিখেছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায়, *A Nation in Making*-এর সমতুল্য স্মৃতিকথা আজ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় একখানি রচিত হয়নি। এ অপূর্ব গ্রন্থ যিনিই

* মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩২।

অবহিত হয়ে পাঠ করবেন, তিনিই বুঝবেন যে সুরেন্দ্রনাথ সত্যই এক মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাষ্ট্রগুরুর জীবনস্মৃতি একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাস। তিনি যে একজন কত বড়ো রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ছিলেন, এই বইখানি পাঠ করলে তার কিছুটা ধারণা করা যায়। ভারতে একটি নবযুগের উদ্বোধন করেন তিনি। তাঁর পূর্বে দেশ, কাল, জাতি, ধর্মনির্বিশেষে ভারতবাসীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেউই এক মহাজাতিতে পরিণত করবার জন্য অমন ভাবে জীবন উৎসর্গ করেন নি। জাতিগঠনের যে কার্যধারা তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরিণামে তা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও মহাজাতি গঠনপথে তাঁর জীবন একটি দৈববিধান বলে বোধ হয়, একথা আজ আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলব। কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন: "আমি যখন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে দেখা করিতে যাইতাম তখন তিনি আমাকে বলিতেন—'আমি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখি যে আসাম থেকে করাচী পর্যন্ত ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও খৃষ্টান সমগ্র ভারতবাসী একদিন এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে এবং আমি এই মহাসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিব বলিয়া যেন অন্য কর্মক্ষেত্র আমার পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে।' এই আদর্শ লইয়াই তিনি দেশ-সেবায় জীবন আরম্ভ করেন।"*

A Nation in Making সেই মহাজাতি গঠনের ইতিহাস। তাঁর কর্মবহুল শেষ বয়সে বইখানি রচিত হয়। জীবিতকালে বইখানির রচনাকার্য শেষ করবার জন্য তাঁর বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ব্যারাকপুরের ভবনে নিজের পড়াশুনার ঘরটিতে বসে একমনে তিনি এই স্মৃতিকথা রচনায় দিন ও রাত্রির অনেকগুলি প্রহর অতিবাহিত করতেন। এ বই তাঁর পরিণত প্রতিভার ফল। বর্তমান ভারতের ইতিহাসে Nationalism-এর জন্মদাতা তিনি; ভারতবাসীকে জাতিধর্মনির্বিশেষে এক মহাজাতিতে পরিণত করবার প্রয়াসে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর জীবনস্মৃতি তাই বর্তমান ভারতের একটি বিশেষ যুগের ইতিহাস বলেই পরিগণিত হবার দাবী রাখে। তাঁর জীবনব্যাপী প্রয়াসের ভিতর দিয়ে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতের

* আত্মচরিত: কৃষ্ণকুমার মিত্র।

এক অখণ্ড রূপ কিভাবে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করল, তারই ইতিহাস উত্তরপুরুষের জন্য রেখে যাবেন বলেই না তিনি তাঁর গ্রন্থের এই নামকরণ করেছেন। পরিণত বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু যখন তাঁর বিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আমরা কল্পনা করতে পারি, তখন তিনি এই মানদণ্ড দিয়েই তাঁর পার্থিব জীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, যদি তাঁর জীবনে নিজেও স্মরণ করবার মতো কোনো ঘটনা থাকে, তা কেবলমাত্র সেইসব ঘটনা যার সঙ্গে ভারতের মহাজাতিত্ব অথবা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের প্রয়াস জড়িত; নিজের পারিবারিক অথবা সাংসারিক জীবনের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কোনো ঘটনা তাঁর মনে স্থান পায়নি এবং গ্রন্থেও তার বিশেষ কোনো উল্লেখ দেখা যাবে না। ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথ এখানে অনুপস্থিত, মানুষ সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাস বলতে গেলে এর মধ্যে সামান্যই পাওয়া যাবে এবং সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে পারম্পর্যতার অভাব বা সম্পূর্ণতার অভাব যে সতর্ক পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না তা নয়। কিন্তু এ তো ব্যক্তি-সুরেন্দ্রনাথের আত্মচরিত নয়—এ যে একান্তই একটি মহাজাতি গঠনের ইতিহাস। তাই এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই, যাঁরা তাঁর সঙ্গে একযোগে মহাজাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পাছে উত্তরপুরুষ বিগত যুগের এইসব পিতৃ-পুরুষদের কথা বিস্মৃত হয় অথবা তাঁদের কর্মের মূল্য, চিন্তার বৈশিষ্ট্য ঠিকমতো উপলব্ধি করতে না পারে, তাই সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সতীর্থ ও সহকর্মীদের কথা বিশেষভাবে এই গ্রন্থের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এই মহানুভবতা দুর্লভ। সমসাময়িক ইতিহাস এবং সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সম-কালীন রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলেই এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং এই গ্রন্থে বর্ণিত বিবিধ ঘটনার মধ্যে গভীর সঙ্গতি এবং তাদের ক্রমবিকাশের ধারাটা পরিস্ফুট হবে।

বাংলাভাষায় এই গ্রন্থখানির একটি নূতন ও সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে; এর পনর বছর পরে তাঁর অন্যতম জামাতা, স্বনামধন্য ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বইখানির একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ

অনুবাদ সম্পূর্ণ নয়, সুন্দরও নয়। বাঙালী লেখক ও প্রকাশক জওহরলাল নেহরু, গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিতের অনুবাদে আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত কেউই সুরেন্দ্রনাথের এই অমূল্য স্মৃতিকথার অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন না। এই কি তাঁর জীবনব্যাপী দেশসেবার পুরস্কার? আমাদের বর্তমানের অবসাদগ্রস্ত জাতীয় জীবনে শক্তি-সঞ্চয় ও অনুপ্রেরণা লাভের জন্য যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা রাষ্ট্রগুরুর এই আত্মচরিতের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। সেইসঙ্গে তাঁর বক্তৃতাগুলিও। এই দুইটিই আমাদের করণীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের মহিমা বুঝতে হোলে সর্বাগ্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুশীলন করতে হয়। সোরোকিন যাকে বলেছেন 'meaningful personality'—তাঁর ছিল সেই দুর্লভব্যক্তিত্ব। অর্ধশতাব্দীকাল তিনি যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার সঙ্গে তিনি কোনোদিনই তাঁর নেতৃত্ব বা ব্যক্তিত্বের গোঁজামিল দেন নি। তিনি জানতেন স্বদেশকল্যাণের ব্রত তিনি নিয়েছেন, তাই অবসর গ্রহণের কথা তিনি চিন্তা করতেই পারতেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন নেতৃত্ব বিলাসের জিনিস নয়, arm-chair politics নয়—নেতৃত্বের বয়স নেই। "I will not rest"—এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের অন্তরের কথা। তাইতো আমরা তাঁর জীবনে দেখতে পাই যে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি কখনো বয়োধর্মকে স্বীকার করেন নি—যৌবনোচিত সতেজ উদ্যম নিয়েই তিনি তাঁর ব্রতাচরণে অতন্দ্র ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। একেই বলে আদর্শনিষ্ঠা। তাঁর সমকালীন আর কোনো নেতার জীবনে আমরা এই আদর্শনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি না। সুরেন্দ্রনাথই বোধ হয় বাংলা তথা ভারতবর্ষে দেখিয়ে গেছেন যে, সত্যকার নেতৃত্ব নদীর প্রবাহের মতো; তার জরা নেই, ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই—অবসাদ পর্যন্ত নেই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রগুরুর নেতৃত্বের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার ইহাই মর্মকথা।

১৯২৫, আগস্ট ৬, বৃহস্পতিবার, (বাংলা ১৩৩২, ২২শে শ্রাবণ) সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হোল। ভারতের রাজনীতিতে নবযুগের প্রবর্তক, মুক্তিমন্ত্রের

গুরু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে। মায়ের গৌরব-দীপ নিভে গেল। রূপার পানের ডিবার মতো যে বৃহৎ রেলওয়ে ওয়াচটি তাঁর জীবনের নিয়ত সঙ্গী ছিল, যার নির্দেশে তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হোত, দেখা গেল, মৃত্যুকালে শয্যাপার্শ্বে সেই ঘড়িটি পড়ে রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মতোই সেকালে তাঁর নিত্যসঙ্গী এই ঘড়িটিও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নিয়মনিষ্ঠ জীবন তিনি যাপন করতেন—তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ঘড়ির কাঁটা ধরে। ঘড়িটি সমান তালেই চলছে—টিক টিক টিক—কিন্তু তার ছন্দে যে জীবন প্রতিনিয়ত উত্তর দিত, তার স্পন্দন তখন চিরদিনের মতো থেমে গেছে। ঘড়িটির কাঁটা তেমনি মহাকালের গতি নির্দেশ করে চলেছে আপন মনে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের জীবনের গতি আজ চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাংলায় যেন একটা বিরাট যুগের অবসান ঘোষিত হোল এই বিরাট পুরুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও একটি যুগের অবসান হোল। সুরেন্দ্রনাথ আজীবন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিতাহারী ও মিতাচারী মানুষ ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর শরীর কিছুমাত্র অপটু হয়নি অথবা বার্ধক্যে ভেঙে পড়েনি। এদিক দিয়ে সমকালীন ভারতবর্ষে তিনি অনেকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। জীবনস্মৃতি রচনাকালে এর সর্বশেষ অধ্যায়টি তিনি আরম্ভ করেছেন এইভাবে: "পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ হোলেও এখন আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে।" কি উপায়ে তিনি অমন অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন তা সবিস্তারে তিনি লিখে গেছেন; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন। তিনি বিশ্বাস কবতেন: "সবল দেহ ও সুস্থ মন শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদ। শরীর সুস্থ রাখতে হোলে স্বচ্ছ বিবেক, দুশ্চিন্তা, ঘৃণা ও অসূয়া পরিহার এবং মানসিক শান্তি ও সকলের প্রতি প্রীতির একান্ত প্রয়োজন। শরীর ও মন পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং একটি অপরকে শক্তি দান করে।" এইজন্যই বোধ হয় তাঁর চরিত্রে দুর্বলতা স্থান পায়নি অথবা কোনো প্রকারের নীচতা বা ক্ষুদ্রতা তাঁর শুভবুদ্ধিকে কখনো কোনো অবস্থায় আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই তাঁর জীবনের রথ ইতিহাসের রাজপথে চলেছিল দুর্বার গতিতে। ১৩৩২, ২২শে শ্রাবণ, রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে সেই গতি মহাকালের তর্জনী-সংকেতে

চিরদিনের মতো স্তব্ধ হোয়ে গেল। বাঙালীর মানসপটে চিরকালের জন্ম মুদ্রিত হোয়ে রইল শুধু একটি নাম : 'সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'।

মনুষ্যোচিত ও ব্রাহ্মণোচিত বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। এদেশে জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করে রাজনীতির মতো সর্বগ্রাসী কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন : "পঞ্চাশ বৎসর তাঁহাকে দেখিয়াছি। কখনো কখনো দুই-তিন মাস একত্র বাস করিয়াছি ; কখনো তাঁহাকে অসত্য কহিতে, পরনিন্দা বা আত্মশ্লাঘা করিতে শুনি নাই। পরিচিত বা অপরিচিত সমস্ত লোকের নিকটই তিনি আপনাকে খুলিয়া দিতেন। তিনি অকপট ও উদারপ্রাণ ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিন্দা করিত, তিনি তাহাদিগেরও উপকার কবিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের স্বরূপ।" দেহে ও মনে তিনি সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিলেন বলেই তিনি এমন মহৎ হোতে পেরেছিলেন।

নিয়মানুগত্য তাঁর জীবনের বিশেষত্ব ছিল। তিনি কখনো সময়ের অপব্যবহার করতেন না। এমন সুশৃঙ্খলভাবে তিনি কাজ করতেন যে, তাঁর মতো কর্মিষ্ঠপুরুষ এদেশে কেন, বিদেশেও বিরল। কৃষ্ণকুমার মিত্র বলেন : "সুরেন্দ্রনাথের নিয়ম-নিষ্ঠা অতীব প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার আহার, বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, কোনমতে তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না।" প্রাতে শয্যা ত্যাগ করতেন, নির্দিষ্ট সময়ে চারবার আহার করতেন, নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম ও ভ্রমণ করতেন, নির্দিষ্ট সময়ে রাত্রি নয়টায় নিদ্রা যেতেন—কেউই এ নিয়মের বাধা জন্মাতে পারত না। বিরাট রেলওয়ে ওয়াচটি ছিল তাঁর সতর্ক প্রহরী। আহারে তাঁর বিশেষ সংযম ছিল। কখনো অতিরিক্ত আহার করতেন না—লাট ভবনের নিমন্ত্রণে কচিৎ যেতেন, গেলেও সেখানকার খাদ্য গ্রহণ করতেন না। কলিকাতায় ভূপেন বসুর বাড়িতে যখন একদিন সন্ধ্যায় মণ্টেগু সদলে নিমন্ত্রিত হন, তখন আহারের টেবিলে সুরেন্দ্রনাথ একগ্লাস জল ভিন্ন অন্য কোনো খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করলেন না। শিষ্টাচারের সঙ্গে বলেছিলেন : "I try to follow certain principles in my everyday food. My food-habit does not permit me to partake in elaborate dishes." শুনে মণ্টেগু তাঁর খুব প্রশংসা

করেছিলেন, পরিহাস ছলে ভূপেন বসুকে বলেছিলেন : "Mr. Banerjea seems to be un-compromising even in his food-habits. This is laudable." ইংরেজ রাজপুরুষেরা যে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো, সে তাঁর চরিত্রের এই অনমনীয়তার জন্য। দুষ্পাচ্য দ্রব্য কখনো খেতেন না। মদ দূরে থাকুক, চুরুট পর্যন্ত স্পর্শ করেন নি। কথিত আছে, শেষবয়সে একদিন তাঁকে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন : "সত্তর পার হোলো সুরেন ; এইবার একটু আফিম ধরো।" উত্তরে তিনি হেসে বলেছিলেন : "কর্তা ওসব অনেক করে গেছেন, কিছুই বাকী রাখেন নি। আমার দরকার নেই।"

পোষাকে-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। যখন সিভিলিয়ান ছিলেন, তখনো ইংরেজি পোষাক পরেননি। যখন মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখনো সেই চাগা-চাপকান ও পায়জামা তাঁর পরিচ্ছদ ছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত বলতেন : "সুরেন্দ্রনাথের আচকানের ভাঁজে ভাঁজে বাঙালীজাতির একটা জাগরণের ইতিহাস সঞ্চিত আছে।" কথাটি মিথ্যা নয়। বঙ্গবিচ্ছেদের সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, স্বদেশী বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র ব্যবহার করবেন না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বদেশী বস্ত্রই ব্যবহার করেছেন। প্রবল সাহেবিয়ানার যুগে, কি ঘরে, কি বাইরে, তিনি কোনোদিন 'সাহেব' সুরেন্দ্রনাথ সাজেন নি, সাজবার কথাও চিন্তা করেন নি ; বাঙালীর সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, চিরাচরিত রীতিনীতি তিনি কোনোদিন বর্জন করেন নি। সুরেন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালী, খাঁটি স্বদেশী। দেশসেবার যোগ্যতা দান করবার জন্য ভগবান তাঁকে যে বাগ্‌বিভূতি, ভাষাজ্ঞান, মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং মনের ও হৃদয়ের অনন্যসাধারণ গুণ দিয়েছিলেন তা সত্যই তিনি দেশসেবার জন্য উৎসর্গ করে-ছিলেন। সেইজন্য লোকপ্রিয়তা ও খ্যাতি তাঁর কাছে অযাচিতভাবেই উপস্থিত হয়েছিল। সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠাই তাঁর রাজনীতিক জীবনের নিয়ামক ছিল। একটি কথা তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত : "জেনেশুনে আমি লোককে কখনই কুপথে বা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করব না। লোকের পক্ষে যা হিতকর বলে আমার কাছে বিবেচিত হয়, তা লোকের অপ্রিয় হবার আশঙ্কা থাকলেও আমি তা করব।"

এই দৃঢ়তা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেদিন ইংরেজশাসকগণ

সুরেন্দ্রনাথকে মিথ্যা 'Surrender not' বলতেন না। তাঁরা জানতেন ভারতবর্ষে এই একটি মানুষই আছেন যিনি পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করবার লোক ছিলেন না। দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন বলেই তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁর মন্ত্রিত্বকালীন সময়ে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে চাকরী দিয়েছেন, এমন কথা কেউই বলতে পারেন না। বর্তমানের কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের এই দৃঢ়তার দৃষ্টান্তটি মনে রাখলে উপকৃত হবেন। কাজ ও কর্তব্যপালনই তাঁর জীবনে ধর্মের ন্যায় পবিত্র ছিল। এর চেয়ে পবিত্রতর ধর্ম তিনি আর কিছুই জানতেন না অথবা মানতেন না। তিনি বক্তা ছিলেন যেমন, কর্মিষ্ঠ পুরুষও ছিলেন তেমনি ' আবেগময় সাময়িক উত্তেজনা (যা গান্ধী-যুগের কোনো কোনো নেতার মধ্যে প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল) তাঁর রাজনীতিক উচ্ছ্বাসকে কখনো চালিত করেন নি। আগেই বলেছি, সুস্পষ্ট আকারে উদ্দেশ্যটি মানসনেত্রে উদ্ভাসিত রেখে, স্থির বুদ্ধিতে উপায় নির্ণয় করে তিনি কর্তব্যপথে অগ্রসর হতেন। অর্ধশতাব্দী ব্যাপ্ত সেবার দ্বারা তিনি যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অসম্ভাবিতরূপে পবিবর্তিত করতে পেরেছিলেন, তার রহস্য ও মূল তো এইখানে। মন্ত্রিত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর দেখা গেল যে, তিনি মনের সর্ববিধ আবেগ, বাসনা ও আত্মাভিমান পরিহার করে কেবল নিজশক্তিতে যতদূর কুলোয়, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার আদর্শ সফল করবার জন্য শেষ পর্যন্ত কাজ করবার সঙ্কল্প করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের স্বরাজের কল্পনা আব গান্ধীর স্ববাজের কল্পনায় বিস্তর পার্থক্য। মাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা স্বরাজ আয়ত্ত হোতে পারে, এ তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না। সুস্থ এবং সবলকায়, দৃঢ়চেতা, সুশিক্ষিত জনগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কৌশল সব আয়ত্ত করে, সকল বিষয়ে আধুনিক সভ্যজগতের সমকক্ষ হয়ে আপন অধিকার বুঝে নেবে এবং দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে—স্বরাজের এই কল্পনাই তিনি আজীবন পোষণ করতেন। ধৈর্য ও আশা জননায়কের প্রধান গুণ। বহু ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা সত্বেও মণ্টেগু-সংস্কার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ এই যে, তিনি আশা করেছিলেন যে, একে আশ্রয় করেই দেশবাসী অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশি চাইবার শক্তি অর্জন করতে পারবে। তিনি আশাবাদী ছিলেন এবং তাঁর

চরিত্রে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না। গান্ধীকে চরিত্রগত আশা-শীলতার সঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি একানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবেন ও কাজ করবেন। শেষ বয়সে সম্ভবত তিনখানি কাগজের সম্পাদকীয় কাজে পুনরায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁর জীবনীশক্তির হ্রাস হয়েছিল। নতুবা তাঁর মতো নিয়মনিষ্ঠ ও মিতাচারী ব্যক্তির পক্ষে একানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ও সমর্থ থাকা অসম্ভব ছিল না।

একটি মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর ও মহান তা ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী লিখেছেন: "তিনি যেরূপ সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার-বর্জিত, যেরূপ জনতন্ত্রবাদী এবং লোকের প্রতি সার্বভৌম সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন, ভারতের জননায়কদিগের মধ্যে সেরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁহার জীবনের সকল সময়েই তিনি সাধারণের একজন ছিলেন। 'বেঙ্গলী' অফিসে বা তাঁহার গৃহেই হউক, অথবা মন্ত্রীর কক্ষেই হউক, সুসময়ে হউক অথবা দুঃসময়েই হউক, উচ্চ-নীচ-ধনি-দরিদ্র সকলেই তাঁহার নিকট সমান সমাদর পাইতেন। যাহার কোন অভিযোগ ছিল বা দেশের জন্য যে ব্যক্তি নির্যাতিত বা দণ্ডিত হইয়াছে, এমন লোককে তিনি কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তিনি কাহারো উপর কখনো কোন বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করিতেন না। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিগৃহীত চরমপন্থী বা বিপ্লবীদলের অনেক ব্যক্তিকে তিনি কাজ দিয়া ও অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি দল ভালবাসিতেন না বা দলপতি ছিলেন না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে, কিন্তু অনেক বিষয়ে তিনি দলাদলির উর্ধ্বে উঠিয়া মহানুভবতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন।" এই মহানুভবতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালে ভারতরক্ষা আইনে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ধৃত হোলেন। তিনি তখন সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'র সহযোগী সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে মনোরমা দেবী লিখেছেন: "বাবার গ্রেপ্তারে সুরেন ব্যানার্জি যা করেছেন তা লেখার ভাষা আমার নেই। 'শ্যামসুন্দর অথবা দণ্ডনীতি?'—

এই সব সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলীতে লেখা প্রবন্ধ। বাংলায় 'বাঙালী' পত্রিকাতেও অনুরূপ প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। সেসব প্রবন্ধ অপূর্ব। তিনি বাবার জামিনের জন্য ইংরেজ ব্যারিস্টার দেন। জামিন মেলেনি। বাবাকে জেলের প্রায় আলোবাতাস-হীন এক নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছিল। আমার মায়ের কাছে এই খবর পেয়ে সুরেন ব্যানার্জি অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন গভর্ণরের কাছে। (শুনেছি পরে ব্যবস্থাপক-সভায় বাবার এই নির্জন কারাবাস নিয়ে বাক্‌-বিতণ্ডা হয়েছিল।) সুরেন ব্যানার্জি বাবার জন্য গভর্ণরের কাছে গিয়েছেন অনেকবার, যুক্তি-আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্যামসুন্দরের পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য কত অনুরোধ করেছেন। ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্য বিচারের জন্য চেষ্টা করেছেন। এমন কি, নিজ দায়িত্বে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়িতে বাবাকে রাখতে চেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তারপর যখন কোনো চেষ্টাই সফল হোল না তখন বাবাকে কালিম্পং-এ ভালো বাড়িতে অন্তরীণ রাখবার ব্যবস্থা করেন সরকার। হয়ত এর পিছনে সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল। যেদিন জেল থেকে তাঁকে কালিম্পং পাঠানো হবে (কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই এ সংবাদ সুরেন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন) সেদিন সুরেন্দ্রনাথ জেল থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বাবাকে আমার স্বামীর (ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী) মেসে। কালিম্পং শীতের দেশ। তখনই দর্জি ডেকে তিনি দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে বাবার পরবার জন্য গরম আলখাল্লা বেনিয়ান প্রভৃতি তৈরি করিয়ে দিলেন, নিজের হাতে জামার বোতাম বসালেন, বাক্স গুছিয়ে দিলেন, তাঁকে বসে খাওয়ালেন এবং স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। 'আমি জেল হইতে বাহির হইয়া কালিম্পং-এ অন্তরীণ হইলাম'—বাবাকে দিয়ে একটা কাগজে তিনি এইটুকু লিখিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেটি আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অন্তরীণাবদ্ধ শ্যামসুন্দরের মুক্তির জন্য তিনি কত-না চেষ্টা করেছেন। এজন্য সুরেন্দ্রনাথকে পুলিশের সুনজরে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হন নি।"

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বিলক্ষণ বাদ-বিসম্বাদ ও অপ্রীতি চলেছিল। বিপিনচন্দ্র তখন ঘোর গরমপন্থী হয়ে নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথের উপর তাঁর তৎকালীন কাগজে (*New India*) গোলাবর্ষণ

করেছিলেন। 'বেঙ্গলী'-তে তার পাল্টা জবাব চলেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন শোনা গেল বিপিনচন্দ্রকে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। খবরটা যেখানে এলো সেখানে সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে তিনি তাঁর দলবলকে ডেকে বললেন, "বিপিনের defence-এর সব বন্দোবস্ত তৈরি রাখো; জামিনে খালাসের আয়োজন ঠিক থাকুক। কোন ব্যারিস্টার দেওয়া হবে, কত টাকা তুলতে হবে হিসেব করো।" ব্যক্তিগত অনৈক্য ভুলে জাতীয় ঐক্যকে প্রাধান্য দেওয়া জিনিসটা কি, দেশের নেতা হওয়ার রহস্য কি, বাঙালী সেদিন তা উপলব্ধি করেছিল।

আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতিকে তিনিই আন্দামান থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। বাংলার অন্যতম বিপ্লবী আশুতোষ লাহিড়ী যখন আন্দামানে ছিলেন, তখন তাঁর মুক্তির জন্য সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় দিনের পর দিন যেরকম আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য, সে ইতিহাস আজ কয়জন জানে? 'কামাগাটু মারু' জাহাজের সাতান্ন জন শিখকে রাজদ্রোহের অপরাধে ফাঁসীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথই লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের অনেকের জীবন রক্ষা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত সম্পর্কে অহিংসবাদী গান্ধীর আচরণ তুলনীয়। রক্তাক্ত বিপ্লবে সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না সত্য, কিন্তু বিপ্লবীদের দেশ-প্রেমকে তিনি সব সময়েই বড়ো করে দেখতেন। এই যে তাঁর চরিত্রের মহানুভবতা, এ কি বিস্মৃত হবার জিনিস?

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখন কোন্ নিয়মের বশবর্তী হয়ে কাজ করতে হয় এবং দেশের যথার্থ হিত কোন্ পথে সাধিত হবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে মতান্তরের যথেষ্ট স্থান আছে, এ স্বীকার করতেই হয়। এই মতান্তর উপলক্ষ করে কোনো নেতার অমর্যাদা বা নির্যাতন করা যথার্থ দেশসেবার পথ নয়, পথ হতেও পারে না। যে কাজের ভিত্তি অকৃত্রিম দেশভক্তি, তার দোষগুণের বিচারের জন্য অন্য মানদণ্ড আছে। সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও দেশসেবা কারো চেয়ে কম ছিল না, একথা স্বীকার করতেই হবে। অক্ষুণ্ণভাবে পঞ্চাশ বছর দেশসেবা করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটেছে? "Oppose Government

when necessary but support it when possible." অর্থাৎ, সৎকার্যে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ও অসৎ কার্যে কেবল অসহযোগ ও প্রবল প্রতিবন্ধকতাচরণ—বিলাতের লিবারেল পার্টির এই মূলমন্ত্র সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল আর ইহাই ছিল তাঁর সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলভিত্তি। এজন্য জীবনের কোনো অবস্থায় তিনি দেশপ্রেমকে খাটো করেন নি—এখানেও তিনি ছিলেন তেমনি uncompromising এবং তেমনি উগ্র তপস্বী।

সুরেন্দ্রনাথের মহানুভবতার কথা বলতে গিয়ে লিয়াকৎ হোসেনের কথা উল্লেখ করতেই হয়। এই বিহারী মুসলমান ইংরেজি জানতেন না, বাংলাও ভালো জানতেন না; তবু বিশ বছর কাল যাবৎ কলিকাতায় এই স্বদেশপ্রেমিক মুসলমানকে প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় ছেলেদের মিছিল বার করতে দেখা গিয়েছে। উর্দু ভাষায় তাঁর মনোভাব তিনি ব্যক্ত করতেন। দেশসেবার পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। রাজনীতিক অপরাধে ছয়-সাতবার কারাদণ্ড হয় লিয়াকতের; কয়েকবার মুচলেকা দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন লিয়াকৎ হোসেন। তাঁর সময়কার কংগ্রেসের সকল নেতাদেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। দেশসেবক এই মুসলমানটিকে সুরেন্দ্রনাথ যে কতখানি ভালবাসতেন তার পরিচয় আছে তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে। বরিশালে সুরেন্দ্রনাথ যখন ধৃত হন তখন সেই সংবাদে বিচলিত হয়ে লিয়াকৎ সারাদিন উপোস করেছিলেন। বরিশাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সুরেন্দ্রনাথের সম্বর্ধনায় শিয়ালদহ স্টেশনে সেদিন যে জনতার সমাবেশ হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। এই উপলক্ষে সেইদিনই কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা হয়। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে সে এক পরম মুহূর্ত। সেই সভায় অন্যতম বক্তা ছিল লিয়াকৎ হোসেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বাস্তবিক লিয়াকৎ এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বহুবার তিনি পুলিশের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন কিন্তু সকল অবস্থাতেই সেই নির্ভীক পুরুষ নিজ কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। যদিও সকল সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি তথাপি স্বদেশের সেবায় নিবেদিত প্রাণ লিয়াকৎ হোসেন আমার হৃদয়ের এক বিশিষ্ট অংশ অধিকার করে আছেন।" সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বেই লিয়াকৎ পরলোকগমন করেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে কাব্যবিশারদ ছিলেন অন্যতম। সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে তাঁর বহুস্থান পরিভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন ইনি। বঙ্গভঙ্গের দিনে 'হিতবাদী'র সম্পাদক হিসাবে কাব্যবিশারদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশে তখন একখানা ভালো সাপ্তাহিক ছিল না। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' গোঁড়া হিন্দুদের কাগজ, আর কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' তেমনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। এই অবস্থায় যথার্থ সংবাদ ও সাহিত্য পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে, ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী'—নির্দলীয় সাপ্তাহিক। 'হিতবাদী' ছিল যৌথপ্রয়াস, সুরেন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। পত্রিকার নামকরণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; কাগজের আদর্শ বা motto তিনিই ঠিক করে দেন—'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন আর প্রধান সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। পরে কাব্যবিশারদ এর সম্পাদক হন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমাদের পরলোকগত সহকারী ও 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু না বলে পারছি না। ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগের যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি প্রত্যেক স্বদেশী সভায় উপস্থিত থাকতেন। ঐ সমস্ত সভায় তিনি এক নূতনত্ব আনয়ন করেন। যদিও তিনি নিজে গান গাইতে পারতেন না, সঙ্গীতে তাঁর নৈপুণ্য ছিল এবং তিনি সুন্দর গান রচনা করতে পারতেন। তাঁর রচিত গানগুলি স্বদেশী সভায় এক গভীর প্রভাব সৃষ্টি করত। তাঁর হিন্দী গান, 'দেশ কি এ কেয়া হালৎ' তখনকার দিনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটির তিনি এমন পক্ষপাতী ছিলেন যে তিনি বলেছেন: "সমগ্র স্বদেশী আন্দোলন বলতে গেলে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রেরই অভিব্যক্তি।" দান্তে রচিত ইতালির একতাসূচক বিখ্যাত গানটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটির তুলনা করে তিনি বলেছেন: 'বন্দেমাতরম্' কেবলমাত্র জাতীয় সঙ্গীত নয়, ইহা ভারতের জাতীয় সম্পদ, এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবার এর চেয়ে সার্থক মন্ত্র আর নেই।" পরবর্তীকালের কংগ্রেস

নেতাগণ কিন্তু এই 'বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকেই হত্যা করেছেন; মাত্র কয়েক লাইন রেখে এর অবশিষ্ট অংশকে বর্জন করা হয়েছে।

১৯০৬ সালে আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত বলে সম্মান দেখিয়েছিলেন। তেমনি নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছেন: 'ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহীয়সী নারী।" মিলন-মন্দির বা ফেডারেশন হলের পরিকল্পনার সমর্থকদের মধ্যে নিবেদিতা ছিলেন অন্যতমা; এ কথা সুরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। এদেশের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ একজন মডারেট বা নরমপন্থী বলে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু আজ এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, এইটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। দেশের সাধারণ ফৌজদারি আইন অতিক্রম করে যখন রৌলট আইন (Rowlatt Act) প্রবর্তিত হয়, তখন এই মডারেট সুরেন্দ্রনাথই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়িয়ে এই স্বৈর আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এর বিষময় ফল সম্বন্ধে সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এই রৌলট আইনই অসহযোগ আন্দোলনের জনক। তেমনি কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট আলোচনার সময় তিনি যখন প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের প্রধান অঙ্গ হিসাবে অধিকতর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবার স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন, তখন তদানীন্তন অর্থ সচিব স্যর উইলিয়ম মেয়ার তাঁকে অধীর আদর্শবাদী বলে কটাক্ষ করেন। এই মেয়ারের মুখের উপরই তিনি বলেছিলেন: "*Yes*, I am an idealist, but neither an impractical nor an impatient idealist." ইহাই সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর একটি দিক ছিল। অমন যে কঠিন ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি, তথাপি তিনি পরিহাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন, প্রাণখুলে হাসতে পারতেন। কথিত আছে. তাঁর একটি ভৃত্য মনিবের পরিচ্ছদ নিয়ে উপহাস করত। এই ভৃত্যটির শোভনতা ও অশোভনতা সম্বন্ধে ধারণা শুনে তিনি অত্যন্ত হাসতেন। যখন কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি মনটা প্রফুল্ল করতে ইচ্ছা করতেন, তখন দেখা যেত ভৃত্যকে নিয়ে তিনি হাস্য-পরিহাস ও বিদ্রূপ করছেন। সরলাদেবী লিখেছেন যে, সুরেন্দ্রনাথ রঙ্গরস বা কৌতুকপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু কাজের সময় দেখেছি তিনি একেবারে অন্য

মানুষ—তখন তাঁর অতি নিকট এবং প্রিয়জনও তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারত না।

রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সুরেন্দ্রনাথ দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপের গতি ও প্রকৃতি কি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন তার পরিচয় মিলবে একখানি চিঠিতে। এই চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার অন্যতম সদস্য তারকনাথ মুখোপাধ্যায়কে। ইনি উত্তরপাড়ার বিখ্যাত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। সেইসময়ে স্বরাজ্য দলপতি চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপক-সভায় মন্ত্রীদের বেতনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে দ্বৈত শাসনব্যবস্থাকে অচল করবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। মন্ত্রীদের বেতনের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করে সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁকে একখানি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির উত্তরে তারকবাবু তাঁকে জানান যে, এ বিষয়ে তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সেই চিঠির উত্তরেই এই চিঠি। চিঠিখানির তারিখ ১৭ই মার্চ, ১৯২৫। সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন: "প্রিয় তারকবাবু, আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে-কারণ জানিয়েছেন, তজ্জন্য আমি আনন্দিত; যদিও সেগুলি অচল। আপনি বলেছেন যে, আপনি নির্বাচকমণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। আপনি একটি পুরাতন ও অচল নীতির পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন বার্ক। আমি আশা করি, আপনি তাঁর বই পড়েছেন। বৃষ্টলের নির্বাচকদের প্রতি এক পত্রে এই নির্দেশের নীতি সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন তার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বার্ক লিখেছেন: 'নিজের যুক্তি ও বিবেক অনুযায়ী সুস্পষ্ট ধারণার পরিপন্থী হলেও সদস্যকে দলের আদেশ ও নির্দেশ অন্ধের ন্যায় মেনে চলতে হবে—ইহা দেশের আইনে নেই, এবং আমাদের শাসনতন্ত্রের সমগ্র পদ্ধতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা মূলগত ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এর উৎপত্তি।'

"বহু বৎসর পূর্বে বাংলায় আবগারী বিল সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাব থেকে এই প্রশ্নটি উঠেছিল। তাঁরা উক্ত নির্দেশের নীতি দ্বারা তাঁদের আচরণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আপনার স্বনামধন্য পিতামহসহ আমরা সকলে তার বিরোধিতা করেছিলাম এবং নৈতিক জয় আমাদেরই

হয়েছিল। মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তার ফল কি হবে, তা একবার ভেবে দেখবেন। হস্তান্তরিত বিভাগগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে এবং সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উপর বাংলার যে সামান্য কর্তৃত্ব আছে, তা নষ্ট হবে। মুহূর্তের জন্যও এ কথা মনে করবেন না যে, ভাঙার কৌশল স্বরাজের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করবে। নিশ্চিত জানবেন যে, ব্রিটিশ গণতন্ত্র কেবল ধাপ্পা দ্বারা সন্ত্রস্থ হবে না, পরন্তু বর্তমানে বাধাদানের পন্থা দ্বারা তাদের বিরোধিতা অধিকতর তীব্র হবে।"

এই পত্রে সুরেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী কবেছিলেন, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছিল। দেশবন্ধুর policy of obstruction রাজনীতিতে একটি ব্যর্থ প্রয়াসের অতিরিক্ত কিছুই হয়ে উঠতে পারেনি। তবে মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের এই একটি কাজ আমরা সমর্থন করি না। মনে রাখতে হবে যে, যিনি মন্ত্রীদের বেতন-হ্রাসের বিরোধিতা করেছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথই আজীবন সরকারের ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও জনসভায় তুমুল প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন।

সুরেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ এবং কর্মবহুল জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পেলাম যে, ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন নিয়ত ব্যাকুল, উগ্র তপস্বী। ভারতের বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকগণের একত্রীকরণে সর্বপ্রধান নায়ক তিনিই। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক মহাজাতিতে পরিণত করে জন্মভূমির বন্ধনমোচন করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এদেশে সংঘবদ্ধ জাতীয়তার উদ্বোধক তিনি। জাতীয় যজ্ঞের হোমানল তিনিই প্রজ্বলিত করেন, আবার তিনিই ঋত্বিকরূপে তাতে আহুতির পর আহুতি ঢেলে-ছিলেন। আমরা দেখলাম, ব্রতধারীর ন্যায় কি অক্লান্ত অশ্রান্ত ছিল তাঁর কর্মময় জীবন। সে-জীবনে নৈরাশ্যের নিরুদ্যম ছিল না—ছিল না নিষ্ফলতার হতাশ্বাস। তাঁর জীবনের কর্মশালা হয়েছিল ভারতের ঐক্য ও মুক্তিসাধনার যজ্ঞশালা। তাঁরই উদাত্তকণ্ঠে আমরা প্রথম শুনলাম ভারতের একজাতিত্বের বাণী। শুনলাম: "নিজের শাসনব্যবস্থা নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার সকল

জাতির মতো ভারতেরও বিধিদত্ত অধিকার।" জাতির হয়ে সেই পরম অধিকার বৈধ আন্দোলনের পথে অর্জন করার প্রয়াসের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় তাঁর জীবনের সার্থকতা। যে মন্ত্র তিনি ভারতকে দান করেছিলেন—"I owe allegiance to God and to my people"—তিনি স্বয়ং সেই মন্ত্রের সাধনায় তপস্যা করেছেন আজীবন। আমরা দেখলাম, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে অনন্যকর্মা এবং অনন্যলক্ষ্য হয়ে তিনি একদিকে স্বদেশবাসীদের মধ্যে সংহতিবৃদ্ধির চেষ্টায় এবং অন্যদিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য নিজেকে সংগ্রামে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। .এই যে প্রেরণা, এই যে নেতৃত্ব—ভারতের জাতীয় জীবনে নব রূপান্তর এনে দিয়েছে তার সন্ধান কি আজো আমরা নেব না? রাষ্ট্রগুরুর জীবনসংগ্রাম ভারতেরই জাতীয় সংগ্রাম; তাঁর জীবনেতিহাস ভারতের মহাজাতিত্বলাভের প্রয়াসেরই ইতিহাস। এমার্সন বলেছেন: "Ideal of one generation becomes the actual of the next." কথাটি সত্য। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আদর্শকে অতিক্রম করে যান; উর্বর জমিতে পড়লে কালে সেই আদর্শই বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে ভবিষ্যবংশীয়গণের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে আমরা সেই আদর্শেরই সন্ধান পাই।

১৯৪১, ৩১শে আগস্ট। কলিকাতার কার্জন পার্কে রাষ্ট্রগুরুর মর্মরমূর্তি উন্মোচিত হয় ঐদিন। সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু আর সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু। সাপ্রু তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান গুরু বলে স্বীকার করে বলেছিলেন: "When the true history of India is written with proper desire to assess the contributions of various men who have led to the building of its life, Surendranath Banerjea's place will be very high and will be very secure...He was not a politician in the sense that

agitation was the breath of his nostril. He was a builder, he was an architect, he was a constitutional thinker." সেদিনকার বক্তৃতায় সাপ্রু আরো একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর চেয়ে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে সেদিন খুব কমই ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত, এই যে দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালী নেতৃত্ব করে এসেছে, তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: "But have you ever thought why it was so during the last fifty years? It was mainly because of Surendranath Banerjea. You in Bengal scarcely knew what an asset he was to you and to the rest of India? He was probably Bengal's greatest asset in Bengal's leadership for the regeneration of India."

আর সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন: "We are the children of his dream; things of his vision. So let it not be felt by any that any generation can forget him...Let us not feel that there has been a break in the evolution from Surendranath Banerjea to Mahatma Gandhi. We are all his children and not the greatest of us will but feel to pay homage to the man who taught us what real nationalism is."

আজ যখন প্রতিদিন—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়—কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে বাঙালী-সন্তানেরা হেঁটে যায়, তখন রাষ্ট্রগুরুর মর্মর-মূর্তির সমুন্নত ভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যও কি তাদের স্মৃতিতে এই মানুষটির কথা মনে হয়? মনে হয় কি—ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন প্রকৃত জাতীয়তা কি? মনে হয় কি—একদিন এঁরই কণ্ঠকে আশ্রয় করে জাতীয়তার বাণী, ঐক্যের বাণী আর রাষ্ট্রীয় অধিকারের বাণী মেঘমন্দ্রিত স্বরে ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল? মনে হয় কি—সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতে একটি নবযুগের উদ্বোধন করে গিয়েছেন? আমরা কি আজ সত্যই এইসব কথা মনে করি? করি না। ভারতবর্ষে জনসেবার ইহাই পুরস্কার।

আমরা জানি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র অথবা সুরেন্দ্রনাথ— —এঁদের কেউই তাঁদের স্ব স্ব জীবনের শ্রেষ্ঠ তপস্যার জন্য স্বদেশীয়ের কাছে যতটা তিরস্কারলাভ করেছেন, ঠিক সেই পরিমাণে অভ্যর্থনা পান নি। আজ এই কথা বলব যে, ইতিহাসে যাঁরাই স্বকীয়তন্ত্র মানুষ বলে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের বিচার মহাকালের হাতে হয়ে থাকে, বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান তাঁরা বিধিদত্ত সেই উদ্দেশ্য তাঁদের জীবন দিয়ে সার্থক করেন। স্বজাতির নিন্দা-অসম্মানই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর শেষজীবনে সেই পুরস্কারই লাভ করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখতে গেলে এটাকে অগৌরবের মনে হবে, কিন্তু ভগবান তাঁকে যে অভিনব দৌত্য দিয়ে একদিন এই পরাধীন ভারতবর্ষে প্রেরণ করেছিলেন, সেই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্মান। সেই সম্মানের টীকাই ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথের ললাটে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকাল। যুগ আসে, যুগ চলে যায়, কিন্তু মহৎ সাধনার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকে ইতিহাসে। জাতির পথপ্রদর্শক হিসাবে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বল্প যে কয়টি নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়ে থাকে, সুরেন্দ্রনাথের নাম নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অন্যতম। আজ যখন আমরা একবার সেই শুভ্রকেশ, সৌম্যমূর্তি সুরেন্দ্রনাথকে স্মরণ করি তখন তাঁরই কণ্ঠোচ্চারিত সেই মহৎ বাণী—"স্বদেশের সেবাই আমার ধর্ম"—আমাদের হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে আর স্তিমিত ধমনীতে প্রবাহিত করে দেয় উষ্ণ রক্তস্রোত। একদিন না একদিন তাঁর স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

গ্রন্থপঞ্জী ॥

এই পুস্তক রচনাকালে বহু পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে। সবগুলির উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে শুধু প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলাম।

1. *A Nation in Making* — Surendranath Banerjea
2. *Speeches* — Surendranath Banerjea
3. *History of the Indian National Congress* — B. Pattabhi Sitaramayya
4. *An Advanced History of India* —Majumdar, Ray Chaudhuri & Dutta
5. *India Unrest* — Sir Valentine Chirol
6. *An Indian Diary* — Edwin S. Montagu
7. *India Today* — R. Palme Dutta
8. *The New Spirit in India* — Nevinson
9. *New India* — Sir Henry Cotton
10. *India under Ripon* — W. S. Blunt
11. *Memories of My Life and Times* — B. C. Pal
12. *Lord Curzon in India* — Sir J. Raleigh
13. *History of the Indian Nationalist Movement* — Sir Verney Lovatt
14. *How India Wrought Her Freedom* — Annie Bessant
15. *Speeches on Indian Affairs* — Morley
16. *Montagu-Chelmsford Report, 1918*
17. *Surendra Nath Banerjea* — Jogesh Chandra Bose
18. *Indian National Evolution* — Ambica Charan Mazumder
19. কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ — সূর্যকুমার ঘোষাল

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

ছোটদের ছত্রপতি
ছোটদের বার্নার্ড শ
ছোটদের শ্রীঅরবিন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ
ছোটদের গৌতমবুদ্ধ
কাজলরেখা
লীলা-কঙ্ক
আমাদের বিদ্যাসাগর
নানাসাহেব
সিপাহী বিদ্রোহ
কেমন করে স্বাধীন হলাম
বাংলা সাহিত্যের পরিচয়
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ
রবির আলো
অমর-জীবন
মহাচীনে শ্রীনেহরু
সেই বিশ্ববরণ্যে সন্ন্যাসী
বিজয়কৃষ্ণ
গৌতম বুদ্ধ
রামমোহন
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
বিদ্যাসাগর
মাইকেল
কেশবচন্দ্র
রমেশচন্দ্র
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
নিবেদিতা
লোকমাতা নিবেদিতা
নিবেদিতা-নৈবেদ্য
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস
সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার

SISTER NIVEDITA
OUR BUDDHA

॥ পরবর্তী বই ॥

শিক্ষাগুরু আশুতোষ